দিগ্বিজয়ী তৈমুর

হ্যারল্ড ল্যাম্ব

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

দিগ্বিজয়ী তৈমুর

হ্যারল্ড ল্যাম্ব

অনুবাদ

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৫১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৬

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪১২ আগস্ট ২০০৫

প্রকাশক
হুমায়ূন কবীর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

বানান সমন্বয়
তরুণকুমার মহলানবীশ
সেলিম আলফাজ

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0150-7

ভূমিকা

চেঙ্গিস খানের মতোই—মধ্য-এশিয়ায় আবির্ভূত আরেকজন বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুর লঙ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘ পরিসর জুড়ে তাঁর অধিষ্ঠান। মধ্যযুগের এশিয়ার ইতিহাসে তৈমুর-চরিত্র ঘটনাবহুলতা ও নাটকীয়তায় আজও সকলকে বিস্মিত করে। হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যাপক সন্ত্রাস, দেশজয়, নৃশংসতা ও বর্বরতার একটি মূর্ত প্রতীক তৈমুর। জাতিতে তিনি ছিলেন তুর্কি। স্বীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তিনি দক্ষিণ রাশিয়া থেকে ভারতবর্ষ এবং মধ্য-এশিয়া থেকে তুরস্ক পর্যন্ত। তাঁকে বলা হত তৈমুর লঙ। লঙ মানে খোঁড়া। তিনি এক পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন বলেই খোঁড়া তৈমুর হিসাবে তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি নিজেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন।

অতি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি জীবনে উন্নতিসাধন করেছিলেন। সেই উত্থানের গল্প উপন্যাসের মতোই চমকপ্রদ। তাঁর পিতা আমির তুরগে বারলাস তুর্কিদের গুরখান গোত্রের প্রধান ছিলেন। তৈমুর লঙ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। যুবক বয়সেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী আমির ও সর্দারদের পরাজিত করে সমগ্র তুর্কিস্থানে একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশজয়ে বের হন। সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী, সেনা-পরিচালনার দক্ষতা, দুঃসাহসী বীরত্ব, রাজ্যজয়ের অদম্য স্পৃহা মানব-ইতিহাসে তৈমুরকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। তৈমুরের ভাগ্যে পরাজয়ের লিখন ছিল না। নির্বিচার ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ ও বিভীষিকার আতঙ্ক ছড়াতে ছড়াতে তিনি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিব্রাজন করেছেন।

তিনি আবির্ভূত হয়েছেন মধ্য-এশিয়ায়। তাঁর গৌরবময় পদচিহ্ন ও দুঃস্বপ্নময় স্মৃতির রক্তাক্ত ছাপচিত্র এঁকেছেন তিনি পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার পথে পথে, রাশিয়া জর্জিয়া এশিয়া মাইনরে, সাইবেরিয়ার হিমশীতল তুষাররাজ্যে, আজারবাইজান, কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান আর ইউফ্রেতিস-এর তীরবর্তী অঞ্চলে, এমনকি ভারতবর্ষের দিল্লি পর্যন্ত তৈমুরের আগ্রাসী থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। দিল্লির শাসক সুলতান মাহমুদ তোঘলককে তিনি পরাজিত করেন। স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করে প্রচুর ধনরত্নসহ তিনি ফিরে যান।

সর্বত্রই তিনি ভয়ংকর নিষ্ঠুর, প্রবল প্রতাপান্বিত। যে-পথ দিয়েই গেছেন সেখানেই উড়েছে তাঁর বিজয়ধ্বজ। তাঁর যুদ্ধনৈপুণ্য ও রণকৌশল আজও বিস্মিত করে সকলকে। চেঙ্গিস খান ও মোঙ্গলদের ঐতিহ্য ও কীর্তিকে তিনি ধারণ করেছিলেন। সৈন্যদলকে তৈমুর পরিচালনা করতেন দলবদ্ধভাবে। ক্ষুদ্র দলের নেতৃত্বে যাঁরা থাকতেন তাঁদের সকলকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন কেন্দ্রীয়ভাবে। রাজনৈতিকভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারী।

তৈমুর লঙ জন্মগ্রহণ করেন ১৩৩৬ সালের ৮ এপ্রিল। সমরখন্দের শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ১৩৬৯ সালে। ১৩৭৩ সালে তিনি দেশবিজয়ে বের হন। আমুদরিয়া পেরিয়ে প্রথমেই রাশিয়ার দিকে যাত্রা শুরু হয় তাঁর। ১৪০৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ইরাক, ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, চীন ও ভারতের কিয়দংশ দখল করেন।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তৈমুরের বর্ণিল জীবনের কিয়দংশই আমরা পেয়ে থাকি। তৈমুর লঙের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী জানার জন্য ইতিহাসের উপাদান আমাদের হাতে খুব কমই রয়েছে। ইতিহাসে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভয়ংকর, নিষ্ঠুর একজন মানুষ হিসাবে। কিন্তু এটা সর্বৈব সত্য নয়। শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী সমরখন্দ শিল্পসাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়। মধ্য-এশিয়ার স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রাজপ্রাসাদ, বড় বড় ভবন ও মসজিদনির্মাণে তিনি আনন্দ পেতেন। যুদ্ধ করতে যেখানেই যেতেন সেখান থেকেই স্থপতি, শিল্পী ও মিস্ত্রিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসতেন।

তৈমুর লঙকে নিয়ে অনেক গল্প, কবিতা, নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়েছে কমই। পরাজিত জাতিরা তৈমুরের বীভৎস চিত্র অঙ্কনকেই বরাবর উৎসাহ প্রদর্শন করেছে। কিন্তু যে-মানুষটি একক যোগ্যতায় বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি কি শুধুই ধ্বংস ও হত্যার প্রতীক হতে পারেন? তৈমুর লেখাপড়া জানতেন না। সংগত কারণেই ইতিহাসের গ্রন্থ রচনায় তিনি আগ্রহী ছিলেন না। 'জাফরনামা' নামে তাঁর বিজয়কাহিনী নিয়ে একটি ফারসি গ্রন্থ আছে। ১৬শ শতকে ক্রিস্টোফার মারলোর নাটক 'ট্যামবারলেইন' থেকে তৈমুরের বিভিন্ন রাজ্যজয়ের লোমহর্ষক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৪শ শতাব্দীর শেষদিকে দামেস্কাসের ইতিহাসবেত্তা ইবনে আরব শাহ তৈমুরের জীবনী রচনা করেন। ১৯০৬ সালে জে. এইচ. স্যানডার্স বইটির অনুবাদ করেন।

তৈমুর লঙের বস্তুনিষ্ঠ ও অনবদ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন হ্যারল্ড ল্যাম্ব। সেই বইটির অনুবাদের নূতন সংস্করণ হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে। হ্যারল্ড ল্যাম্ব আমেরিকার একজন ঐতিহাসিক। আরবভূমিতে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে তৈমুর সম্পর্কে অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। মধ্য-এশিয়ার পথে-প্রান্তরে ভ্রমণ করে বিভিন্ন যাযাবর জাতির অতীত ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। তারই একটি হচ্ছে 'দিগ্বিজয়ী তৈমুর'।

হ্যারল্ড ল্যাম্ব এ ছাড়াও চেঙ্গিস খান, নূরমহল ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে ঐতিহাসিক উপন্যাসকার হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

হ্যারল্ড ল্যাম্ব দিগ্বিজয়ী তৈমুর বইটি রচনা করেন ১৯২৮ সালে। বইটি তখনই ব্যাপক সাড়া জাগায় মার্কিন সাহিত্যে।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন বইটির স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করেন ১৯৬৫ সালে। বাংলায় বইটি প্রকাশিত হয় ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস-এর সহযোগিতায়। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরকম একটি চিত্তাকর্ষক, উদ্দীপক ও প্রেরণাসঞ্চারী সুহৃদ গ্রন্থ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত অবস্থায় নেই।

আজকের ইতিহাস-উৎসাহী পাঠকদের জন্যেই মূলত নতুন করে এই বইটি প্রকাশ করা হল।

আমীরুল ইসলাম
৫৫ গোলারটেক, মীরপুর, ঢাকা

সূচনা

সাড়ে পাঁচশত বৎসর আগে এক ব্যক্তি চেষ্টা করেছিলেন দুনিয়ার মালিক হতে। যাতে হাত দিয়েছেন, তাতেই সফলকাম হয়েছেন তিনি। তাঁকে আমরা জানি তৈমুর লঙ বলে।

প্রথমজীবনে ভদ্রলোকের তেমন কিছু গুরুত্ব ছিল না। দিগ্বিজয়ীদের সূতিকাগার মধ্য-এশিয়ায় তিনি ছিলেন সামান্য কিছু জমি ও গৃহপালিত পশুর মালিক মাত্র। তিনি ছিলেন না আলেকজান্ডারের মতো কোনো রাজার বা চেঙ্গিজ খানের মতো কোনো দলপতির পুত্র। জীবনের সূচনাতেই দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার পেয়েছিলেন মেসিডোনিয়ার অধিবাসীদের বশ্যতা আর চেঙ্গিজ খান পেয়েছিলেন মোঙ্গলজাতির আনুগত্য। কিন্তু তৈমুর লঙকে সংগ্রহ করে নিতে হয়েছিল তাঁর নিজ অনুগত বাহিনী।

তারপর তিনি বিজয় লাভ করেন প্রায় আধা-জাহানের সৈন্যবাহিনীর উপর। তাঁর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় বহু নগরী এবং তিনি আবার নিজের খুশিমতো গড়েও তোলেন তাদের। তাঁরই নির্মিত রাজপথ দিয়ে যাতায়াত করেছে দুটি মহাদেশের সওদাগরদের কাফেলা। তাঁর নিজের চেষ্টায়ই বিভিন্ন সাম্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়েছে তাঁর খাজাঞ্চিখানায় এবং বেপরোয়াভাবে তিনি ব্যয়ও করেছেন সেসব। পর্বতশীর্ষকে তিনি পরিণত করেছেন প্রমোদপ্রাসাদে—মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে। জীবনে একজন মানুষের পক্ষে যা সম্ভব, তার চাইতে তিনি বেশি চেষ্টা করেছেন 'এসব কাজের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনায়, আর পরে তা নিজের মনের মতো করে বাস্তবায়িত করায়।'

ইনিই তৈমুর লঙ। এবং তৈমুর লঙ নামেই তিনি আজ সবার কাছে পরিচিত। ইউরোপের সাধারণ ইতিহাসগুলোতে তাঁর সাম্রাজ্যকে অভিহিত করা হয় শুধু তৈমুর লঙের সাম্রাজ্য বলেই। পাঁচ শতাব্দী আগেকার তাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু একে বলতেন তাতারি সাম্রাজ্য। তাঁদের অস্পষ্ট ধারণায় তৈমুর ছিলেন এক প্রবল এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি—যিনি ইউরোপের দ্বারদেশ পেরিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি তাঁবুতে তাঁবুতে আর ঘুরেছেন রাত্রিকালে ভৌতিক আলোকে আলোকিত মানুষের মাথার খুলিতে নির্মিত অত্যুচ্চ প্রাসাদে প্রাসাদে।

এশিয়ায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত—তাঁর গৌরব ও কলঙ্ক দুই নিয়েই। এখানে তাঁর শত্রুরা তাঁকে অভিহিত করেছেন বিশ্বগ্রাসী ভয়াবহ এক ধূসর নেকড়ে বলে; আর তাঁর অনুসারীরা তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন পুরুষসিংহ এবং বিজয়ী বলে।

অন্ধ মহাকবি মিল্টন, মনে হয়, তৈমুর লঙের গালগল্প থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেই এঁকেছেন তাঁর শয়তানের জমকালো মসিবর্ণ চিত্র। কবিদের এই আজগুবি

রূপকথা চিত্রণের পর এল তৈমুর লঙ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নীরবতা। তৈমুরকে কোনো শ্রেণীতে চিহ্নিত করা সহজ হয়নি মোটেই। কোনো রাজবংশের লোক তিনি ছিলেন না; তিনি নিজে একটি বংশের পত্তন করেছিলেন। রোম লুণ্ঠনকারী এটিলার মতো বর্বর ছিলেন না তিনি। তাঁর হামলায়ও নরকের আগুন জ্বলেছে বটে, কিন্তু মরুভূমির সেই ভস্মস্তূপের উপর তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর এক নিজস্ব রোম। নিজের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন বটে এক সিংহাসন, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে কাটাতে হয়েছে ঘোড়ার পিঠের জিনে বসেই। যখন তিনি প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন আগেকার স্থাপত্য-নমুনার অনুসরণ তিনি তাতে কখনো করেন নাই, নিজের খেয়ালখুশিমতোই তিনি গ্রহণ করেছেন নতুন সৃষ্টিতে খাড়া পাহাড় ও পর্বতশীর্ষ আর তাঁরই হামলার সময় দামেশ্‌ক্ শহরে ভস্মীভূত মসজিদের গম্বুজ থেকে নমুনা। তৈমুরের কল্পনার প্রশস্ত গম্বুজই পরে পরিণত হয়েছে রুশীয় স্থাপত্য-নকশার উপাদানে। তাজমহলের চূড়ার নকশা নেয়া হয়েছে সেখান থেকেই। এবং তাজমহল একজন মোগলেরই তৈরি। আর মোগলরা হচ্ছেন তৈমুরেরই পৌত্রবংশীয়।

সেকালের ইউরোপের পূর্ণ ইতিহাসই পাওয়া যায়। আমরা জানি ভেনিসে কী করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'কাউন্সিল অব টেন' (দশ পরিষদ)-এর প্রভুত্ব। এবং দান্তের মৃত্যুর পরবর্তী পুরুষে কী করে রিঞ্জি সেকালের মুসোলিনি হতে পেরেছিলেন। পেট্রার্ক তখন সনেট লিখছিলেন এবং ফ্রান্সে তখন শত বৎসরের যুদ্ধ (Hundred Years war) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে চলেছিল। ফ্রান্সের অর্ধোন্মাদ সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের উদাসীন চোখের উপর তখন প্যারিসের নরঘাতকদের সাথে অরলিয়ান ও বার্গেন্ডির লোকদের সংগ্রাম চলছিল। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে নবীন ইউরোপ তখন সবেমাত্র মাথা তুলছিল। রেনেসাঁসের আগুন তখনো উজ্জ্বল প্রভায় জ্বলে ওঠেনি।

ইউরোপ তখন তাকাচ্ছিল তার সভ্যতার বিলাসসামগ্রীর জন্য প্রাচ্যের দিকে—ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে। পাটের কাপড়, বইয়ের মলাটের কাপড়, গরমমশলা, রেশম, লোহা, ইস্পাত, চীনা বাসনপত্র—এসব তখন সভ্যতার বিলাসসামগ্রী হিসেবে ইউরোপে আমদানি করা হচ্ছিল। সোনা, রুপা ও মূল্যবান পাথরও প্রাচ্যদেশ থেকে ইউরোপে যাচ্ছিল। স্থলপথে বাণিজ্যের ফলে ভেনিস ও জেনোয়া সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। স্পেনের কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডার প্রাসাদসমূহ আরবদেরই সৃষ্টি কনস্টান্টিনোপলও ছিল আধা-প্রাচ্য।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে জংশনের কাছে দেখতে পাওয়া যায় একটা চতুষ্কোণ পাথর—তার একদিকে লেখা আছে 'ইউরোপ' আর অন্যদিকে 'এশিয়া'। তৈমুর লঙের সময়ে যদি এটা স্থাপিত হত, তা হলে পাথরটা থাকত পঞ্চাশ ডিগ্রি দ্রাঘিমার আরো পশ্চিমে, ভেনিসের প্রায় উপকণ্ঠে। তা হলে ইউরোপ মোটেই এশিয়ার একটা প্রদেশের চাইতে বড় হত না। ইতিহাস-লেখকের মতে, সে-প্রদেশটা হত ব্যারন আর ক্রীতদাসদের—সেখানে শহরগুলোর সাথে গ্রামের থাকত না বিশেষ তফাত এবং তাদের প্রবহমান জীবনে থাকত মাত্র কোলাহল এবং নিপীড়িতের আর্তচিৎকার।

আমরা সে-শতাব্দীর ইউরোপের এই চেহারার সাথেই মাত্র পরিচিত। কিন্তু তখন যে-লোকটি সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে এগিয়েছিলেন, তাঁকে জানি

না। তখনকার ইউরোপের লোকদের কাছে তৈমুর লঙের গৌরব-গরিমা মনে হত অপার্থিব এবং তাঁর শক্তি দানবীয়। যখন তৈমুর তাদের দ্বারদেশে এসে হানা দিতেন, ইউরোপীয় রাজারা তখন 'তাতারি সম্রাট মহান তাম্বুরলানে'র কাছে চিঠি এবং দূত পাঠাতেন।

যিনি জার্মান সীমা পেরিয়ে প্রুশীয় নাইটদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, ইংল্যান্ডের সেই রাজা চতুর্থ হেনরি কিন্তু এই অজ্ঞাতপরিচয় বিজয়ীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস স্তুতি জানিয়েছিলেন 'বিজয়ী-শ্রেষ্ঠ অচঞ্চল রাজা তিমুর' বলে। বুদ্ধিমান জেনোয়ার লোকেরা কনস্টান্টিনোপলের বাইরে তাঁর নিশান-বরদার দলে নাম লিখিয়েছিল। গ্রিকসম্রাট ম্যানোয়েল তাঁর সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ক্যাস্টাইলের দৈবী প্রভাবসম্পন্ন রাজা লর্ড ডন হেনরি তাঁর একজন নাইট রু দ্য গঞ্জালিস ক্লাভিজোকে তৈমুরের কাছে পাঠিয়েছিলেন নিজের দূত হিসেবে এবং ক্লাভিজো তৈমুরকে অনুসরণ করে গিয়েছিলেন সমরখন্দ পর্যন্ত। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি নিজের মতো করে রাজদরবারে তৈমুরের পরিচয় পেশ করেছিলেন। সে-বিবরণের কিছুটা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

'সমরখন্দের মালিক তৈমুর লঙ দখল করেছেন মোঙ্গলদের সব রাজ্য এবং ভারত। আরো দখল করেছেন বিশাল রাজ্য সূর্যের দেশ। তা ছাড়া গুঁড়িয়ে দিয়েছেন খারেজম রাজ্য, পারস্য ও মিডিয়া এবং তাব্রিজ সাম্রাজ্য ও সুলতানের শহর। সিংহদ্বারের দেশের সাথে রেশমের দেশও তিনি অধিকার করেছেন। আর আর্মেনিয়া, আর্জরুম এবং কুর্দদের দেশ অধিকার করে তিনি ভারতের রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তার অনেকটা অংশ দখল করে নিয়েছেন। তিনি দামেশ্‌ক, আলেপ্পো, ব্যাবিলন ও বাগদাদ শহর বিধ্বস্ত করেছেন। আরো অনেক দেশ ও রাজ্য বিধ্বস্ত ও দখল করার পর তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট তুর্কি বায়েজিদের মোকাবিলা করেন। বিরাট যুদ্ধের পর সেখানেও তিনি জয়লাভ করেন এবং বায়েজিদকে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে যান।'

তৈমুরের সমরখন্দের দরবারে ক্লাভিজো দেখেছিলেন দুনিয়ার বহু রাজবংশের রাজকুমারীগণকে, আর দেখেছিলেন মিশর ও চীনের রাজদূতদেরকে। নিজে তিনি ফ্রাঙ্কদের দূত হিসেবে সেখানে সমাদরের সাথেই গৃহীত হয়েছিলেন—'যেহেতু সাগরে ক্ষুদ্রতম মৎস্যেরও স্থান আছে।'

ইউরোপের রাজরাজড়ার মিছিলে কিন্তু তৈমুরকে কোনো স্থান দেওয়া হয় নাই। ইতিহাসের পাতায় অবশ্যি একটা ক্ষণস্থায়ী ধারণাসৃষ্টির এই চেষ্টা আছে যে, তিনি সর্বত্র একটা ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এশিয়ার লোকের কাছে তিনি এখনো শাহানশাহ।

দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী পরে এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন সর্বশেষ দিগ্বিজয়ী বীর। নেপোলিয়ান ও বিসমার্কের স্থান সুনির্দিষ্টই রয়েছে—তাঁদের জীবনের সব কথাই আমরা জানি। তাঁদের একজনের জীবনাবসান হয় ব্যর্থতার মধ্যে, অন্যজন একটি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জয়গৌরব লাভ করেন। কিন্তু

তৈমুর লঙ নিজেই এক বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টিকর্তা। প্রতিটি অভিযানেই তিনি বিজয়গৌরব লাভ করেছেন এবং তাঁরই প্রায় সমপ্রতিদ্বন্দ্বী শেষ শক্তির সাথে মোকাবিলা করবার জন্য অগ্রসর হয়ে মাঝপথেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি কী করতে চেয়েছিলেন, তা বুঝতে হলে লোকটির জীবনধারার সন্ধান নিতে হয়। তা করতে হলে ইউরোপের ইতিহাসগুলোকে সরিয়ে রাখতে হবে এবং বর্তমান সভ্যতা ও সে-সম্পর্কে সৃষ্ট ধারণা থেকে আমাদের মনকে মুক্ত করতে হবে। আর তাঁর পার্শ্বচরদের চোখ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে হবে তাঁর কার্যকলাপ।

ক্লাভিজো যা করেছিলেন, আমাদেরও তেমনিভাবে বিভীষিকার পরদা ভেদ করে সম্মুখে দৃষ্টিসঞ্চালন করতে হবে। আমাদেরও মাথার খুলির প্রাসাদ, কনস্টান্টিনোপল এসব পেরিয়ে সাগরের উপর দিয়ে এশিয়ায় নামতে হবে—তারপর সূর্যের দেশের রাজপথ বেয়ে সমরখন্দের রাস্তায় পৌঁছতে হবে।

তখন সময়টা হচ্ছে ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ।

স্থান একটা নদী।

১
মা-অরা-উন্নাহার

ক্লাভিজো বলেছেন : 'এ-নদী হচ্ছে বেহেশত থেকে প্রবাহিত চারটি নদীর একটি। দেশটি আনন্দময়, প্রফুল্ল ও সুন্দর।'

মাথার উপর নির্মেঘ আকাশ। দূরে পর্বতের নীল শিখরদেশ বরফমণ্ডিত পর্বতশীর্ষের দিকে ঠেলে উঠেছে। তাকে বলা হয় মহিমাময় সুলায়মান। তার পাদদেশে প্রসারিত তৃণাচ্ছাদিত চারণভূমি, উচ্চতর হিমশীতল পর্বতশ্রেণী থেকে উৎসারিত ঠাণ্ডা পানির স্রোতোধারাগুলো বয়ে চলেছে। এসব উচ্চভূমিতে মেষকুল চরে বেড়ায় এবং রোমশ টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে মেষচালকেরা এদের পাহারা দেয়। নিম্নে গ্রামের নিকটে উপত্যকাভূমিতে গবাদি পশুগুলো বিচরণ করে।

নদীটি পাথুরে-চুনার গাদায় পড়ে মোড় খেয়েছে। তারপর তুঁতগাছের আঁধার ভেদ করে, আঙুর গাছের জটলা অতিক্রম করে সোজা গিয়ে সুদীর্ঘ উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এর থেকে খাল পেরিয়ে ধান, তরমুজ ও বার্লির ক্ষেতে গিয়ে পড়েছে। সেখানকার সেচকাজের নর্দমাগুলোতে ঘূর্ণায়মান চাকার পানি আন্দোলিত হয় ধীরে ধীরে।

নদীটির নাম আমুদরিয়া। স্মরণাতীত কাল থেকে এই নদী ইরান ও তুরানের সীমারেখা—উত্তর ও দক্ষিণ দেশ দুটির মধ্যকার সীমা। দক্ষিণে রয়েছে সূর্যের দেশ খোরাসান—ইরানিরা সেখানে ফারসিভাষায় কথা বলে এবং জমি চাষ করে। তারা পাগড়িধারী শান্তপ্রকৃতির লোক এবং প্রাচীন এশিয়ার ভিক্ষুক জাতি।

উত্তরদিকে দূরে রয়েছে তুরান। তারই অভ্যন্তরভাগ থেকে বেরিয়ে এসেছিল যাযাবর জাতি। এরা ছিল শিরস্ত্রাণপরিহিত। পশুপালন ও রেসের ঘোড়া তৈরি করা ছিল এদের পেশা। নদীটি ছাড়া আর কোনো সীমারেখা নাই। নদীর উত্তরদিককার ভূমিখণ্ডকে বলা হত মা-অরা-উন্নাহার (নদীর ওপার)।

সমরখন্দ যেতে এখানেই ভ্রমণকারীরা নদী পার হত। সেখান থেকে তারা আঁকাবাঁকা গিরিপথ ও গভীর ওক-বন পেরিয়ে গিয়ে প্রবেশ করত গিরিসংকটের উদরদেশে। সেখান থেকে বালুর পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে ছয়শত ফুট উঁচুতে। ধ্বনির উত্তরে প্রতিধ্বনির বিদ্রূপ এখানে হয় উচ্চারিত। এই লাল গিরিসংকটের অন্ধকারেই রয়েছে, যাকে বলা হত লৌহ-তোরণ (Iron Gate)। সেখান দিয়ে মাল-বোঝাই দুটো উটের বেশি পাশাপাশি যেতে পারত না। এখানকার কালো চেহারার অধিবাসীরা বল্লমের উপর ভর দিয়ে চেয়ে থাকত ভ্রমণকারীদের দিকে।

লোকগুলো বিশালাকায়। তাদের সরু গোঁফ বিস্তীর্ণ কপোলদেশে এসে পড়েছে।

তারা কথা বলে ধীরে ধীরে টেনে টেনে। তাদের মধ্যে রয়েছে অস্ত্র হিসেবে লোহার শিকলের ব্যবহার। শিরস্ত্রাণ তাদের ঘোড়ার লেজ-চিহ্নিত। এরাই ছিল তাতারিদের রক্ষীদল।

লৌহ-তোরণের ওধারে সওদাগরদের কাফেলার যে প্রথম বিশ্রামস্থানটি, তা পর্বতবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীপ্রবাহিত উর্বর ভূমিতে অবস্থিত। জায়গাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'গ্রিন সিটি' (সবুজ-নগরী)। এর চারদিকে ছিল একটি জলপূর্ণ পরিখা। মুকুলিত ডুমুর ও খুবানি গাছের সারির ভিতর দিয়ে উঠেছে সমাধিস্তম্ভের গম্বুজ এবং বল্লমের মতো সরু মিনারসমূহ। মিনারগুলো পাহারাদারদের বুরুজঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হত।

এই সবুজ-নগরীতেই তৈমুর লঙের জন্ম হয়। তিনি এ-নগরীকে ভালোও বাসতেন। কাঠ ও কাদায় তৈরি ছিল তাঁর বাড়িখানা। সে-বাড়ি ছিল দেয়ালবেষ্টিত, আর দেয়ালের ভিতরে ছিল একটি বাগান। বাড়ির সমতল ছাদটিতে ছিল ক্ষুদ্র প্রাচীর—সেখানে একটি ছেলে দিব্বি অদৃশ্যভাবে শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যায় যখন মেষ ও গোরুর পাল মাঠ থেকে ঘরে ফিরে আসে, তখন মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পারত।

সেখানে চকচকে রেশমের কাপড়পরা দাড়িওয়ালা লোকেরাও আসত এবং শোয়ার কম্বল বিছিয়ে নানাশ্রেণীর গল্পগুজবে মেতে উঠত। তাতে থাকত কাফেলাদের কথা, সেদিন কী কী ঘটেছে তার আলোচনা ইত্যাদি। তবে যুদ্ধের আলোচনা কোনোদিনই বাদ পড়ত না। কারণ সবুজ-নগরীর মাথার উপরে যুদ্ধের ছায়া লেগেই থাকত।

তৈমুর লঙকে প্রায়ই একথা শুনতে হত, 'মানুষের পথ মাত্র একটিই'—'ইরিন মোর নিগেন বুই।'

তিনি অবশ্যি এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন না। কোনো-কোনো সময়ে গম্ভীরভাবে কোরান শরিফের আয়াত আবৃত্তি করতেন মাত্র। বুড়োলোকদের কথাই ছিল সেখানে আইন। ছেলেরা কিন্তু মেতে থাকত তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই। খাপে-বদ্ধ তলোয়ারের ধার বা ভাঙা বল্লমের বাঁট নিয়ে তারা চালাত গবেষণা।

এই ছেলেরা ঘোড়দৌড়ের মধ্য দিয়েই বড় হয়ে উঠত এবং সমরখন্দের রাস্তায় মাঠের ভিতর দিয়ে বাজি রেখে দৌড়-প্রতিযোগিতা চালাত। তীর দিয়ে তারা ভারুই পাখি ও শিয়াল শিকার করত এবং এসব শিকার-করা জিনিস তারা ঝুলন্ত পাহাড়ের নিচে তাদের 'প্রাসাদে' এনে সযত্নে রক্ষা করত। এ নিয়ে তারা দুর্গ-অবরোধের খেলা খেলত। তাদের কুকুরগুলো সে-সময়ে ঘুমাত আর ঘোড়াগুলো চরে বেড়াত মাঠে। তৈমুর ছিলেন এদের নেতা। এই মক-ফাইটের খেলায় তিনি তিন-চার জনের বেশি লোক রাখতেন না।

তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবেই খেলতেন এ-খেলা। খেলার সময় হাসতেন না কখনো। তাঁর ঘোড়াগুলো যদিও তাঁর সাথিদের ঘোড়াগুলোর চাইতে ভালো ছিল না, তবু তিনিই ছিলেন সবচাইতে ভালো ঘোড়সওয়ার। তলোয়ারবাজি করার উপযুক্ত বয়সে যখন তাঁরা পৌঁছুলেন, তখন তাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব।

সম্ভবত তাঁর মনোভাবের এই গভীরতা তাঁর নির্জনতা-প্রিয়তারই ফল। শৈশবেই তিনি হন মাতৃহারা। তাঁর পিতা ছিলেন বারলাস তাতারদের একজন দলপতি। অধিকাংশ সময় তাঁর কেটেছিল সবুজ পাগড়িধারী দরবেশদের সংসর্গে। এ-দরবেশরা ইসলামের পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন করায় সকলের ভক্তি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। পুত্র তৈমুরের বাজপাখি, কুকুর ও অন্য সাথিরা ছিল বটে, কিন্তু গৃহে তাঁর ছিল মাত্র দুজন পরিচারক। ঘোড়া যা ছিল, তাতে আস্তাবলের অর্ধেকও পূর্ণ হত না। পিতা অবশ্য কোনো শাসক-দলপতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন বটে সৈন্য-বিভাগের নামকরা বংশোদ্ভূত লোক, কিন্তু তিনি ছিলেন গরিব।

বালক তৈমুর মাঠের উপর দিয়ে ছুটাতেন ঘোড়া আর নিজের নির্দিষ্ট স্থানে বসে বসে চেয়ে থাকতেন সমরখন্দের রাস্তার দিকে। এই রাস্তা দিয়ে অশ্বারোহী ইরানি কাফেলা চলে যেত, বোরখাপরা তাদের রমণীদের ঘিরে চলত সশস্ত্র রক্ষীদল। তাতার-রমণীরা বোরখা পরতেন। ক্ষীণকায় আরব সওদাগরেরা ক্যাথে থেকে আহরিত কিংখাবের এবং উপর দেশের তৈরি কম্বল ও রেশমের গুটির বোঝা ঘোটক-বাহিনীর পিঠে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে তাদের হাঁকিয়ে চলতেন। খরিদা গোলামের কাফেলা, থালা-বাটিসহ ভিক্ষুকশ্রেণী এবং শিষ্য-সংগ্রহেচ্ছু সাধুর দলকেও ধূসর ধুলা-সমাকীর্ণ এই রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখা যেত।

কখনো কখনো আফগান দস্যুদের গল্পরত উটসহ এক-আধজন ইহুদি বা দুই-একজন কৃষ্ণকায় হিন্দুকেও রাস্তায় দেখা যেত। সন্ধ্যায় পশুদের ঘিরে পড়ত তাদের তাঁবু। সেখানে রান্নাবান্নার জন্য যে-আগুন জ্বালানো হত, তা থেকে বেরিয়ে আসত সোম কাঠ ও গোবরের গন্ধ। তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে হাঁটু গেড়ে বসে তৈমুর শুনতেন তাদের গল্প। গল্পে আলোচনা চলত জিনিসের দাম এবং সমরখন্দের নানা বিষয় নিয়ে। তাঁর পিতা কাফেলার সাথে বসে থাকার জন্য তাঁকে তিরস্কার করলে, তৈমুর উত্তর দিতেন : 'মানুষের পথ মাত্র একটিই।'

২
শিরস্ত্রাণধারী দল

এই উপত্যকার সবটুকুই ছিল বারলাস গোত্রের উত্তরাধিকার। এ অবশ্য তাদের অর্জিত সম্পত্তি ছিল না। চাষাবাদের এবং গৃহপালিত পশু চরাবার জমি, আঙুর-বাগান ও চারণভূমি ততদিনই থাকত তাদের অধিকারে, যতদিন এসব দখল করে রাখবার শক্তি তাদের থাকত। পাহাড়ের ওপার থেকে বহু আগেই খান তাঁর বংশের লোকদের দান করেছিলেন এই ভূমি এবং তারা স্কটল্যান্ডের গোষ্ঠীগুলোর মতো তাদের দলপতির মর্যাদা, কৌশল ও তরবারির বদৌলতে এগুলো রক্ষা করে চলত। এরা ছিল তাতার—লম্বা-পা ও মোটা-হাড় তাতার। এরা দাড়ি রাখত এবং এদের চেহারা ছিল রৌদ্র-দগ্ধ। প্রয়োজন হলে তারা হেঁটেও যেত—সগর্বে এবং কারো দিকে না চেয়ে। অবশ্যি নিজের

চাইতে শ্রেষ্ঠ কোনো তাতারের সাথে দেখা হলে এ-নিয়মের ব্যতিক্রমও হত।

তাদের সবাই পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচলিত মোটা শক্ত ঘোড়ার রজ্জু ধরে চলত। তাদের মধ্যে ভাগ্যবান কয়েকজন মাত্র পোলো-খেলার মাঠে শিক্ষিত দ্রুত গতিশীল বেগবান ঘোড়ায় বা পানিতে আরোহণ করার অধিকার লাভ করত। তাদের লাগামগুলো হত রুপার কাজ-করা ও ভারী। ঘোড়ার জিনগুলোতে রেশমের কারুকার্য তারা পছন্দ করত। এই তাতারদের মধ্যে যারা ছিল সবচাইতে গরিব, তারাও কখনো ঘোড়ায় না চড়ে তাঁবু থেকে মসজিদ পর্যন্ত যাওয়ার কল্পনা করতে পারত না।

নিজেদের পছন্দ ও প্রথামতো তৈরি তাঁবুতে তারা বাস করত। বলত, 'কাপুরুষেরাই মাত্র লুকিয়ে থাকবার জন্য প্রাসাদ তৈরি করে।' কিন্তু তাদের তাঁবুগুলোতে থাকত শাদা পশমের গম্বুজ বা কার্পেটের শামিয়ানা। অনেকে শহরের ভিতরেও নানা ধরনের বাসাবাড়ি করত; সেখানে করা হত অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন কিংবা প্রয়োজনের সময়ে দেয়া হত মেয়েদের আশ্রয়। এক শতাব্দী পূর্বেও তাতাররা সত্যিকারভাবে যাযাবার ছিল এবং মরুভূমিতে চারণভূমি খুঁজে বেড়াত। যুদ্ধই তাদের পূর্বপুরুষগণকে বেশিরভাগ এশিয়ার মালিক করেছিল। এরা যুদ্ধেরই সন্তান। এরা বিশ্বাস করত, 'মরুভূমির বালি নিশ্বাসেই উড়ে যায়, কিন্তু তার চাইতেও অল্পক্ষণের মধ্যে হয়ে থাকে মানুষের ভাগ্যবিপর্যয়।'

তাদের ভোজের ব্যাপার ছিল বিরাট। মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাদের কাঁদতেও দেখা গেছে বটে। কিন্তু যুদ্ধে তাদের মুখে হাসিই লেগে থাকত। তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই ছিল যাদের অঙ্গে দেখা যেত না অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ঘরে কখনো তাদের কারুর মৃত্যু হত না। সাধারণত তারা হালকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরুত—অবশ্যি সিল্কের ডোরাওয়ালা অতিরিক্ত কোটের সাথে তাদের ভারী অস্ত্রাদি বাঁধা থাকত। মরুভূমির যুদ্ধের সহজাত-সংস্কার তখনো তাদের মধ্যে ছিল অবশিষ্ট।

শান্তির বিরতির সময়ে তাদের পেয়ে বসত শিকারের নেশা। তখন তারা তাদের মেষ ও গৃহপালিত পশুগুলোকে রেখে যেত শিক্ষিত বাজপাখির তত্ত্বাবধানে। পাহাড়ি লোকেরা তাদের কাছে বাজপাখিগুলো বিক্রির জন্য নিয়ে আসত। ভালো শিকারি বাজপাখি বাড়াত তাদের মর্যাদা। কিন্তু যেসব সোনালি ঈগল তাদের হরিণ-শিকারে সহায়ক হত, সেগুলো তাদের সমগ্র বংশেরই মর্যাদা বাড়াত। তাদের কেউ-কেউ শিকারি চিতাবাঘও পুষত। সেগুলোকে চোখ বেঁধে ঘোড়ার জিনের উপর বসিয়ে রাখা হত এবং কোনো হরিণ নজরে পড়লেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হত। তারা তখন ঘোড়ার পিঠে বসে চিতাবাঘের শিকার দেখত।

লম্বা ভারী ধনুক ব্যবহারে তারা ছিল নিপুণ। দুধারী তীর ছুড়ে তারা শিকার করত পাখি। বাঘ-শিকারের সময় তারা হেঁটে যেত। খাওয়ার সময়ে তারা সকলে কার্পেটের উপর হাঁটু গেড়ে একটা এজমালি-খাবার-পাত্রে একযোগে খেত। কুকুরগুলো তখন বসে থাকত তাদের পিছনে আর বাজপাখিগুলো দাঁড়ে বসে চিৎকার করত।

শিকার-করা জিনিসগুলো এবং ঘোড়ার গোশ্‌ত—এই ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য। তবে আরবদের খাদ্য—উটের পিছনদিককার মাংস সম্পর্কে তাদের ছিল একটা দুর্বলতা।

আরবদের বীরত্বের তারা প্রশংসা করত। মরুভূমির এই যাযাবরদের মতো তারাও ছিল অশান্ত—এবং যতক্ষণ-না ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকারে বা যুদ্ধাভিযানে যোগ দিতে পারত, ততক্ষণ তারা শান্ত হত না। রাজা-বানানেওয়ালার দরবারেই তাদের সময়ের বেশিরভাগ কাটত।

সৈনিকশ্রেণীর সম্মানই ছিল বারলাস-গোষ্ঠীর গর্ব। তলোয়ারের আভিজাত্য ছিল তাদের কাছে সবচাইতে বড়। ইরানি বণিক বা কৃষকসমাজে বিয়ে করলে তাদের জাত যেত। ফলে দরিদ্র ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে তারা মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

তাদের উদারতার বহর ছিল যেমন যুক্তিহীন, তেমনি অযৌক্তিক ছিল তাদের দুর্দমনীয়তা ও নিষ্ঠুরতা। ভূরিভোজের খরচ মেটাতে গিয়ে সমস্ত সম্পত্তি খোয়াতেও তাদের বাধত না। অতিথিপরায়ণতা ছিল বাধ্যতামূলক ব্যাপার। তাদের গৃহপ্রাঙ্গণ পথিক-পর্যটকে পূর্ণ থাকত। আর তাদের মেষ-ভেড়ার পাল ক্রমে মুটিয়েই চলত। বারলাস তাতার-গোষ্ঠীর লোক ছাড়া এই সবুজ শহরের অন্যসব অধিবাসীর অবস্থা ছিল ভালো। ইরানি কৃষকরা ধৈর্যসহকারে তাদের সেচের কাজ করে যেত। নগরবাসী দরজিরা বাজারে তাদের দোকান চালিয়ে যেত। ইরানি বড়লোকেরা জুয়া খেলত, বাগানবাড়ি তৈরি করত, আর কোরানের কেরআত শুনত। পাগড়িধারীরা মেনে চলত কোরানের অনুশাসন, কিন্তু শিরস্ত্রাণধারীরা তখনো অনুসরণ করত চেঙ্গিজ খানের আইনই।

দলপতি না-থাকায় বারলাস-গোষ্ঠীর লোকদের অবস্থা ছিল সবচাইতে খারাপ। একসময়ে তারাঘাই ছিলেন তাদের দলপতি, তিনি মর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রস্বভাবের লোক। ইসলামি আইনের ব্যাখ্যাদাতাদের কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সে-সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তিনি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এই তারাঘাই হলেন তৈমুরের পিতা। সে-সময়ে সবুজ-নগরীর বাইরে কাদার প্রাসাদে বাস করত না কেউ।

তারাঘাই তাঁর ছেলেকে বলতেন, 'এ-দুনিয়া বৃশ্চিক ও সর্পে ভরতি সোনার পাত্রের চাইতে ভালো কিছু নয়। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

অন্যান্য পিতাদের মতো তিনিও ছেলেকে তাঁর পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা শুনিয়েছেন। বহু দূর উত্তরে গোবি মরুভূমি ও পর্বতশ্রেণীর মালিক ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষরাই। দুনিয়াদারির মায়া কাটিয়ে ফেললেও মনে হত তারাঘাই তাঁর পৌত্তলিক পূর্বপুরুষদের গল্প বলতে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, কত অশ্বারোহী-বাহিনী যে তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো নিয়ে বরফমণ্ডিত রাস্তার উপর দিয়ে যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়ে নিজেদের পতাকা উন্নত করে ধরে ক্যাথে লুট করতে ছুটে গেছে, কে তার হিসাব রাখে। তিনি বলে যেতেন, উপজাতীয়দের শিকার চলত প্রায় পাঁচশত মাইল জায়গা জুড়ে দুই-তিন চন্দ্রমাস ধরে। কোনো-এক দলপতির কবরে বহু শাদা ঘোড়া বলি দেওয়া হয়েছিল এবং সে-ঘোড়াগুলো দেবতাদের সেবা করার জন্য আলোকিত আসমানের দরজা দিয়ে কী করে চলে গিয়েছিল, সে-গল্পও তিনি ছেলেকে শুনিয়েছেন।

তিনি তাঁর গল্পে নাম ধরে ক্যাথের রাজকুমারীদের কথা উল্লেখ করতেন। মরুভূমির খানদের কাছে এঁদের পাঠানো হয়েছিল বধূ হিসেবে এবং তাঁদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল গাড়িবোঝাই রেশম ও খোদাই-করা হাতির দাঁত। বিজয়ী সৈন্যরা শত্রুদের স্বর্ণমণ্ডিত মাথার খুলিতে ঘোড়ার দুধ পান করতেন—সে-গল্পও তিনি ছেলের কাছে বলেছেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন, 'পুত্র, চেঙ্গিজ খান বিশ্ববিজয়ে বের হবার পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই চলে আসছিল। এমন যে হবেই, এ ছিল বিধাতার লিখন। মৃত্যুদূত যখন চেঙ্গিজ খানের কাছে আবির্ভূত হলেন, তিনি তাঁর বিশাল পৃথিবী চারটি সাম্রাজ্যে ভাগ করে জীবিত তিন পুত্র ও মৃত জ্যেষ্ঠপুত্রের ছেলেকে দিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের যে-অংশে আমাদের বাস, চাগাতাইয়ের ভাগে পড়েছিল। কিন্তু চাগাতাইয়ের বংশধরগণ শিকারে এবং মদে ডুবে থাকতেন। তাঁরা যথাসময়ে উত্তরদিকের পাহাড়ে চলে গেলেন। বর্তমান খান (তুরা) সেখানে ভোজ ও শিকার নিয়ে মেতে আছেন। আর সমরখন্দ এবং নদীর এপারটার শাসনভার ন্যস্ত আছে যাঁর উপর, তাঁকে বলা হয়ে থাকে রাজা-বানানেওয়ালা। তার পরের কথা তুমি তো জানোই।'

মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি গল্পের উপসংহার করতেন এই বলে, 'কিন্তু পুত্র! আমি তোমাকে আল্লার আইনের রাস্তা থেকে দূরে সরে যেতে দেব না। আল্লারই পয়গম্বর হলেন মোহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। শিক্ষিত সৈয়দগণকে শ্রদ্ধা কোরো এবং দরবেশদের থেকে দোওয়া চেয়ো। ইসলামি আইনের চার স্তম্ভে মতি রেখে শক্তিমান হয়ে ওঠো। চার স্তম্ভ হচ্ছে : নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত।'

তারাঘাই সব ছেড়ে দিলেন ছেলের ওপর। মসজিদের ইমামদের দৃষ্টি পড়ল তৈমুরের উপর। জনৈক বুড়ো সৈয়দ তৈমুরকে ঘরের কোণে বসে কোরান পড়তে দেখে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে বালক বলল : 'আমি তৈমুর।'*

নবীর বংশধর বালকের পঠিত কোরানের অংশের দিকে চেয়ে দেখে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। পরে বললেন : 'ইসলামে ইমান রেখো—তা হলে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

তৈমুর প্রতিশ্রুত হলেন। কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিলেন তাঁর প্রিয় পোলো এবং দাবাখেলা। রাস্তার উপর উপবিষ্ট কোনো দরবেশের সাথে দেখা হলেই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দরবেশের দোয়া চাইতেন। তিনি খুব সহজে কোরান পড়তে পারতেন না, তাই যে-পর্যন্ত-না সমগ্র কোরান পড়তে শিখলেন, ততদিন একটিমাত্র সুরাতেই তাঁর পাঠ সীমাবদ্ধ ছিল।

---

* তৈমুর মানে লৌহ, লঙ মানে খোঁড়া। তৈমুরই হচ্ছে আসল নাম। তীরের আঘাতে তাঁর পা খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আজীবন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত। এশিয়ার ঐতিহাসিকরা তাঁকে বলেন আমির তৈমুর গুরিগান। 'গরিমাময়' হচ্ছে গুরিগানের মানে। নিন্দাচ্ছলেই তাঁকে 'লঙ' বলা হত।

তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। তিনি মসজিদ-প্রাঙ্গণে ইমামদের কাছে প্রায়ই যেতেন। মসজিদে নামাজিদের পেছনে যেখানে জুতো রাখা হত, সেইখানে সাধারণত বসতেন। জইনুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি তৈমুরকে সবার পিছনে বসে থাকতে দেখে তাঁকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাঁকে নিজের টুপি, শালের কটিবন্ধ ও আংটি দিলেন। জইনুদ্দিন ছিলেন একজন সত্যিকার বুদ্ধিমান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এই ব্যক্তির উৎসুক চাহনি, গম্ভীর ভাষণ এবং সম্ভবত তাঁর দেওয়া উপহারের কথা তৈমুরের বহুদিন মনে ছিল।

বারলাস-গোষ্ঠীর একমাত্র নেতা ছিলেন হাজি বারলাস। তিনি হলেন তৈমুরের চাচা। তিনি কদাচিৎ সবুজ-নগরীতে পদার্পণ করতেন। মক্কায় গিয়ে তিনি হাজি হয়েছিলেন। তৈমুর সম্পর্কে কোনোরূপ কৌতূহল তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন সন্দিগ্ধমনা, আবেগপ্রবণ এবং বিষণ্ণপ্রকৃতির লোক। তাঁর পরিচালনায় বারলাস-গোষ্ঠীর ভাগ্য মন্দ হতে মন্দতর হয়ে উঠেছিল।

অধিকাংশ যোদ্ধা ও অভিজাত ব্যক্তিই রাজা-বানানেওয়ালার (কিংমেকার) দরবারে চলে গিয়েছিল। পিতার উপদেশমতো তৈমুরও সেখানেই চলে গেলেন।

৩
সালি সরাইয়ের রাজা-বানানেওয়ালা

সে-সময়ে তৈমুর—তখনো আমরা তাঁকে তৈমুর লঙ বলে অভিহিত করতে পারি না—ছিলেন আয়েশ-আরামপ্রিয় একজন তরুণ ভদ্রলোক। কিন্তু তৈমুরের আয়েশ-আরামের মানেই হচ্ছে কর্মতৎপরতা। তিনি ছিলেন দশাসই চেহারার শক্তিমান পুরুষ—সুষ্ঠু-গঠন, প্রশস্ত কাঁধ এবং লম্বা হাত-পা-ওয়ালা মানুষ। দেহের সাথে সমতা রক্ষা করে তাঁর মাথাটি ছিল বেশ বড়। তাঁর গলা ছিল সুউন্নত। পূর্ণায়ত কৃষ্ণবর্ণ চোখদুটি তাঁর ধীরে ধীরে নড়ত এবং তাঁর দৃষ্টি মানুষের মর্মস্থল ভেদ করত। তাঁর কপোলদেশের হাড় এবং মুখ ছিল প্রশস্ত ও স্পর্শকাতর—তাঁর বংশের লোকের যেমন হয়ে থাকে। ও ছিল তাঁর জীবনীশক্তির পরিচায়ক। তাঁর ভেতর যা তেজ ছিল, আর একটু উগ্র হলে তাকে বন্য হিংস্রতাও বলা চলত। বেশি কথাবার্তা তিনি বলতেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গভীর এবং তীক্ষ্ণ। রং-তামাশা তিনি পছন্দ করতেন না এবং জীবনে কখনো তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপের ধার ধারেন নাই।

শীতকালে মুক্তমাঠে সঙ্গীসহ তৈমুরের হরিণ-শিকারের একটি বিবরণের সংক্ষিপ্ত-সার এখানে দেওয়া হচ্ছে। শিকারিদলের পুরোভাগে ছিলেন তৈমুর। তাঁর ঘোড়া হঠাৎ এক প্রশস্ত গভীর খাদের কাছে এসে পড়ল। তৈমুর ঘোড়া ফিরাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে লাফ দিয়ে খাদ পার হওয়ার জন্য কিছুটা নিচু হলেন। কিন্তু ঘোড়াটা ঠিকমতো খাদটা পার হতে পারল না—সম্মুখের পা পিছলিয়ে সে পড়ে গেল। তরুণ তাতার তখনই ঘোড়ার পিঠ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দূরে নিরাপদ জায়গায়

ছিটকে পড়লেন। ঘোড়াটা পড়ে গিয়ে অকর্মণ্য হয়ে গেল। তৈমুর খাদ থেকে এগিয়ে তাঁর সঙ্গীদের কাছে গেলেন এবং অন্য একটি ভালো ঘোড়ায় চড়লেন।

দিনের আলো তখন কমে আসছিল। শিকারিদল প্রত্যাবর্তন করল। অন্ধকারের সাথে সাথে ভারী বৃষ্টি নেমে এল। মুক্ত প্রান্তরে তাঁরা পথ হারিয়ে ফেললেন। শীতে তাঁরা ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। পথ চলতে চলতে কালো মাটির ঢিবিগুলোকে তাঁবুর মতো মনে হচ্ছিল তাঁদের। তৈমুরের সঙ্গীরা বলল, 'এগুলো বালির পাহাড়'। তারাঘাইয়ের পুত্র ঘোড়ার পিঠে লাগাম ছেড়ে দিলেন এবং তার কেশর শক্ত করে ধরলেন। ঘোড়া গলা বাড়িয়ে হ্রেষাধ্বনি করল। তৈমুর মাটির ঢিবিগুলোর দিকে ঘোড়া চালালেন। হঠাৎ একটা আলো দেখা গেল। ক্রমে দেখা গেল, কালো ঢিবিগুলো বৃষ্টিধারায় স্নাত পশমের তাঁবু ছাড়া আর কিছু নয়।

মরুদস্যু মনে করে কতকগুলো কুকুর ও মানুষ এই তরুণ তাতারের দলটিকে তাড়া করে এল।

তৈমুর চিৎকার করে বললেন, 'তাঁবুওয়ালাগণ, ভয় নাই—আমি তারাঘাইয়ের পুত্র।'

মুহূর্তে অস্ত্র সংবৃত হল এবং আতিথ্যের ধুম পড়ে গেল। অতিথিদের জন্য আগুনে সুরুয়ার পাত্র চাপানো হল এবং শুকনো জায়গায় লেপ-তোশক দিয়ে বিছানা তৈরি করা হল। লেপের ছারপোকায় ঘুমানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। তৈমুর তখন সে-আশা ত্যাগ করে আগুন উসকে দিয়ে গল্প করতে লাগলেন। তাঁবুওয়ালারা গল্প শুনতে লাগল। ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠল এবং বৃষ্টিও থেমে গেল। কয়েক বৎসর পরে তৈমুর এই কালো তাঁবুর মালিককে পুরস্কার পাঠিয়েছিলেন।

ইসলাম-জগতের সেই প্রাথমিক যুগে আতিথেয়তা যেমন বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল, তেমনি একইভাবে তা পরিশোধও করতে হত। তাতাররা ছিল শ্রেষ্ঠ পর্যটক। তৈমুর সমরখন্দ থেকে সূর্যের দেশ পর্যন্ত প্রতি জায়গায় তাঁবুতে তাঁবুতে এবং দরবারে দরবারে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন। অল্প কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে, কিংবা মরুভূমির প্রান্ত দিয়ে মাত্র তরবারি ও হালকা ধনুক সম্বল করে তিনি পক্ষকালের মধ্যে সুদীর্ঘ এক হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারতেন। সওদাগরি শিবিরের আরবরা তাঁর মতো একজন দলপতির পুত্রের আগমনে নিজদিগকে সম্মানিত মনে করে তাঁর সাথে আলাপ করে ধন্য হত। পাহাড়ি লোকেরা স্বর্ণরেণুর খোঁজে কাঁকর পরিষ্কার করতে করতে তাঁকে তাদের কাহিনী শোনাত—তাদের ঘোড়া, তাদের দলের মেয়েদের গল্প বলত। তৈমুর দলের সরদারদের সাথে তাদের ঘাঁটিতে বসেই দাবা খেলতেন।

তারা বলত, 'সালি সরাইয়ের রাজা-বানানেওয়ালা আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

পৈতৃক সম্পত্তির কী ব্যবস্থা করা যায়, তৈমুর তা-ই নিয়ে ভাবছিলেন। কয়েক দলে ভাগ করে মেষগুলোকে তিনি কয়েকজন রাখালের জিম্মায় রাখলেন। বেতনস্বরূপ রাখালদিগকে দেওয়া হত দুধ, মাখন এবং লোমের এক-চতুর্থাংশ। ছাগল, ঘোড়া ও

উট সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হল। এ ছাড়া তাঁর আর কোনো সম্পত্তির উল্লেখ দেখা যায় না।

তৈমুর তাঁর সবচাইতে ভালো ঘোড়াগুলো নিয়ে বেরুতেন। সঙ্গে থাকত আবদুল্লাহ নামে তাঁর একটি চাকর ছোকরা। ছেলেটির জন্ম হয় তাঁর ঘরেই। এই সঙ্গী নিয়েই তিনি পার্বত্য পথ দিয়ে বিশাল আমুদরিয়ার দিকে ঘোড়া ছোটাতেন। এমনিভাবেই নরমান যুগের ইংলন্ডে সশস্ত্র স্কোয়ার যুবকগণ তাঁদের রাজার দরবারে হাজিরা দিতেন। তফাত মাত্র ছিল এটুকু যে, খ্রিস্টান স্কোয়ারগণের কেউই নরম অমসৃণ চামড়ার জুতা এবং পশমের রাজকীয় শিরস্ত্রাণ পরে, ঘোড়ার চামড়ার কোট গায়ে জড়িয়ে, আর কোমরে রুপালি কাজ-করা ভারী চামড়ার কোমরবন্দ এঁটে কখনো ঘোড়া ছোটাতেন না। তৈমুরের মতো ইংলন্ডের যুবকদের কেউ এত বেশি নিঃসঙ্গ ছিলেন না। মাতা তাঁর মৃত, পিতা মসজিদে ধ্যানরত এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুত্বের চাইতে শত্রুতায়ই বেশি আত্মনিয়োজিত। ভাগ্যান্বেষী হিসেবে তিনি রাজাহীন যোদ্ধৃদলে যোগদান করেছিলেন।

রাজা-বানানেওয়ালা কাজগান সোজাসুজিভাবেই তাঁকে বললেন, 'একধর্মী না হলেও, আমরা সকলে ভাই।' ঘোড়সওয়ার হিসেবে তাঁর দক্ষতা এবং তলোয়ার-চালনায় তাঁর নৈপুণ্য লক্ষ করার জন্য অনেকের নজর তাঁর উপর পড়ল। তলোয়ার খেলার সাথে ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত; কারণ ভুল তলোয়ার চালানোয় মৃত্যু ছিল অবধারিত। তারাঘাই ছিলেন একজন দলপতি এবং তৈমুর ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র।

সালি সরাইয়ের জঙ্গলে প্রায় দু'হাজার তাতারের যে শিবির স্থাপিত হয়েছিল, তাতে সমাবেশ হয়েছিল যুবক, যোদ্ধা ও ওমরাহশ্রেণীর ব্যক্তিদের। সেখানে তৈমুরকে কোনোকিছু শিক্ষা দেবার কথা কেউ কল্পনাও করত না। তাই তাঁকেই নিজের শিক্ষাদাতা খুঁজতে হয়েছিল এবং তা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেনও।

রক্ষিবাহিনীর এক ঘোড়সওয়ার একদিন এসে জানাল যে, একদল হামলাকারী সীমান্তে এসে তাদের ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দলের আমির কাজগান তৎক্ষণাৎ তৈমুরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বারলাস গোত্রের ধ্বজা উড়িয়ে একদল যুবক নিয়ে হামলাকারীদের কবল থেকে ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনতে আদেশ দিলেন। তৈমুর আমিরের সঙ্গীদের সাথে বসে ছিলেন। আমিরের আদেশ শুনে তৈমুর তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং রওনা হলেনও তখনই। এ-ধরনের কাজেই তিনি আনন্দ পেতেন। ঘোড়ায় চড়ে হামলাকারীদের পিছনে আধাদিন ধরে ধাওয়া করতে পেরে তিনি খুশিই হলেন।

দেখা গেল এই হামলাকারীরা পশ্চিমা ইরানি। লুট-করা ঘোড়াগুলোর পিঠে লুটের মাল চাপিয়ে তারা পথ চলছিল। অনুসরণকারী তাতারদের দেখে তারা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল থাকল লুট-করা ঘোড়াগুলোর পাহারায়। আর অন্যদল অনুসরণকারীদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেল। সঙ্গীরা তৈমুরকে পাহারাদারদের আক্রমণ করতে পরামর্শ দিল।

কিন্তু তিনি বললেন, 'না, আমরা হামলাকারীদের কাবু করতে পারলেই অন্যদল পালিয়ে যাবে।'

দস্যুদল অনেকক্ষণ ধরে শিরস্ত্রাণধারীদের সাথে তলোয়ারবাজি করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তৈমুর অপহৃত ঘোড়াগুলো তাদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে আনলেন। কাজগান তাঁর বীরত্বের তারিফ করে তরুণ বারলাস যোদ্ধাকে তাঁর তীর-ধনুক এনাম দিলেন।

এর পর থেকেই রাজা-বানানেওয়ালা কাজগান তারাঘাইয়ের পুত্রের প্রতি অধিকতর প্রসন্ন হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে অনুগ্রহ দেখাতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'তুমি হচ্ছ বিখ্যাত গুরিগান গোত্রের ছেলে, কিন্তু চেঙ্গিজ খানের বংশের একজন 'তুরা' তুমি নও। তোমার জন্মের আগে তোমার গোত্রের পূর্বপুরুষ কায়োলি চেঙ্গিজ খানের বংশীয় কাবুল খানের সাথে একটা চুক্তি করেন। চুক্তির শর্ত ছিল এই যে, কায়োলির পরবর্তী পুরুষের লোকেরা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করবেন ও পরিচালন-ভার গ্রহণ করবেন, আর কাবুল খাঁর বংশীয়েরা খান হিসেবে শাসন পরিচালনা করবেন। তাঁদের মধ্যে চুক্তি এরূপই হয়েছিল আর তা ইস্পাতের উপর লেখা হয়েছিল। ইস্পাতের সে-চুক্তিপত্র খানদের মোহাফেজখানায় সংরক্ষিত রয়েছে। তোমার পিতাও একথা আমাকে বলেছেন। আর একথা সত্যও।'

তারপর গম্ভীরভাবে তিনি আরো বলতেন, 'নিশ্চয়ই পথ আমার মাত্র একটিই। এবং সে-যুদ্ধের পথেই আমি ঘোড়া ছুটিয়েছি। আমি যুদ্ধ থেকে কখনো বিমুখ হইনি। কাজেই এখন আমার অনুসরণ করাই তোমাদের কাজ। গৌরবোজ্জ্বল বংশ আমার। পথ আমার একটিই এবং একটি ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।'

তৈমুর এসব জানতেন। তিনি আরো জানতেন, চেঙ্গিজ খানের পুত্র চাগাতাই এদিককার সমস্ত ভূখণ্ডের ছিলেন মালিক—দক্ষিণে আফগান-ভূমি এবং মহিমময় সুলায়মানের পিছনকার সমস্ত পর্বতমালার উপর ছিল তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। গত একশত বৎসরে চাগাতাই বংশীয়দের উত্তরাধিকারে কিছুটা শৈথিল্য এসেছে সন্দেহ নাই। কোনো-কোনো তাতার-গোত্র নিজ নিজ এলাকায় একরকম স্বাধীনভাবেই প্রভুত্ব চালাচ্ছে। আর খানগণ উত্তরদিকে গেছেন সরে। সেখানে শিকার ও মদ্যপান করেই তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। সম্প্রতি বিদ্রোহদমনের নাম করে তাঁরা সবুজ-নগরী পর্যন্ত ধাওয়া করে নিজেদের পছন্দসই জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছেন।

আগে কাজগান ছিলেন এরূপ এক খানেরই একজন আমির ও সেনাপতি। তাঁর আস্তানা ছিল সমরখন্দে। কিন্তু ক্রমে হানাহানিতে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে তিনি খানেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বহুদিন ধরে তীব্র তিক্ত যুদ্ধ চলল। অতঃপর খানের মৃত্যু হওয়ায় তিনি প্রকৃতপক্ষে সমরখন্দ, বারলাস প্রদেশ ও অন্যান্য তাতার-গোত্রের প্রভু হয়ে পড়লেন। চেঙ্গিজ খানের আইন জারি করতে এবং তাঁর নেতৃত্বে আস্থাশীল যোদ্ধাদের খুশি করতে তিনি এক বৈঠক ডাকলেন এবং তাতে সমরখন্দের খান-বংশীয় একজনকে রাজা নির্বাচন করলেন—নিতান্তই পুতুল-রাজা। কাজগানই সে-রাজার রক্ষাকর্তা সেজে বসলেন। এই কারণেই কাজগানকে বলা হয়ে থাকে রাজা-বানানেওয়ালা।

তৈমুরের মতো কাজগানেরও বংশগৌরব উঁচু ছিল না—চেঙ্গিজ খানের রাজবংশের একজন 'তুরা'ও তিনি ছিলেন না। হঠকারিতার মাধ্যমে তিনি রাজবংশের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। অশান্ত তাতারদের তিনি তাঁর প্রতি আস্থাশীল হতে বাধ্য করলেন। তীরের আঘাতে তাঁর এক চোখ কানা হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহে সাফল্যলাভের পর তিনি শিকারে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধের ধ্বজা উত্তোলন করতেন না। তাতার-গোত্রীয়দের সমর্থনের প্রতি তাঁর নিশ্চিত আস্থা ছিল না। একজন দলপতির পুত্র ছিলেন যেহেতু তৈমুর, তাই তাঁর প্রতি ছিল তাঁর খুবই আশা-ভরসা!

তাঁর দরবারে আর যেসব আমির ছিলেন, তাঁদের ছিল নিজ নিজ স্বার্থচিন্তা। তাঁরা কর যোগাতেন এবং সমরখন্দের পুতুল-রাজার প্রতি আনুগত্যও দেখাতেন বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই কাজগানের সব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের কেউ-কেউ দশ হাজার অশ্বারোহীরও পরিচালক ছিলেন। কাজগানের বুদ্ধিমত্তাই মাত্র এঁদের বশে রাখতে বাধ্য করেছিল।

কাজগান লক্ষ করলেন, তৈমুর তাতারদের সবচাইতে সাহসী যোদ্ধাদল 'বাহাদুর'দের খুব প্রিয়। 'বাহাদুর'দের কাছে যুদ্ধযাত্রাটা ছিল একটা ভোজ খেতে যাওয়ার মতো ব্যাপার। তারাঘাইয়ের পুত্র যেন কতকটা নিজের ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবেই এদের মাঝে স্থান গ্রহণ করলেন। এদের সাথেই তিনি অভিযানে বেরিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে ফিরে কাজগানের কার্পেটে বসে তাঁকে তাঁর দুঃসাহসী অভিযানবার্তা শোনাতেন।

মনে হত, তৈমুরের মধ্যে এমন একটা আগ্রহের তেজ ছিল যা ঘোর বিপদের বাধাকেও অগ্রাহ্য করতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। শুধু তা-ই নয়, সংকটক্ষণেও তৈমুর থাকতেন অচঞ্চল ও ভাবগম্ভীর। বাহাদুরগণ বলত, 'তৈমুর ছিলেন কর্মের উৎসস্থল।' তাঁর উপচেপড়া শক্তিমত্তা তাঁর দীর্ঘক্ষণের অশ্বারোহণ এবং বিনিদ্র রজনীযাপনকে সহজ করে তুলত। নেতৃত্বের সব গুণ ছিল তৈমুরের এবং নেতৃত্ব করতে তিনি ভালোও বাসতেন। নিজের শক্তি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অতিরিক্ত রকমে সচেতন। বিচ্ছিন্ন বারলাস-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব তাঁকে দান করার জন্য তিনি কাজগানের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।

রাজা-বানানেওয়ালা কাজগান তৈমুরের এ-প্রস্তাব মোটেই সমর্থন করতেন না। তিনি বলেছিলেন, 'আরো কিছুদিন অপেক্ষা করো। একদিন-না-একদিন তুমিই হবে নেতা।'

কিছুদিন পরে কাজগান ভাবলেন, তৈমুরকে বিয়ে করানো উচিত। তিনি তাঁর নাতিনিদের মধ্যে একজনকে এজন্য মনোনীত করলেন। সে-ও ছিল আরেক রাজবংশীয়া মেয়ে।

৪
মালিকের মালেকা

ইতিহাসে দেখা যায়, তৈমুরের বধূ ছিলেন নতুন চাঁদের মতো সুন্দর, নবীন সাইপ্রেসের মতো দেহ ছিল তাঁর মনোহর। বয়স তখন তাঁর নিশ্চয়ই পনেরোর কম ছিল না। কারণ পিতার সাথে তাঁকে তখন অশ্বারোহণে শিকারে যেতে দেওয়া হত। তাঁর নামকরণ হয়েছিল আলজাই খাতুন আগা।

তাতার-রমণীরা বোরখা পরে বাইরে বের হত। তারা তখনো হারেমে অবরোধের কড়াকড়ির সাথে পরিচিত ছিল না। অল্পবয়স থেকেই তারা অশ্বারোহণে নানাস্থানে ভ্রমণে, অভিযানে, তীর্থযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বিজয়ীদের সন্তান হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ছিল একটা গর্ববোধ এবং মুক্ত প্রান্তরচারিণীর তেজস্বিতা। তাদের প্রপিতামহীরা সমগ্র পরিবারের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন—এমনকি, উটের দুধ দোহার এবং বুট তৈরির ভারও ছিল তাঁদের উপর।

তৈমুরের যুগে তাতার-রমণীদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল—বিবাহে প্রাপ্ত জিনিসপত্রে এবং স্বামীর-দেওয়া উপহারগুলোর উপর আর কারো অধিকার ছিল না। বড় বড় আমিরদের রমণীরা স্বতন্ত্র বাস-ব্যবস্থার মালিক ছিলেন। প্রাসাদের ভিতরে তাঁদের জন্য নির্ধারিত থাকত স্বতন্ত্র বাসগৃহ এবং প্রত্যেকের বহির্গমন-পথও ছিল পৃথক পৃথক শামিয়ানার ভিতর দিয়ে। ইউরোপের মেয়েদের মতো তারাও সূচীশিল্পের ফ্রেম, কাপড়ে ফুল-তোলা বা কম্বল বোনার তাঁত নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

তারা ছিল একান্তভাবে যোদ্ধার সঙ্গীসাথি; ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাই ছিল তাদের কাজ। আনন্দভোজে তাদের ছিল পাকা আসন। কিন্তু তাদের মালিকেরা শত্রু কর্তৃক পরাজিত হলে, তারা গণ্য হত সে-পরাজয়ের লুটের মাল হিসেবে।

আলজাই বেগম আত্মীয় ও ভৃত্যগণ-পরিবেষ্টিত হয়ে উত্তর সীমানায় অবস্থিত তাঁর পিতৃগৃহ থেকে এসে হাজির হলেন রাজা-বানানেওয়ালার দরবারে। সেখানেই তিনি প্রথম তাঁর হবু মালিকের মুখ দেখলেন—তৈমুরের শীর্ণ শ্মশ্রুশোভিত মুখ। তৈমুর তখন মাত্র বাহাদুরদের সঙ্গে একটা অভিযান থেকে ফিরে এসেছেন নিজেরই বিয়ে উপলক্ষে।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা আলজাইকে বলেছিলেন, 'তোমার ভাগ্য তোমার কপালে লেখা হয়ে গেছে—আর তা কিছুতেই উলটাতে পারো না তুমি।'

রাজা-বানানেওয়ালা আর তাঁর আমিরদের কাছে এ-বিয়ে একটা ভোজোৎসব ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু শক্তিমান জালাইর গোত্রের মেয়েটার পক্ষে এ ছিল তাঁর নিয়তির প্রথম দিন। কোরানের বিধানানুসারে যখন বিয়ের শর্তাবলি এবং সাক্ষীদের নাম কাজির সামনে পড়া হয়, তখন তিনি (আলজাই) সেখানে ছিলেন না।

তাঁর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। গোলাপপানিতে তাঁকে গোসল করানো হয়। তারপর তাঁর দীর্ঘ কেশগুচ্ছ সিসেম তেলে ভিজিয়ে গরম দুধে ধুয়ে দেয়া হয়। তখন তাঁর চুল নরম রেশমের মতোই ঝকঝক করতে থাকে। তারপর তাঁকে সোনালি

ফুলতোলা লাল পোমগ্রেনেডের কামিজ পরানো হয়। কামিজটা ছিল হাতাছাড়া, কতকটা রুপালি কাপড়ে আটকানো শাদা রেশমের লম্বা ছদরিয়ার মতো। এর পিছনের অংশ ছিল এত দীর্ঘ যে, আলজাইয়ের কয়েকজন সঙ্গীর হাতে দেয়া হয়েছিল তা ধরে রাখার ভার।

আলজাইয়ের সরু কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর কালো চুলের রাশি। তাঁর দু'কানে দুলছিল দুটি কালো মণির দুল। মাথায় ছিল একটি সোনালি কাপড়ের টুপি। এর চূড়ায় ছিল রেশমি ফুলের তোড়া। তাঁর চুলে গুঁজে দেয়া হয়েছিল কয়েকটি বকের পাখা।

এই পোশাকে সজ্জিতা হয়ে আলজাই বেগম কার্পেটের যে-অংশে তাতারগণ উপবিষ্ট ছিলেন, সেদিকে গেলেন এগিয়ে। মুহূর্তের জন্য সকলের দৃষ্টি পড়ল তাঁর উপরে। এরপর যখন তিনি এ-পোশাক বদলিয়ে অন্য রঙের পোশাক পরে আবার মজলিশে ফিরে এলেন, তখনো সকলের দৃষ্টি পড়ল তাঁর উপর। তাঁর পরিচ্ছন্ন জলপাই-রঙা দেহচর্ম চালের গুঁড়ো বা শ্বেত সিসার প্রলেপে দেখাচ্ছিল একেবারে শাদা, তাঁর ভ্রূযুগলের উপরে এবং মাঝখানে একটা নীলাভ কৃষ্ণরেখা টেনে দেওয়া হয়েছিল।

মজলিশে সমবেত ব্যক্তিরা যখন মদ্যপানে ব্যস্ত, আলজাই তখন তাদের ভিতর দিয়ে ভয়চকিত মুখে সোজা এগিয়ে গেলেন। কিংমেকার কাজগান মুঠিভরা হীরা সেখানে দিলেন ছড়িয়ে। তাঁর আহ্বানে নাকাড়গণের তামা-বাঁধাই জিনের বাদ্যযন্ত্রগুলোতে কাঠি পড়ল এবং সেগুলো ভীমরবে বেজে উঠল।

জইনুদ্দিন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'খোদা এক। এই যুগল জীবনের উপর তাঁর শান্তি বর্ষিত হোক।'

তারপর এল উপহার দেবার পালা। কিন্তু সে-উপহার বধূর জন্য নয়, মজলিশে সমবেত তাতারদের জন্য। কাজগান উঠে দাঁড়ালেন। খেলাতবহনকারী ক্রীতদাসসহ তিনি তাতারদলগুলোর কাছে পরপর গেলেন। কাউকে তিনি দিলেন বাঁকা তলোয়ার, আবার কাউকে দেওয়া হল মূল্যবান কোমরবন্ধ। কারণ পুরনো দলের তাতার হিসেবে কাজগান কৃপণ ছিলেন না। তা ছাড়া পারস্পরিক শুভেচ্ছার সুবিধা কতটুকু, তা তিনি ভালো করেই জানতেন।

আমির ও যোদ্ধাগণ তৃপ্ত হয়ে ঘুমের আমেজ অনুভব করছিলেন। ওক ও উইলো-কুঞ্জের ছায়ায় তাঁরা শুয়ে পড়েছিলেন। তখন কথক-দল এসে তাঁদের মাঝখানে আসন গ্রহণ করল। গিটার বেজে উঠল এবং বহুবার শোনা কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। কথকদের মতোই সেসব কাহিনী শ্রোতাদের কাছেও পরিচিত। কাজেই কাহিনীর কোনো অংশ বাদ দেবার উপায় ছিল না। বাদ দিলেই শ্রোতারা মনে করতেন যে, তাঁদের ঠকানো হচ্ছে। বহুশ্রুত এসব কাহিনী সকলে সমান আনন্দে উপভোগ করতে লাগল। ফলে ভোজের আনন্দের কোনো ত্রুটি হল না।

দিনের আলো স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। গোলামের দল এল আলো নিয়ে। নদীর পারের প্রতি গাছের নিচে লণ্ঠন টানিয়ে দেয়া হল। চামড়ার প্লেটভরতি খানা অতিথিদের সামনে করা হল পরিবেশন। কচি ভেড়ার ধূমায়মান গোশতের টুকরো, ঘোড়ার পাছার মাংস এবং মধুতে ভিজানো যবের পিঠা দেখে তাঁরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

আবার অতিথিদের মাঝখান দিয়ে আলজাই বেগম চলে গেলেন, কিন্তু এবার আর ফিরে এলেন না। তৈমুর কার্পেটের উপর নিয়ে এলেন একটি আরবি যুদ্ধের ঘোড়া—মনোহর গতিসম্পন্ন বাজির ঘোড়া। তার জিনের উপরকার রেশমের আবরণ ছিল মাটি পর্যন্ত লম্বিত। আলজাইকে এই ঘোড়ার উপর উঠিয়ে তৈমুর তাঁকে নিয়ে নিজের শামিয়ানায় চলে গেলেন।

অতিথিরা ছাড়াও সেখানে আলজাইয়ের দাসী-বাঁদিরা এসেছিল তাঁকে তাঁর পোশাক খোলায় সাহায্য করার জন্য। এরা তাঁর বাক্স-পেটরাও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। আলজাইয়ের বাইরের পোশাকাদি খুলে নেবার সময় আলজাই কাঁপছে অনুভব করে তারা মৃদু হাসল। পোশাক ছেড়ে আলজাই বেগম জুতাপায়ে হাতাছাড়া জামাগায়ে লম্বাচুলের উপর ভারী বোরখা চাপিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তৈমুরকে নীরবে শামিয়ানায় ঢুকতে দেখে তারা তাঁকে সালাম জানাল। তৈমুরের দৃষ্টি ছিল শুধু আলজাইয়ের উপর। দাসী-বাঁদিরা চলে গেল। তৈমুরের যে-কয়জন অনুচর তাদের নতুন মনিব বেগমকে সালাম জানাবার জন্য শামিয়ানার প্রবেশদ্বারে জমায়েত হয়েছিল, তারা এখন দরজার পরদা ফেলে দিয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল।

সে-রাতে যখন আলজাই ছিলেন তরুণ যোদ্ধার বাহুতে মুখ লুকিয়ে, দূরবর্তী নদীস্রোতের কলধ্বনি ও জনতার কলরব ছাপিয়েও তাঁর কানে তখন দামামার কর্কশ বাদ্যধ্বনিই বেশি করে বেজে উঠেছিল।

আলজাই ছিলেন তৈমুরের নিজস্ব প্রথম আপনজন। তিনি বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন আর কোনো স্ত্রীলোক তাঁর অংশীদার হতে পারেনি।

একথা ঠিক যে, কুড়ি থেকে চব্বিশ বৎসর সময় পর্যন্ত তৈমুরের জীবনে ছিল নিরাবিল আনন্দ। সবুজ-নগরীর শাদা কাদার প্রাসাদের এক নির্জন কোণে আলজাইয়ের বাসস্থান নির্ধারিত হয়েছিল। নিজের রুচি অনুযায়ী তৈমুর সাজিয়েছিলেন এই বাসরকক্ষটি—গালিচা আর সৈনিকজীবনের অর্জিত কারুকার্যময় বস্ত্রখণ্ড দিয়ে। তাঁর পিতা দিয়েছিলেন তাঁর অংশের গৃহপালিত পশুর দল এবং তাদের চারণভূমি।

আমির কাজগান তাঁকে 'মিংবাশি' (মানে একহাজারি মনসবদার) পদে নিয়োগ করেছিলেন। তৈমুর এই পদে নিযুক্ত হয়ে খুশি হয়েছিলেন। অধীন সৈন্যদের তিনি ভালো করে খাওয়াতেন। নিজের খাওয়ার সময়েও সর্বদা তিনি তাদের কাউকে-না-কাউকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন। এবং সৈন্যদের নামের একটি তালিকা সবসময়ে তিনি নিজের কাছে রাখতেন। কাজগান যোদ্ধা চিনতেন। তাই এক হাজারের বাহিনীসহ তৈমুরকেই তিনি তাঁর বিপুল বাহিনীর অগ্রবর্তী করে অভিযানে পাঠাতেন।

তৈমুর প্রায়ই সমরখন্দ সড়ক ধরে ঘোড়া চালিয়ে চন্দ্রালোকে শাদা ধূলিকণা উড়াতে উড়াতে মূল বাহিনীর একদিন আগেই ঘরে ফিরে আসতেন—আলজাইকে দেখবার আগ্রহে এবং তাঁর অনুসরণে অগ্রসরমাণ আমিরদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে। সবুজ-নগরীর পানির ফোয়ারা-প্রবাহিত বাগানে ভোজের উৎসব ছিল তাঁর উপভোগের বস্তু।

আলজাইয়ের ছেলে হলে তিনি তার নাম রাখলেন, জাহাঙ্গির। রাজা-বানানেওয়ালার সমস্ত আমিরকে এ-উপলক্ষে তিনি এক ভোজে দাওয়াত করলেন। তাঁর চাচা হাজি বারলাস এবং তাঁর স্ত্রীর গোষ্ঠীর দলপতি আমির বায়েজিদ জালাইয়ের ছাড়া আর সবাই তৈমুরের সম্মানার্থে এই ভোজে যোগ দিয়েছিলেন।

অতিথিরা বললেন, 'হাঁ, তৈমুর গুরিগানের যোগ্য ছেলেই বটে!'

আলজাইর পিতার বশংবদ বন্য পাহাড়ি জাতির লোকেরা সবুজ-নগরীর মালিক ও মালেকার উদ্দেশে বহু গান গাইল।

তৈমুরের দুঃসাহসিক অভিযানের সাহায্যে পশ্চিম মরুভূমি ও দক্ষিণ উপত্যকায় কাজগান অনেক জায়গা দখল করে নিলেন। হিরাতের মালিককে বন্দি করে আনা হল সালি সরাইয়ে। তরুণ বারলাস যোদ্ধার নিঃস্বার্থ অক্লান্ত চেষ্টায় কাজগান বহুভাবে উপকৃত হয়েছেন। এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি উপকৃত ও শক্তিমান হতে পারতেন; কিন্তু তা হল না—যেহেতু কাজগানের আমিরদের মধ্যে আবার নতুন করে ঝগড়া বেধে গেল। তারা দাবি করে বসল, বন্দি হিরাতের মালিককে খতম করে তাঁর সম্পত্তি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। কিন্তু কাজগান আগেই মালিককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর কোনোরূপ অনিষ্ট করা হবে না। মালিক ছিলেন পুরনো শত্রু এবং ধনী। তাঁকে হত্যা করার জন্য আমিরদের দাবি যখন প্রচণ্ডতর হয় উঠল, কাজগান গোপনে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। আমিরগণ হিরাতের পথে নদীর দক্ষিণে যখন শিকারে ব্যস্ত, সেই সুযোগে বন্দিকে তিনি ছেড়েও দিলেন। হিরাত প্রত্যাবর্তনে মালিকের রক্ষক হিসেবে তৈমুরকে পাঠানো হয়েছিল—একটি বিবরণে একথা পাওয়া গেলেও এর সত্যতা সন্দেহনির্মুক্ত নয়।

তাঁর রক্ষক কাজগানকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তৈমুর সেখানে ছিলেন না। কাজগান তখনো মাত্র অল্প কয়েকজন সঙ্গীসহ নিরস্ত্র অবস্থায় নদীর দক্ষিণে মনের আনন্দে শিকারে ব্যস্ত ছিলেন; এমন অবস্থায় দুইজন সামন্ত নেতা কাজগানকে তীর ছুড়ে মেরে ফ্যালে। ওরা কাজগানের বিরুদ্ধে গোপনে শত্রুতা পোষণ করত।

তৈমুরের কানে এ-সংবাদ পৌঁছামাত্রই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন এবং কাজগানের লাশ ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নদী পার হলেন। সালি সরাইয়ের জঙ্গলে তাঁকে কবর দেওয়া হল।

তারপর নিজের বিষয়আশয় রক্ষার চিন্তামাত্র না করে তিনি আবার আমুদরিয়া সাঁতরিয়ে দক্ষিণদিকে ঘোড়া ছোটালেন এবং কাজগানের বাহিনীর সাথে তিনিও মিলিত হলেন। তারা তখন পাহাড়ে হত্যাকারীদের অনুসরণে ব্যস্ত ছিল। তাতারদের সবচাইতে পুরনো ঐতিহ্যের মধ্যে একটি এই যে, আপন গোষ্ঠীর কাউকে যে হত্যা করেছে, তার সাথে এক আকাশের নিচে কখনো ঘুমানো চলবে না। কাজগানের হত্যাকারীদ্বয়ও বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারল না।

গিরিসংকট থেকে পাহাড়ে পালিয়ে এবং প্রতি গ্রামে ঘোড়া বদল করেও তারা অনুসরণকারী তাতারদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। তাতাররা তাদের পলায়নের সমস্ত রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এ-কারণে তারা তাতারদের দৃষ্টির বাইরে যেতে

পারল না। অবশেষে পাহাড়ের এক উঁচু ধাপে হত্যাকারীরা ধরা পড়ল। তলোয়ারের এক কোপে তাদের শেষ করা হল। এরপর তৈমুর নিজগৃহে ফিরে এলেন। এখান থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ফিরল।

মধ্য-এশিয়ার কোনো শাসকের মৃত্যু হলে, তাঁর ছেলেই সিংহাসনের অধিকারী হতে পারতেন—যদি সে-শাসক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারতেন এবং ছেলে যদি তাঁর উত্তরাধিকার রক্ষাকল্পে যথেষ্ট শক্তিমান হতেন। তা না হলে বড়জোর তাঁর বড় বড় প্রজাদের পরামর্শ-বৈঠকে নতুন শাসক নির্বাচিত হতেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হত না; সিংহাসনলাভের জন্য যুদ্ধ চলত এবং যিনি সবচাইতে শক্তিশালী তিনিই সিংহাসন দখল করে বসতেন। এই শিরস্ত্রাণধারীদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল, 'তলোয়ার যে শক্ত হাতে ধরতে পারে, রাজদণ্ড ধরবার অধিকার কেবল তারই।'

কাজগানের ছেলেও সমরখন্দে রাজ্যদখলের একটা দুর্বল চেষ্টা করেছিলেন বটে; কিন্তু শিগগিরই তাঁকে জীবন বাঁচাবার জন্য পালাতে হল। তখন হাজি বারলাস এবং জালাইয়ের রাজ তাতারদের দলপতি হওয়ার দাবি পেশ করলেন।

ইতোমধ্যে অন্যান্য আমিরগণ নিজেদের আস্তানায় ফিরে গিয়ে স্বাধিকার রক্ষাকল্পে এবং প্রতিবেশীদের উপর হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে যোদ্ধাসংগ্রহে মনোযোগী হলেন। প্রভুত্বলাভের জন্য গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মারামারি কাটাকাটি—এই ছিল তাতারদের পুরনো দুর্বলতা। যিনি তাদের বেত মারতে পারতেন, তাঁকেই তারা মেনে নিত দলপতি বলে। কিন্তু কাজগান নিহত হয়েছিলেন। এইসব অশান্ত লোককে সংযত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা হাজি বারলাস এবং বায়েজিদ জালাইয়ের ছিল না।

এমনি সংকটক্ষণে তৈমুরের পিতা তারাঘাই মারা গেলেন। বারলাস-গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোক সমরখন্দে হাজির সাথে গেল। সবুজ-নগরীতে কয়েকজন অনুচরসহ তৈমুর রয়ে গেলেন।

তখন, পাহাড়ের ওপার থেকে ঘটনা লক্ষ্য করে উত্তরের মোঙ্গল খান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। শকুনি যেমন মরা ঘোড়ার উপর দলবেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, খানও তেমনি একপুরুষ পূর্বেকার বিদ্রোহের কথা অজুহাত হিসেবে খাড়া করে সেখানে চলে এলেন।

৫
কূটনীতিবিদ তৈমুর

খানের আগমনে তাতার আমিরগণ সকলেই পশ্চাদপসরণ করলেন। বায়েজিদ জালাইয়ের রাজধানী খোজেন্দ ছিল উত্তরদিকের প্রবেশপথে। তিনিই কেবল নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এসে প্রচুর উপহারসহ খানের কাছে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন।

হাজি বারলাস আগেও ঝোঁকের বশে কাজ করতেন, এক্ষেত্রেও তাঁর কাজে সেই অস্থিরচিত্ততাই ফুটে উঠল। তিনি সবুজ-নগরী ও কারসির আশেপাশে অবস্থিত তাঁর গোষ্ঠীর সব যোদ্ধাকে ডেকে দাবি জানালেন যে, তারাঘাইয়ের মৃত্যুর পর তিনিই এ-গোষ্ঠীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। কিন্তু তার পরই আবার মত পরিবর্তন করে তৈমুরকে বলে পাঠালেন যে, তিনি তাঁর লোকজন ও গৃহপালিত পশুগুলো নিয়ে দক্ষিণে হিরাতের দিকে চলে যাবেন। কিন্তু তৈমুর উত্তরদিকের অভিযানের মুখে সবুজ-নগরীকে শাসকহীন অবস্থায় ত্যাগ করে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি তাঁর চাচাকে বলে পাঠালেন, 'যেখানে ইচ্ছা আপনি যেতে পারেন। আমি খানের দরবারে যাব।'

তিনি জানতেন, জাট-মোঙ্গলদের প্রভু তাঁর উত্তরের সুউচ্চ প্রাসাদ ত্যাগ করে যে সমরখন্দের উর্বর ভূমিতে নেমে এসেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁদের পূর্বঅধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সাথে লুট করারও একটা গোপন ইচ্ছা রয়েছে। এ-কারণে তৈমুর চাইছিলেন যে-কোনো উপায়ে হোক, তাঁর এলাকা থেকে এই লুটেরাগণকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে। আলজাই এবং তাঁর শিশুপুত্রকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন কাবুল পাহাড় থেকে অগ্রসরমাণ আলজাইয়ের ভ্রাতার দরবারে। তিনিও অবশ্য নিজের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের সাথেই যেতে পারতেন। নিজের মাত্র কয়েকশত সৈন্য নিয়ে জাট-মোঙ্গলদের বারো হাজার সশস্ত্র সৈন্যের মোকাবিলা করা তাঁর পক্ষে হত নিতান্ত নির্বোধের কাজ। তাঁর পিতা এবং কাজগান উভয়েই তাঁকে খানের কাছে আত্মসমর্পণ না-করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কারণ আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও তাঁকে হত্যা করে খানেরই নিজ কর্মচারীদের মধ্যে কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দেবার ভয় ছিল। কিন্তু তবু খান ছিলেন শুধু তৈমুরের নয়, তাঁর পূর্বপুরুষেরও মনিব। তাই তৈমুরের গত্যন্তর ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর গোষ্ঠী ছিল পাখাহীন বাজপাখির মতো। সবুজ-নগরীতে ছিল ভয় ও অনিশ্চয়তার রাজত্ব। কয়েকদিন ধরে যোদ্ধারা তাদের ঘোড়া ও মেয়েদের নিয়ে সমরখন্দের রাস্তা ধরে পালিয়ে যেতে লাগল। আর যারা স্থান ছেড়ে যাবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, তারা দেখল তৈমুর অবিচল রয়েছেন। অবিলম্বে তারা এসে তৈমুরের আনুগত্য স্বীকার করল এবং এই উপায়ে তাদের নিরাপত্তার দাবি তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল।

গরজে পড়ে যারা বন্ধু সাজে, তারা সত্যিকার বন্ধু নয়, একথা তিনি বুঝলেন। তিনি এসব চাননি। কারণ এইশ্রেণীর বর্ণচোরা বাহিনী তাঁকে আক্রমণের পক্ষে খানের একটা সুযোগের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারত।

তাই সেদিকে না গিয়ে তিনি কিছুটা প্রস্তুতি চালালেন। সবুজ-নগরীর আওলিয়া-দরবেশদের কবরগাহে তিনি তাঁর পিতার মৃতদেহ যথেষ্ট সম্মানের সাথে সমাহিত করলেন। তারপর তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক মুরশিদ জইনুদ্দিনের কাছে গেলেন এবং সারারাত ধরে তাঁর সাথে পরামর্শ করলেন। কী পরামর্শ তাঁদের মধ্যে হয়েছিল তা কেউ জানে না, তবে তৈমুর এরপর তাঁর মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তিগুলো গোছাতে লাগলেন—ভালো তাজী ঘোড়াগুলো, রৌপ্যমণ্ডিত জিনসমূহ, আর সর্বোপরি সবরকমের সোনা ও জহরতাদি। সম্ভবত জইনুদ্দিন মসজিদের অর্থভাণ্ডারের চাবি তাঁর

হাতে তুলে দিয়েছিলেন; কারণ মোঙ্গল খানের ছিল ইসলামের শরিয়ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি বংশানুক্রমিক শত্রুতা।

সেই সময়েই জাট-মোঙ্গলরা এসে উপস্থিত হল। কাঁধে ঝোলানো লম্বা বল্লমধারী পাহাড়ি ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে সমরখন্দের রাস্তা ধরে আসতে দেখা গেল। আগেকার লুট-করা মাল-বোঝাই ঘোড়ার সারিও সে-দলে ছিল। অশ্বারোহী বাদকগণ ছিল তাদের পিছনে। পাকা গমের ক্ষেত মাড়িয়ে, ফসল নষ্ট করে এরা এগুচ্ছিল। দলের কমান্ডার শ্বেত-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু তৈমুর যখন বিনা-প্রতিবাদে অতিথি হিসেবে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন, তখন তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল।

জাট-অফিসারের জন্য তৈমুর এক ভোজের আয়োজন করলেন। ভেড়া-গোরু প্রচুর পরিমাণে জবাই করা হল। ফলে অতিথির পর্যায়ে নেমে এসে অফিসারটি তরুণ গৃহস্বামীর জড়ো-করা ঐশ্বর্য লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়েই দেখল মাত্র। সেসব লুট করার অনুমতি সে তার বাহিনীকে দিতে পারল না। তবে বিপুল পরিমাণ উপহার দাবি করল বটে, এবং তৈমুর সে-দাবি মিটালেনও।

তৈমুর এরপর খানের দরবারে হাজির হওয়ার ইচ্ছা ঘোষণা করলেন। তিনি সাথে নিলেন দরবারি পোশাকে সজ্জিত তাঁর অনুগত এক অশ্বারোহী-বাহিনী এবং অবশিষ্ট সব ঐশ্বর্য। সমরখন্দের নিকটে তাঁর সাথে দেখা হল অগ্রগামী দলের আরো দুইজন জাট-অফিসারের। তারা উভয়েই ছিল উদ্ধত ও স্বর্ণলোভী। তৈমুর আশাতিরিক্ত স্বর্ণ দিয়ে তাদেরও লোভ মিটালেন।

সমরখন্দ ছাড়িয়ে তিনি এসে পৌঁছলেন উর্দুতে। মানে খানের (তুঘলকের) রাজকীয় তাঁবুতে।

ঘোড়ার পাল ও রজ্জুবদ্ধ উটের সারির মধ্যে শাদা পশমি তাঁবু পড়েছিল বিশাল প্রান্তর জুড়ে। বাতাসে ঘোড়ার লেজের পতাকাগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল এবং ভেড়ার শুকনো বিষ্ঠার কণাগুলো ধূলির মতো উড়ছিল। এখানকার যোদ্ধাদের পোশাকে ছিল একটা বর্বরসুলভ সমারোহ। তাদের পরনে ছিল ফুলতোলা চীনা সাটিন। তাদের উঁচু বুটজুতোয় ছিল সোনালি কারুকার্য। কাঠনির্মিত জিনগুলো ছিল নরম কাঁচা চামড়ায় মণ্ডিত। লম্বা বল্লম ও যাযাবরদের ধনুক ছিল তাদের প্রিয় এবং মারাত্মক অস্ত্র।

নিজের পতাকার পাশে এক পশমনির্মিত আসনে বসেছিলেন তুঘলক—এক প্রশস্ত-বদন মোঙ্গল। তাঁর গালের হাড় ছিল উঁচু, ছিল চঞ্চল ছোট চোখ এবং পাতলা দাড়ি। তিনি ছিলেন সন্দিগ্ধমনা, বিশিষ্ট লুটেরা এবং ভীষণ যোদ্ধা। তৈমুর জাট-ওমরাহদের অর্ধবৃত্তের সম্মুখভাগে ঘোড়া থেকে নেমে নিজের পূর্বপুরুষদের অনুরূপ পরিবেশের মধ্যেই যেন নিজেকে দেখতে পেলেন। যথানিয়মে কুরনিশ করতে করতে তিনি খানের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমার খান, আমার পিতা, উর্দুর প্রভু! আমি তৈমুর—বারলাস-গোত্রের লোকদের দলপতি এবং সবুজ-নগরীর রক্ষক।'

খান তৈমুরের ভয়হীনতা ও রৌপ্যখচিত বর্ম দেখে চমকিত হলেন। যে-বারলাস-গোত্রের অধিকাংশ যোদ্ধা হাজি বারলাসের সাথে পালিয়ে গেছে, নিজেকে তাদেরই নেতা বলে তৈমুর সগর্বে ঘোষণা করলেন। কারণ খণ্ডিত নেতৃত্বের কথা ঘোষণার

সময় তখন ছিল না। তিনি খানকে যে-উপহার দিলেন, তা ছিল খুবই জমকালো। এমনকি, লোভী যাযাবরদের কাছেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তৈমুর নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই। তাঁকে খানের বড় পছন্দ হল।

তৈমুর সাহসের সাথে আরো বললেন, 'পিতা, আমি আরো অনেক-কিছু আপনার সামনে পেশ করতে পারতাম, কিন্তু আপনার অফিসার—তিনটা কুত্তা—আমার সেসব লুট করে তাদের লোভ মিটিয়েছে।'

এটা অবশ্য নিছক কল্পনামাত্র। কিন্তু এর ফলে তুঘলক খান ভাবতে লাগলেন, কতটা সম্পদ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন! যাহোক, তিনি অনতিবিলম্বে তিন দোষী অফিসারের কাছে এই আদেশসহ বিশেষ দূত পাঠালেন যে, তৈমুর থেকে নেওয়া সম্পদ যেন অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়। একথা সত্য যে, তুঘলক উপহারগুলো হাজি বারলাসের কাছে ফেরত দিতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু এটা করেছিলেন এইজন্যে যে, তিনি হাজির নিকট থেকে সবকিছুই দাবি করতে চেয়েছিলেন। তৈমুরের নিকট থেকে আর বেশি কিছু নেবার ছিল না।

তিনি স্বীকার করলেন, 'এরা কুকুর নিশ্চয়ই, তবে এরা আমারই কুকুর। এদের লোভ হচ্ছে আমার চোখের তারার উপর একটা চুলের মতো বা আমার মাংসপিণ্ডের এক টুকরোর মতো।'

ম্যাকিয়াভেলি যদি এই প্রান্তরচারী মানবসন্তানদের কথা জানতেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই আজ একটা বই লিখে যেতেন। প্রতারণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের যোগ্যতার একটা মাপকাঠি এবং ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাদের একটা চারুশিল্প। তারা ছিল বটে একটা যোদ্ধাজাতি, কিন্তু এতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, শেষ উপায় হিসেবেই মাত্র তারা অস্ত্রধারণ করত। তুঘলকের শিবিরে তৈমুর বেশ কিছুসংখ্যক লোককে বন্ধু করে নিয়েছিলেন।

জাটরা বলল, 'সমরখন্দের রাজ্যবর্গ বাজপাখির ভয়ে ভীত ভারুই পাখির মতো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। একমাত্র তৈমুরই তার ব্যতিক্রম। বুদ্ধিমান লোক তিনি; আমরা তাঁকে তুষ্ট করে তাঁকে দিয়েই শাসন চালাব।'

আপাতত তারা কিছুই করল না। কারণ অফিসার তিনজন, শাস্তি হিসেবে খান তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবেন, সন্দেহ করে একত্র দলবদ্ধ হয়ে ইতস্তত লুট করতে করতে নিজেদের এলাকার দিকে চলে গেল। উত্তরসীমান্তে পৌঁছে তারা সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগল এবং খানের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গোলমাল পাকাতে লাগল। তুঘলক ইতস্তত করতে লাগলেন এবং তৈমুরকে এসব ব্যাপারে পাকা লোক মনে করে তাঁর পরামর্শ চাইলেন।

তৈমুর গম্ভীরভাবে বললেন, 'আপনি রাজধানীতে চলে যান; কারণ সেখানে বিপদের সম্ভাবনা মাত্র একটি। আর এখানে আপনার সামনে এবং পিছনে দুই দিক দিয়েই বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।'

খান বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে নিজের দেশে চলে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি তৈমুরকে 'মিংবাশি' বা দশহাজারি সেনাপতি নিযুক্ত করে গেলেন এবং এই মর্মে

তাঁকে এক সনদও দিলেন। আগেকার মোঙ্গল-রাজত্বে তৈমুরের পূর্বপুরুষগণ এই গৌরবের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তৈমুর এইভাবে শুধু নিজ এলাকাকেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করলেন না, নিজ গোষ্ঠীর দলপতি হিসেবেও তিনি খান কর্তৃক নিয়োজিত হলেন। এইভাবে পারস্পরিক বিপদের ভয় কেটে যাওয়ায় তাতার-দলপতিরা এরপর নিজেদের ভেতরকার বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলতে তৎপর হয়ে উঠলেন। পরবর্তী তিন বৎসরে তাদের মধ্যে বহু পরিবর্তন হয়ে গেল।

হাজি বারলাস ও দলপতি জালাইয়ের আবার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তৈমুরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করলেন। তাঁরা তরুণ যোদ্ধাকে তাঁদের শামিয়ানায় আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তাঁদের সাথে কয়েকজন সশস্ত্র লোককে বসে থাকতে দেখে তৈমুর বিশ্বাসঘাতকতার আঁচ করলেন। হঠাৎ নাক দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে, এই ভান করে ভিতরের কামরা দিয়ে তিনি নিজ অনুগামীদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। এরপর তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে চম্পট দিলেন। পরে বায়েজিদ জালাইয়ের এই ষড়যন্ত্রের জন্য লজ্জিত হয়ে তৈমুরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হাজি ছিলেন অন্য ধাতের লোক; তিনি এলাকা দখলের জন্য সবুজ-নগরীর উপর হামলা চালালেন।

এলাকা ছেড়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই তৈমুরের ছিল না। বিশেষ করে, তাঁর পকেটে যখন খানের সনদ রয়েছে এবং তাঁর অধীনে আছে কয়েক হাজার সৈন্যও, তখন সে-প্রশ্নই ওঠে না। সৈন্যদলকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করলেন এবং সমরখন্দের রাস্তায় চাচা-ভাতিজার সৈন্যদলের মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষও হল। হঠাৎ হাজি বারলাস যুদ্ধ ছেড়ে সবুজ-নগরীর দিকে পলায়ন করলেন। খুশি হয়ে তৈমুর তাঁর অনুসরণ করলেন। কিন্তু পরদিন তাঁর প্রায় সব সৈন্যই তাঁকে ত্যাগ করে হাজির দিকে চলে গেল। হাজি তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, গোষ্ঠীর প্রধানের দলেই তাদের যোগ দেওয়া উচিত।

তৈমুর তখন আলজাইয়ের ভাই আমির হোসেনের সাথে মিলিত হতে ঘোড়া ছোটালেন। আমির হোসেন সে-সময়ে কাবুল থেকে তাঁর পাহাড়ি উপজাতীয়দের এবং আফগানদের নিয়ে সেদিকে যাচ্ছিলেন। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এই ধরনের সংঘর্ষ আরো কিছুদিন ধরে চলল।* অবশেষে তুঘলক এলেন, 'যেন পাখির ঝাঁকের উপর নিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরোর মতো।'

এ-সময়ে তাঁর মেজাজ ছিল খুবই কঠোর। তিনি সব পুনর্দখলের সিদ্ধান্তই করেছিলেন। বায়েজিদ জালাইয়েরকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হল। হাজি বারলাস তাঁর দলবলসহ আবার দক্ষিণদিকে পালালেন। কিন্তু শীঘ্রই চোরের হাতে জীবন হারালেন।

---

* মধ্য-এশিয়ার অভ্যন্তরে ঝগড়া-বিবাদ একটা চিরন্তন ব্যাপার। বর্তমান সময়েও সে-অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সেকালের তাতার রাজপুরুষদের রাজ্য ছিল কাবুলের উত্তরদিকের আফগানিস্তানের বাকি অংশ, ইরানের উত্তরাংশ, বোখারেরা ও ট্রান্সককেশিয়ার সবটুকু এবং রুশ তুর্কিস্তানের বেশিরভাগ জুড়ে। এই ভূভাগে ছিল প্রায় একলাখ যোদ্ধা। এ-সময়ের পূর্ণ বিবরণ দেয়া এখানে অনাবশ্যক। এখানে শুধু তৈমুরের অভিযানগুলিরই বিবরণ দেয়া হচ্ছে। ১৩৬০ খ্রি. থেকে ১৩৬৯ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর ধরে তাতারদের এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল।

আমির হোসেন জাটবাহিনীর মোকাবিলা করলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে জীবনরক্ষার জন্য পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। তৈমুর সবুজ-নগরী থেকে নড়লেন না।

তুঘলক খান জয়ের আনন্দে নিজের ছেলে ইলিয়াসকে তাতার এলাকার শাসক হিসেবে রেখে গেলেন। জাট-সেনাপতি বিকিজুককে সেখানে তাঁর ছেলের শাসনের পিছনে শক্তি জোগানোর জন্য রেখে যাওয়া হল। তৈমুরকে সমরখন্দ-রাজ উপাধি দেওয়া হল। দুইজন জাটকে তাঁর উপরওয়ালা করা হল। এটা কম সম্মানের কথা ছিল না। যে-কোনো সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তিই একে সম্পদ ও শক্তি অর্জনের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করত।

তাঁকে উত্তরদেশের জাটদের অধীনস্থ করায় তৈমুর প্রতিবাদ জানালেন। জবাবে খান তাঁকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যে-চুক্তি হয়েছিল, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, চেঙ্গিজ খানের বংশ রাজত্ব করবে, আর গুরিগানের বংশ তাদের হুকুম তামিল করবে। 'তোমার পূর্বপুরুষ কায়োলি এবং আমার পূর্বপুরুষ কুবলাই খানের মধ্যে এই চুক্তিই হয়েছিল।' তৈমুর তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেকার এই চুক্তি অবশ্যপালনীয় বলেই মনে করলেন। ক্রুদ্ধ হলেও সবুজ-নগরীর মঙ্গলকল্পে প্রয়োজনীয় কাজ করে যেতেই তিনি চেষ্টা করলেন।

কিন্তু জাট-সেনাপতি বিকিজুক সমগ্র সমরখন্দ ছারখার করতে উদ্যত হলেন। লুট করাতেই ছিল শাহজাদা ইলিয়াসের আনন্দ। তৈমুর শুনলেন, সমরখন্দের কচি মেয়েদের বাঁদি করে এবং মাননীয় সৈয়দদেরকে বন্দি করে দূরে পাঠানো হয়েছে। মসজিদের ইমাম জইনুদ্দিন রাগে চিৎকার করে উঠলেন। তৈমুর এই লুটেরাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে খানের কাছ এত্তেলা পাঠালেন। তাতে কোনো ফল না-হওয়ায় তৈমুর নিজ বাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে উত্তরদিকে ছুটলেন এবং অনেক বন্দিকে জোর করে মুক্ত করলেন। তৈমুরের বিদ্রোহবার্তা খানের কাছে পাঠানো হল। তুঘলক তৈমুরের মৃত্যুর আদেশ দিলেন।

যথাসময়ে তৈমুরের কাছে এ-খবর পৌঁছল। ঝগড়া-বিবাদে ক্লান্ত এবং মাতৃভূমির ধ্বংসে মর্মপীড়িত তৈমুর কূটনীতি বিসর্জন দিয়ে মরুভূমির দিকে ঘোড়া চালালেন।

এ ভালোই হয়েছিল। স্কটল্যান্ডের রাজা ব্রুসের ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি ষড়যন্ত্রের চাইতে বেআইনি কার্যক্রম গ্রহণই তৈমুরের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল।

৬
পলাতক তৈমুর

পশ্চিমদিকে প্রসারিত মরুপ্রান্তর লাল, অনুর্বর, উন্মুক্ত। পায়ের নিচে রৌদ্রোত্তাপ-ঝলসানো লাল কাদা। উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ মরুভূমির বালুকারাশি উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এবং সেসব বালুকা ধূলিকণার মতো সবদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে কুয়াশার সৃষ্টি করেছে। এই কুয়াশা সমুদ্র-উত্থিত বাষ্পের মতো আন্দোলিত হচ্ছে বেলেপাথরের চূড়ার চারদিকে।

শুধু সকাল এবং বিকেলের শেষদিকে সেখানে জিনিসপত্র পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ দুপুরে এই কুয়াশা আর আকাশের কম্পমান অগ্নিকুণ্ড দৃষ্টিকে করে ব্যাহত।

কিন্তু এটা ঠিক সত্যিকার মরুভূমি নয়; কারণ নদীর শূন্য তলদেশ ধূসর বর্ণের স্ফটিকস্তম্ভের উৎক্ষেপের মধ্যে মোচড় খেয়ে প্রশস্ত আমুদরিয়ায় গিয়ে মিশেছে। নদীর হলদে পানি এ-প্রান্তরের বারো হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত সালি-সরাইকে বেহেশতে পরিণত করেছে বটে, কিন্তু এখানে সব জিনিসের মধ্যে এনেছে বন্ধ্যাত্ব। নিকটে নদীর কর্দমাক্ত তীরভূমি নলখাগড়ার আবর্জনায় আবৃত—কোথাও বালুকায় অর্ধপ্রাণিত, আবার কোথাও-বা গ্রন্থিল শিকড়গুলো উপরদিকে উঠে মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে।

নদী ছাড়াও সেখানে রয়েছে কতকগুলো কূপ যার পানি পশুর জন্য সুপেয় বটে, কিন্তু মানুষের জন্যে নয়। যেখানে রয়েছে সুপেয় মিঠা পানি, সেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে মরুচারীদের তাঁবু। এরা যাযাবর তুর্কম্যান। এরা নিজেদের ভেড়ার পাল রক্ষায় ব্যস্ত বটে, কিন্তু তাদের একটা চোখ রয়েছে চলমান কাফেলার দিকে। যদি কাফেলাগুলোর রক্ষাব্যবস্থা হয় শিথিল ধরনের, এদের হামলা থেকে রক্ষা নাই তাদের। আর এদের চোখ সেইসব অপরাধী লোকেরও সন্ধান করে ফেরে, যারা দল থেকে পালিয়ে অনুর্বর ভূমির দিকে গেছে চলে।

এই বৃক্ষহীন সমতল প্রান্তরকে বলা হয় বালুকাভূমি। তৈমুর চলেছিলেন এই বালুকাভূমির পথ বেয়ে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালেকা আলজাই, আর তাঁর সমব্যথী একদল অনুগামী। আর ছিল কিছু বর্মসহ ভারবাহী কয়েকটা ঘোড়া, কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং সম্পদের মধ্যে কিছু জড়োয়া গহনা। প্রচুর পানিভরতি চামড়ার পিপাও ছিল তাঁর সাথে। তাঁরা দ্রুতবেগে চলেছিলেন ঘোড়াগুলোর দিকে কড়া নজর রেখে। ছোট ছোট পাহাড়ের শুকনো ঘাস ছিল ঘোড়াগুলোর রাত্রিকালীন খাদ্য। এক কূপ থেকে আর এক কূপে যাওয়াই ছিল তাঁদের ভ্রমণসূচি। অবশেষে মালেকা আলজাইয়ের ভাই আমির হোসেনের সথে তাঁদের দেখা হয়ে গেলে। তিনিও ছিলেন পলাতক, শীর্ণ, একগুঁয়ে মানুষ—সাহসী, কিন্তু লোভী। তিনি ছিলেন কাবুলের এক শাহজাদা। হারানো রাজ্য উদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রধান কামনা।

হোসেন তৈমুরের চাইতে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন। তৈমুরের চাইতে তিনি শ্রেষ্ঠ, এই ধারণাও তিনি গোপনে পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি তৈমুরের লড়াই করার ক্ষমতার প্রশংসা করতেন। অন্যদিকে, তৈমুর বুঝে উঠতে পারতেন না, হোসেন এমন লোভী কেন? তবে তাঁকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে তিনি খুশিই হলেন।

মালেকা আলজাই ছিলেন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র। তিনি ছিলেন রাজা-বানানেওয়ালার যোগ্য নাতনি। বিপদের সময়ে যখন নানা সমস্যা তাঁর মগজে কিলবিল করত, তখনো তিনি হাসতে পারতেন উপহাসের হাসি। দুঃখকষ্ট সম্পর্কে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না। তাঁর সদাপ্রফুল্ল ভাব দেখে তৈমুরের দুশ্চিন্তা দূর হত।

হোসেনের সাথে ছিল তাঁর সুন্দরী স্ত্রী দিলশাদ আগা। তাঁদের দেখা হয়েছিল যে-কূপের ধারে, সেখানে তাঁবুতে বসে তাঁরা চারজনে মিলে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন। তাঁদের সঙ্গে তখন ছিল সর্বমোট ষাটজন ঘোড়সওয়ার। তাঁরা

পশ্চিমদিকে যেতেই মনস্থ করলেন। সেদিকেই বাণিজ্যপথ এবং খারেজম নদীর (বর্তমান নাম আরবসাগর) দক্ষিণে বড় বড় শহরের দেখা পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হল তাঁদের।

তৈমুর সকলকে নিয়ে খিভায় পৌঁছলেন। সেখানকার সুবাদার কিন্তু চিনে ফেললেন তাঁর এই অপ্রত্যাশিত অতিথিকে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, তিনি যেন সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাঁদের জাট-মোঙ্গলদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার মতলব আঁটছেন। পলাতকদের পক্ষে এটা দেরি করার জায়গা নয় বুঝতে পেরে তাঁরা আবার প্রান্তরের দিকে পা বাড়ালেন। কয়েকশত ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে পড়ল তাদের অনুসরণে—এমনকি, স্বয়ং সুবাদারও। এক পর্বতশিখরের শীর্ষদেশে উঠে তৈমুর ও হোসেন, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, রুখে দাঁড়ালেন কিভার লোকদের বিরুদ্ধে। শত্রুপক্ষ তাদের এই আকস্মিক আক্রমণে সত্যই বিস্মিত হল।

উভয়পক্ষের ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। ঘোড়সওয়ার হিসেবে তাতাররা ছিল সত্যই দুর্দমনীয়। বামবাহুর উপর তারা তাদের গোল ঢালগুলো উঁচু করে ধরল। তাদের শক্ত দুধারী বাঁকা ধনুকগুলো থেকে সজোরে নিক্ষিপ্ত ইস্পাতমণ্ডিত তীরগুলো শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। এই যোদ্ধারা দু-হাতেই ধনুকচালনা করে সম্মুখভাগে এবং পিছনদিকে সমানে ছুড়তে পারত তীর।

তারা এক উরুতে খোলা খাপে ধনুকগুলো রাখত প্রস্তুত করে, অন্য উরুতে তৈরি রাখত তীরগুলো। ধনুকগুলো কখনো কখনো লোহা ও শিংমণ্ডিত করে অধিকতর শক্ত করা হত। তখনকার ইংরেজদের লম্বা ধনুর মতোই ছিল সেগুলোর কার্যকারিতা। তাদের আঙুলের ডগায় এইসব অস্ত্র থাকার ফলে তাতাররা হয়ে উঠেছিল দুর্দমনীয়—তিন যুগ আগেকার রিভলভারসহ আধুনিককালের অশ্বারোহী সৈন্যদলের মতোই দুর্দমনীয়। একহাতে ধনুক টেনে ধরে, অন্যহাতে তীর ছুড়তে পারত তারা খুবই দ্রুতবেগে এবং নতুন তীর ধনুকে যোজনা করার জন্য তাদের থামতে হত না। আসলে এই খোলা খাপগুলো ছিল বর্তমান কালের পিস্তল রাখার চর্মনির্মিত কোমরবন্ধের মতো, আর লোহার হাতাগুলো ছিল একালের অশ্বারোহী গোলন্দাজের চর্মনির্মিত আস্তিনের মতো। বাহুর পেশির সাথে বাঁধা ছোট ঢাল আর খাটো ধনুক দিয়ে তারা অনায়াসে শত্রুর ঘোড়ার মাথার চারপাশে ছুড়তে পারত তীর।

খিভাবাসী শত্রুবাহিনীর ভিতর দিয়ে তারা তাদের ঘোড়া চালিয়ে দিল। বারোজনের এক-এক দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুদলের মধ্যে তারা পড়ল ছড়িয়ে এবং যেমন দ্রুততার সাথে শত্রুদলের ভিতরে ঢুকেছিল তেমনিভাবে ফিরেও এল। শুধু প্রয়োজনের সময়ে চালাল তরবারি বা গদা। এইসব অস্ত্রচালনায় তারা ছিল দক্ষ। কিন্তু ধনুকই ছিল তাদের প্রিয় অস্ত্র।

দুপক্ষেই ঘোড়ার জিনগুলো দ্রুত খালি হতে লাগল। উভয়পক্ষেরই প্রধান ব্যক্তিদের অনেকে যুদ্ধস্থলের মধ্যভাগ থেকে একটুখানি দূরেই রইলেন; কারণ তাঁরা জানতেন, ভিতরে গিয়ে পড়লে তাঁদের ঘিরে ধরে কেটে ফেলা হবে। ঘোড়া থেকে যারা পড়ে গেল, তারা নিজেদের রক্ষাকল্পে সতর্কতা অবলম্বন করে অন্য ঘোড়া

যোগাড় করতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাতার যোদ্ধাদের একজন—এল্‌চি বাহাদুর—এমন বেপরোয়াভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে রইল যে, তৈমুর ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে গিয়ে তার ধনুক ছিনিয়ে নিলেন এবং তার ছিলা দিলেন কেটে। ফলে নিরাপত্তার জন্য সে বাধ্য হল ফিরে যেতে।

এমনি সময়ে আমির হোসেন খিভাবাহিনীকে আক্রমণ করতে করতে এগিয়ে গেলেন সুবাদারের দিকে। তিনি নিশানধারীকে কেটে ফেললেন বটে, কিন্তু শত্রুবাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। তৈমুর তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁকে সাহায্য করতে গেলেন এগিয়ে। তৈমুরের আকস্মিক আবির্ভাবে খিভাদল তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল। এই অবসরে আমির হোসেন অক্ষত অবস্থায় সরে পড়লেন। তৈমুরও তখন ঘোড়া ফিরালেন এবং দুইদিকে তলোয়ার চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে করতে এগিয়ে চললেন। ইতোমধ্যে তাঁর কয়েকজন অনুগামী এসে হামলাকারীদের হটিয়ে দিল।

তখনই ছিল আক্রমণের শুভক্ষণ। তৈমুর তাঁর যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে এক হাঁক ছাড়লেন। হোসেনের ঘোড়া এই সময়ে তীরবিদ্ধ হয়ে সওয়ারিকে দিল ফেলে। এ-ব্যাপার লক্ষ করে আমিরের স্ত্রী দিলশাদ আগা ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন স্বামীর কাছে এবং তাঁকে দিলেন নিজের ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে আমির হোসেন আবার তাতারদলে যোগ দিলেন।

তৈমুর এইবার খিভার সুবাদারের দিকে এগিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে ছুড়লেন তীর। তীর সুবাদারের গণ্ডদেশ চূর্ণ করে ফেলল। সুবাদার মাটিতে গেলেন পড়ে। জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে তৈমুর সুবাদারের দেহে এক খাটো বল্লম চালিয়ে দিলেন। নেতার মৃত্যুতে শত্রুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তাতাররা তীর ছুড়তে ছুড়তে পলায়মান শত্রুদলের পিছনে ধাওয়া করল এবং যে-পর্যন্ত-না তীর ফুরিয়ে গেল ততক্ষণ তাদের অনুসরণে বিরত হল না। এরপর তৈমুর দিলশাদ আগাকে আলজাইয়ের সাথে এক ঘোড়ায় দিলেন চড়িয়ে এবং সকলকে নিয়ে ফিরে গেলেন পর্বতশিখরে।

পর্বতশিখরে তখন মাত্র ছিল সাতজন লোক এবং তাদের বেশিরভাগই ছিল আহত। খিভার লোকগুলো প্রান্তরে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে কিছুক্ষণ পরামর্শ করল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। তৈমুর আবার মরুর পথে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। খিভার লোকগুলো তাঁদের অনুসরণে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেলল।

তৈমুর হেসে সঙ্গীদের বললেন, 'না, আমাদের পথের শেষ হয় নাই এখনো।'

সারারাত তারা এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াল। সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল একটা কূপ। সেখানে তাদেরই তিনজন লোককেও পাওয়া গেল। ওরা বল্‌খের তিনজন সৈন্য, পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসেছে। কূপের মিঠাপানি খেয়ে সকলে আরামে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তৈমুর আর আমির হোসেন তখন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাঁরা একমত হলেন যে, তাঁদের পরিচয় আবার না কোথাও ধরা পড়ে যায়, এ-কারণে তাঁদের আলাদাভাবে চলতে হবে।

খুব সকালেও দেখা গেল, বল্‌খি সৈন্য তিনজন আর নাই—তাদের সাতটা ঘোড়ার মধ্যে তিনটা নিয়ে তারা চম্পট দিয়েছে। অগত্যা অবশিষ্ট ঘোড়াগুলোকে ভাগ করে,

সম্ভব হলে সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে হোসেনের দেশে আবার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা চললেন পৃথক পথে। হোসেনের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তৈমুর। তারপর অবশিষ্ট বোঝাগুলো এক ঘোড়ার উপর চাপিয়ে, অন্য ঘোড়ায় আলজাইকে দিলেন চাপিয়ে। তৈমুরের সাথে মাত্র একজন লোক রইল। যিনি ঘর থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় না চড়ে কখনো পথ চলতেন না, তিনিই আজ বালির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন দেখে আলজাই মৃদুহাস্য করলেন। বললেন, 'আমরা আজ হেঁটে যেতে বাধ্য হচ্ছি—নিশ্চয়ই এর চাইতে আমাদের ভাগ্য আর বেশি খারাপ হতে পারে না।'

তাঁদের সাথে কোনো খাদ্য ছিল না। দূরে কয়েকজন ছাগলের রাখালকে দেখে তাঁরা তাদের নিকট গিয়ে খরিদ করলেন কয়েকটা ছাগল। একটা ছাগল ঝলসিয়ে নিয়ে তাঁরা সকলে পেট পুরে খেলেন। অন্যগুলোকে পাথর বোঝাই দিয়ে বস্তার দলে রেখে দিলেন। ছাগ-পালকদের তৈমুর জিজ্ঞেস করলেন, এদেশ ছেড়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কি না। ছাগ-পালকেরা একটা রাস্তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল। বলল, 'এ-রাস্তা ধরে পৌঁছানো যাবে তুর্কম্যানদের আস্তানায়।'

তাঁরা সে-রাস্তা ধরে তুর্কম্যানদের আস্তানার সন্ধান পেলেন। মনে হল, সেখানে কেউ থাকে না। কিন্তু তৈমুর যেই একটা ঘর দখল করলেন, অমনি তাঁর চারপাশে উঠল চিৎকার। মনে হল, তুর্কম্যানরা তৈমুরের দলকে চোর ভেবে আশ্রয় নিয়েছিল অন্য ঘরে। আলজাইকে পিছনে ঘরের ভিতরে রেখে তৈমুর তাঁর একমাত্র সঙ্গীটিকে নিয়ে ঘরের দরজায় দৌড়ে গেলেন। তীর শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ধনুক দিয়েই তীর ছোড়ার ভান করলেন। কিন্তু যাযাবর দল তাদের আক্রমণ করতেই দৌড়ে এল।

ধনুক ফেলে দিয়ে তলোয়ার খুলে তৈমুর এবার তাদের মোকাবিলা করার জন্য গেলেন এগিয়ে। তখন হঠাৎ তুর্কম্যানদলের নেতা তাঁকে চিনে ফেলল। সে তাঁকে দেখেছিল সবুজ-নগরীতে। সে তার লোকদের অগ্রগমনে বাধা দিয়ে নিজে তৈমুরকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে গেল। তারপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পালা। চিৎকার করে সে বলল, 'ইয়া আল্লাহ্। নদীর ওপারের আমির না ইনি!'

দুর্গন্ধযুক্ত ভেড়ার চামড়া-পরিহিত লম্বা কৃশ তুর্কম্যানদের সন্দেহ এতক্ষণে দূর হয়ে যাওয়ায় তারা তৈমুরকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসে মাফ চাইল। সে-রাত্রে একটা ভেড়া জবেহ করে মেহমানদারি করা হল। তাতার যুবকগণ একই পাত্রে খেলেন তাদের সাথে। এমনকি, তুর্কম্যানদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে আগন্তুকদের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে তাদের গল্প শুনল। দুনিয়ার অন্যান্য স্থানে কী হচ্ছে, সে-সম্পর্কে তৈমুরের উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষিত হল এবং ভোর না-হওয়া পর্যন্ত কেউ ঘুমাল না। যাযাবরদের কাছে এটা হচ্ছে সংবাদ জানবার একটা অপ্রত্যাশিত উৎসবিশেষ এবং তাদের একটা সম্মানের ব্যাপারও। এতে তারা যথেষ্ট আত্মপ্রসাদও লাভ করল।

পরদিন তৈমুর তুর্কম্যানদের খানকে কতকগুলো মূল্যবান উপহার দিলেন—একটা মূল্যবান রুবি পাথর এবং দুইপ্রস্থ মুক্তাখচিত কাপড়। এ-উপহারের বিনিময়ে খান দিলেন তৈমুরকে তিনটা ঘোড়া এবং দক্ষিণাঞ্চলের একজন পথপ্রদর্শক।

বারোদিনে তাঁরা মরুভূমি অতিক্রম করে খোরাসানের রাজপথে এসে পড়লেন। প্রথমে যে-গ্রামটি পড়ল, তা ছিল নির্জন এবং ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। পানির জন্য সেখানে তাঁদের মাটি খুঁড়তে হল। সে-কাজ শেষ হলে বিশ্রামের জন্য তাঁরা ঘোড়া ছেড়ে দিলেন।

এখানে কিন্তু তাঁদের একটা নতুন বিপদ দেখা দিল। প্রতিবেশী এক গোষ্ঠীর লোকেরা তাঁদের দেখে ফেলল এবং তাঁদের জোর করে ধরে নিয়ে গেল তাদের দলপতির কাছে—তার নাম ছিল আলি বেগ। তৈমুরের গ্রেফতারিতে সে একটা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পেল। সে নিয়ে গেল তাঁর সমস্ত জিনিস এবং তৈমুর ও তাঁর স্ত্রীকে কীটপতঙ্গ-ভরতি একটা গোয়ালঘরে রাখল বন্দি করে। তৈমুর আলজাইয়ের এই দুর্গতি সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু রক্ষীদল তাঁকে কাবু করে ফেলল। দীর্ঘ বাষট্টি দিন অসহ্য গরমের মধ্যে তাঁদের এই বন্দিখানায় কাটাতে হল। পরবর্তীকালে তৈমুর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, দোষী হোক বা না-হোক, কাউকে তিনি কখনো কয়েদখানায় রাখবেন না। আলি বেগ এই বন্দিদের নিয়ে দরদস্তুর করছিল। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এর ফলে তাঁদের মুক্তিই ঘটে গেল। এক ইরানি দলপতি ছিলেন এই আলি বেগের ভাই। তিনি এ-ঘটনা শুনে তৈমুরের কাছে দেয়া উপহারসহ ভাইকে এক চিঠি লিখে পাঠালেন যে, সবুজ-নগরীর আমির ও জাটদের মধ্যকার বিবাদে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত বোকামি হবে।

অনেকদিন দেরি করে অবশেষে আলি বেগ ভাইয়ের কথা নিল মেনে এবং বন্দিদের দিল ছেড়ে। কিন্তু তৈমুরকে দেয়া তার ভাইয়ের উপহারগুলো সে আত্মসাৎ করল। তৈমুর আর আলজাইকে সে দিল একটা কদর্য ঘোড়া এবং একটা বিশ্রী উট।

তবু নিজেদের এই দুর্ভাগ্যের উদ্দেশে মৃদু হেসে আলজাই বললেন, 'হে খোদা, আমাদের পথের শেষ এখনো হয় নাই!'

৭
উট ও ঘোড়া

শরৎকালীন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হোসেনের সাথে তৈমুরের সাক্ষাতের যে-স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, তৈমুরের নিকট থেকে এখনো তা রয়েছে বহুদূরে—আমুদরিয়ার দক্ষিণে। কিন্তু তিনি একটা বিরাট চক্র ঘুরে নিজের ঘরে পৌঁছবার ইচ্ছা দমন করতে পারলেন না। তা ছাড়া, খালিহাতে হোসেনের সাথে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। আমু- দরিয়ার নিকটে জনৈক দলপতি বন্ধুর বাড়িতে তিনি জন-পনেরো অনুগামী লোক এবং কয়েকটি ঘোড়া সংগ্রহ করলেন। আলজাই এখন চলেছেন একটি ঘোড়ার শিবিকায় আরোহণ করে। রোগা ঘোড়াটা এবং কুশ্রী উটটা ভিখারিদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানে আমরা স্ত্রীর প্রতি এই তাতার-যুবকের গভীর প্রেমের পরিচয় পাই। অল্প কয়েকজন লোকসহ তৈমুর সমরখন্দের চারপাশে একটা অভিযানের উদ্দেশ্যে

আলজাইয়ের আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমুদরিয়া যেখানে অগভীর এবং যে-স্থান দিয়ে সশস্ত্র দলগুলো হরদম যাতায়াত করে থাকে, তেমন স্থানে যখন তিনি পৌঁছলেন, অনুগামীদের সেখানে তিনি থামতে আদেশ দিলেন। বললেন, বড় গরম পড়েছে, আর এগুনো চলবে না। কাজেই তাঁর সহযাত্রীদের থামতেই হল, কতকগুলো ঝাউগাছের নিচে একটা রাস্তার কাছে এবং এক সপ্তাহ ধরে সেখানে অপেক্ষাও করতে হল। ততদিনে আলজাইয়ের ধীরগতি ঘোড়ার শিবিকা এসে পৌঁছে গেল।

আলজাই তাঁর বীরস্বামীকে হঠাৎ সেখানে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন। কিন্তু স্ত্রীর রক্ষাব্যবস্থায় সতর্ক তৈমুর রাস্তা জুড়ে নতুন ধুলো উড়তে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঘোড়াগুলো ও শিবিকাকে তিনি নদীতে নামাতে আদেশ দিলেন, আর পায়ে হেঁটে এবং সাঁতরিয়ে নদীর স্রোত অতিক্রম করতে বললেন—যতক্ষণ-না বিপদ কেটে যায়। তিনি আলজাই এবং ঐ সমস্ত ঘোড়সওয়ারের মাঝখানে প্রতিবন্ধকস্বরূপ নদীটাকে রাখতে চেয়েছিলেন।

নদী পার হয়ে শহরের উপকণ্ঠে যখন আলজাইকে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত, সেই মুহূর্তে তিনি কিন্তু অদৃশ্যভাবে মগরেবের নামাজের সময়ে সঙ্গীসহ সমরখন্দে পৌঁছে গেছেন, আটচল্লিশ দিন ধরে তিনি জাটদের দৃষ্টি এড়িয়ে রইলেন সেখানে। জাটরা তখনো তাঁকে খুঁজে ফিরছিল। রাত্রিকালে তিনি সরাইয়ে গেলেন হালচাল বুঝবার উদ্দেশ্যে। গোপনে বন্ধুদের বাড়িতেও তিনি গেলেন হঠাৎ একটা বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার খেয়াল নিয়ে—যা তখন ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। একাধিকবার মসজিদের মুসল্লিদের দলে ভিড়ে গিয়ে তিনি অফিসারদেরসহ জাট-রাজপুত্রকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখলেন। বিনা-উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তখন কিছু করা সম্ভব হল না। দেশের উপর তখন জাটদের শাসন খুবই দৃঢ়। যতই অত্যাচারী ও গর্বিত হোক-না কেন, উত্তরী জাটরাই তখনো চেঙ্গিজ খানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তা ছাড়া, তারা বিজয়ী।

সমরখন্দের তাতার-দলপতিরা একজন সামরিক নেতার আনুগত্যেই সাধারণত অভ্যস্ত। তারা গোঁড়া মুসলমান ছিল না বটে, তবে যুদ্ধে ছিল তারা অভ্যস্ত। যুদ্ধ ছাড়া আর-কোনো চিন্তা তাদের ছিল না। যে-কেউ তাদের জাগাতে, সংযত করতে এবং বিজয়ের স্বাদ দিতে পারত, তারই আনুগত্য তারা স্বীকার করে নিত। কিন্তু জালাইর-বাহিনী ইলিয়াসের বশ্যতা স্বীকার করেছে, হোসেন পলাতক—তাঁর কাবুলের প্রাসাদে একজন জাট-রাজপ্রতিনিধি আসন গেড়ে বসেছে। আর তরুণ তৈমুরের কাছে বশ্যতা-স্বীকারের মধ্যেও তারা আশার কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

তারা তৈমুরকে সাবধান করে দিল যে, তাঁর উপস্থিতি জাটরা জানতে পেরেছে। কাজেই বারলাস-গোষ্ঠীর নেতাকে আবার ঘোড়ায় চেপে রাতারাতি সরে পড়তে হল।

একাকী তিনি গেলেন না। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি ক্ষুদ্র অনুগামী দল—চালকবিহীন, ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ, লুণ্ঠনপ্রিয় যাযাবর তুর্কম্যান ও ভাগ্যান্বেষী আরবদের কিছুসংখ্যক লোক। সৈন্যবাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণ এদের মধ্যে অবশ্য অল্পই ছিল, তবে রাস্তায় তাঁর নানা কাজে লাগানোর পক্ষে এরা ছিল চমৎকার লোক।

সবুজ-নগরীর নিকটে যখন তৈমুর তাদের নিয়ে এলেন, তারা হেসে ফেলল। তাঁরই প্রাসাদের শাদা গম্বুজের উত্তরদিকে পরিত্যক্ত গ্রীষ্মকালীন চারণভূমিতে তারা তাঁবু গাড়ল। সেখান থেকে তৈমুরের অনুসন্ধানরত জাট-ঘোড়সওয়ারদের বেশ দেখা যাবে। তারা বারলাস বাহাদুরদের কাছে তৈমুরের কাজের প্রশংসা করে বেড়াতে লাগল। তৈমুরের আগমনের খবর পেয়ে বাহাদুররা এল তাঁকে সালাম জানাতে। এল সুনিপুণ ধনুকধারী সেই ইল্‌চি বাহাদুর, আর এল শুভ্রকেশ জকু বারলাস—দাঁড়কাকের মতো স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়েই সবকিছু সে আঁচ করে ফেলতে পারত।

রাজা-বানানেওয়ালার শিবিরের এইসব পুরনো ঘুঘু তরুণ আইন-লঙ্ঘনকারীরা অনেক মদের গ্লাস শূন্য করল। তারা বলল, 'খোদার দুনিয়া যখন এতবড়, তখন চার দেয়ালের ভিতরে থাকবার দরকার কী?'

তৈমুর বললেন, 'কথার তুবড়ি ফুটিয়ে লাভ কী! কী কাজ করতে পারবে, তা-ই বলো। তোমরা কি কাকের মতো কেবল জাটদের টেবিল থেকে খুদকুঁড়ো কুড়িয়ে খাবে, না, বাজপাখির মতো শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে?'

বারলাস-গোষ্ঠীর লোক দুজন বলল, 'ইয়া আল্লাহ্, আমরা কাক নই নিশ্চয়ই!'

আলজাই এসে পৌঁছুলে তারা তাঁকে সসম্ভ্রমে সালাম করল। কারণ, তিনিও কি স্বামীর সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন নাই? তৈমুর যখন শরৎশেষে সেখান থেকে তাঁবু উঠিয়ে দক্ষিণদিকে হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করতে রওনা হলেন, তারাও তাঁর সঙ্গে গেল।

এ-রাস্তায় চলা দুর্বলদের কাজ ছিল না। আকাশচুম্বী পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পাঁচশত মাইল চলে এ-রাস্তা বর্তমান আফগানিস্তানে গিয়ে পড়েছে। এখনো পর্যন্ত এ-রাস্তার সঠিক মানচিত্র তৈরি হয় নাই। কিংবা এটা হয় নাই সঠিকভাবে আবিষ্কৃতও। এ-রাস্তা উপরদিকে একটা নদীর মুখ পর্যন্ত গেছে এবং সেখান থেকে নদীটা হয়ে পড়েছে একটা বরফের বিছানার মতো। হাঁটু পর্যন্ত বরফ ভেঙে তাঁদের এগিয়ে যেতে হল।

এই রাস্তা তাঁদের নিয়ে গেল 'বাবা-ই-কোহ'-এর তুষারপ্রবাহের নিচে দিয়ে ঝড়ো-হাওয়া-তাড়িত অধিত্যকাভূমিতে। তাঁরা সেখানে প্রতিধ্বনি-মুখরিত খাড়া পাহাড়ের নিচে গোল তাঁবু খাটালেন। সেদিনই তাঁরা আরো উঁচুতে আলোকোদ্ভাসিত বরফ-রাজ্যে চলে গেলেন।

ঘোড়াগুলোকে পরানো হল পশমের কম্বল, আর অশ্বারোহীরা পরল নেকড়ে ও স্যাবলের চামড়া। জ্বালানি কাঠের গাছ দেখলেই তারা সেগুলো কেটে তাদের শ্লেজের উপর জমা করে সঙ্গে নিয়ে চলত। কখনো কখনো উপজাতীয়দের আস্তানার বুরুজঘরের নিচে দিয়ে তাদের চলতে হত। তখন হাজার ফিট উঁচু থেকে অদৃশ্য সান্ত্রিদের চিৎকার কিংবা কুকুরের ডাক শোনা যেত।

একাধিকবার তাঁদের উপর আফগানদের হামলা হয়েছিল। এরা জানত না, কাদের সাথে তারা মোকাবিলা করতে যাচ্ছে। এসব হামলায় লাভ হয়েছিল তৈমুরের দলের। হিন্দুকুশ পর্বতের বারো হাজার ফুট বরফমণ্ডিত শীর্ষদেশ বহুকষ্টে অতিক্রম করে তাঁরা অবশেষে কাবুল-উপত্যকায় পৌঁছলেন।

বিশ্রামের অবসর তাঁদের ছিল না। কারণ সেখানে পৌঁছেই তাঁদের সমস্ত শহরে

চক্রাকারে ঘুরতে হল। গ্রামে নতুন ঘোড়া ও ভেড়া খরিদ করে তাঁরা ধরলেন কান্দাহারের পথ। এ-পথ ছিল মোটামুটি বরফমুক্ত ও সহজগম্য। দক্ষিণাঞ্চলের নিম্ন-উপত্যকাভূমিতে পৌঁছে তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে পেলেন আমির হোসেনের দেখা। তিনি সেখানে তৈমুরেরই অনুরূপ, তবে সংখ্যায় বেশি, একদল সৈন্য নিয়ে করছিলেন অপেক্ষা।

শীতকালটা তাঁরা সেখানে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দিলেন। নিকটবর্তী এক পাহাড়ি রাজ্যের শাসনকর্তার উপহার নিয়ে একজন দূতের আগমনে তাঁরা খুশি হয়ে উঠলেন। মনে হল, এই রাজার সিজিস্তান রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ চলছে এবং তার ফলে অনেকগুলো পার্বত্য দুর্গ তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিদ্রোহীদের উৎখাত করতে তাঁকে সাহায্য করলে তিনি তৈমুর ও হোসেনকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। উভয়েই সাহায্য করতে সম্মত হলেন—হোসেন সম্মত হলেন এই আশায় যে, এর ফলে দক্ষিণপ্রদেশ তাঁর হাতে আসবে; আর তৈমুরের আশা ছিল, এর ফলে আবার তিনি যুদ্ধ করার সুযোগ পাবেন।

রাস্তা চলবার যোগ্য হলেই তাঁরা সিজিস্তানের রাজার সাথে গিয়ে যোগ দিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভাগ্যের উপর নির্ভর করেই তাঁরা এ-কাজ করলেন। তৈমুরের কাছে এটাই ছিল উপভোগ্য। তাঁরা বিদ্রোহীদের অধিকাংশ ঘাঁটিই, একরকম আচমকা আক্রমণ চালিয়ে, দখল করে ফেললেন।

কিন্তু হোসেন গ্রাম লুট করে এবং পরে নিজের লোকদেরই রক্ষিবাহিনী হিসেবে সেখানে স্থাপন করে গোলমাল পাকিয়ে তুললেন। তৈমুর ছিলেন এ-ব্যাপারে উদাসীন। সিজিস্তানিরা খুশি হল না। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা গোলমেলে অবস্থার সুযোগ নিয়ে সিজিস্তানের রাজাকে লিখে পাঠাল, 'আপনার প্রতি আমাদের কোনোরূপ বিদ্বেষ নাই। একথাটা ভেবে দেখবেন, যদি তাতারদের এসব স্থান দখল করতে দেওয়া হয়, তা হলে তারা কিন্তু সব দেশই নিজ অধিকারে নিয়ে যাবে।'

সিজিস্তানের শাসক তাঁর সাহায্যকারীদের একটি কথাও না বলে রাত্রিযোগে পূর্বতন বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিলেন। পাহাড়ি জাতিগুলো অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণত সন্দেহপরায়ণ; কাজেই এরূপভাবে ঘুরে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে মোটেই নতুন কিছু নয়। তারা একযোগে তৈমুরকে আক্রমণ করল, কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

এই সংঘর্ষে তৈমুরের সাথে মাত্র বারোজন যোদ্ধা ছিল। সিজিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত তীরের ঝাঁকের লক্ষ্যস্থল ছিলেন তিনি। একঝাঁক তীরের আঘাতে তাঁর হাতের হাড় গেল গুঁড়ো হয়ে। আরেকটা তীর এসে লাগল তাঁর পায়ে। তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না—শুধু তীরগুলো টেনে বার করে ফেললেন ভেঙে। কিন্তু পরে এ-আঘাত সত্যিই গুরুতর হয়ে উঠেছিল। সেজন্য তাঁকে বহুদিন তাঁবুতে পড়ে থাকতে হয়েছিল।

সিজিস্তানিরা হল পরাজিত। তৈমুর ও হোসেন লাভ করলেন নতুন সম্পত্তি এবং অনুগামী দল। এই নতুন বাহিনীর বেশিরভাগ নিয়ে হোসেন চলে গেলেন উত্তরদিকে অভিযানে। আর তৈমুর তাঁর ঘা ভালো করার জন্য রয়ে গেলেন পাহাড়েই।

আলজাই এসে তাঁর সাথে যোগ দিলেন সেখানে। স্বামীকে বেশ কিছুদিনের জন্য তিনি দখল করে বসলেন। সেখান থেকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে তৈমুরকে সরিয়ে নেওয়ার সাহস কারো ছিল না। তাঁদের তাঁবু ছিল শীতলবায়ু-প্রবাহিত আঙুর-বাগানের মধ্যে। আর তাঁদের ঘোড়াগুলোও সেখানে প্রচুর ঘাসের মধ্যে বেহেশতের স্বাদ পেয়েছিল। শওয়াল মাসের পূর্ণিমা রাত্রে কার্পেটের উপর শুয়ে-শুয়ে তাঁরা আলোকোজ্জ্বল নিম্নভূমির দিকে চেয়ে থাকতেন। এই চাঁদের মাসে আলজাই তাঁর ছেলে জাহাঙ্গিরের সাথে তৈমুরের শুশ্রূষায় ব্যস্ত রইলেন।

আলজাই দিন গুনতেন, আর তৈমুর অস্থিরভাবে শিবিকার চারপাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে তাঁর পায়ের আঘাত কতটা ভালো হল দেখতেন। আগের মতো সোজা দাঁড়াতে পারলেও তিনি যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করতেন।

হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর যুদ্ধসাজ, অস্ত্রশস্ত্র ও জিনসজ্জিত ঘোড়া আনতে বললেন। তাঁকে পেয়ে তখনো আলজাইর সাধ মেটেনি, তবু বিশ্বস্ত সহধর্মিণীর কর্তব্য স্মরণ করে নিজের গভীর দুঃখ গোপন করে, তিনি তরবারি ও কোমরবন্ধে স্বামীকে সাজিয়ে দিলেন। বললেন, 'খোদা তোমায় রক্ষা করুন!'

৮
পাথুরে সেতুতে

উত্তরাঞ্চলে তৈমুরের যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অতিরিক্ত আশাবাদী হোসেন সেখানে এক জাট-বাহিনীকে হামলা করে বসেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে নিজের বাহিনী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তৈমুরের পরামর্শের বিরুদ্ধে এ-কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে তৈমুর খুব ক্রুদ্ধ হলেন। কারণ এর অর্থ, তাঁকে পাহাড়ি গোষ্ঠীগুলোর মাঝে গিয়ে সেখান থেকে হোসেনের জন্য নতুন সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। অথচ তখনো তাঁর হাত সারে নাই। ফলে একই সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম ধরা ও অস্ত্র চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নিজের ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে খাদ্যের জন্য শিকার করতে করতে ঘোড়ায় চললেন। আমুদরিয়ার উত্তরদিকে একস্থানে তিনি তাঁবু গেড়ে হোসেনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময়ে তিনি শত্রুদলের নজরে পড়ে গেলেন। ইতিহাসে এ-ব্যাপারটার বিশদ বিবরণই পাওয়া গিয়েছে।

একটা পাহাড়ি টিলার পারে নদী ঘেঁষে ছিল তৈমুরের তাঁবুটা। কয়েকদিন সেখানে প্রতীক্ষার পর তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন—এমনকি তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। রাত্রি ছিল পরিষ্কার, আকাশে ছিল উজ্জ্বল চাঁদ—তিনি নদী-বরাবর হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। খোঁড়া পায়ে হাঁটার অভ্যাস করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু খোঁড়া পা আর কখনো ভালো হল না। এ-আঘাত তাঁর গা-সহাও হয়ে উঠল না।

পাহাড়ে যখন তিনি ফিরে এলেন, চাঁদের আলো তখন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এবং

পূর্বাকাশ হরিৎবর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। তৈমুর ফজরের নামাজের জন্য হাঁটু গেড়ে বসলেন। নামাজ পড়ে যখন উঠলেন, দেখতে পেলেন, পর্বতশিখরের অপর পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। সে-সময়ে জাট-ঘাঁটি ছিল বল্‌খে—সেদিক থেকেই তারা আসছিল। তৈমুর তৎক্ষণাৎ তাঁবুতে চলে গেলেন এবং নিজের লোকদের জাগিয়ে তাঁর ঘোড়া আনতে বললেন।

একাই তিনি গেলেন আগন্তুকদের সাথে মোকাবিলা করতে। আগন্তুকরা তাঁকে দেখে থামল এবং স্বল্পালোকে তাঁর দিকে একনজর চাইল। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে তোমরা আসছ, আর কোথায়ই-বা যাচ্ছ?'

তাদের মধ্যে একজন উত্তর করল, 'আমরা আমির তৈমুরের নওকর, তাঁর খোঁজেই এসেছি। তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। শুনেছি যে, তিনি কামরুদ ছেড়ে এই উপত্যকাতেই এসেছেন।'

এ-কণ্ঠস্বর তৈমুরের পরিচিত ছিল না, কিংবা যোদ্ধাদের কাউকে তিনি চিনে উঠতে পারলেন না। বললেন, 'আমিও আমিরের একজন নওকর। যদি চাও, আমি তোমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি।'

একজন অশ্বারোহী তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দলের নেতাদের নিকট ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। তৈমুর শুনলেন, সে তাদের বলছে, 'একজন পথপ্রদর্শক পেয়েছি—সে আমাদের আমিরের কাছে নিয়ে যাবে।'

তৈমুর ধীরে ধীরে তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। অফিসারদের কয়েকজনকে তিনি চিনতে পারলেন। এদের তিনজন বারালাস-গোষ্ঠীর তিন দলপতি এবং সঙ্গে তাদের তিনজন অশ্বারোহী। তারা এই অপরিচিত পথপ্রদর্শককে তাদের কাছে এগিয়ে যেতে বলল। কিন্তু যখন তৈমুরকে চিনতে পারল, তারা ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসল এবং তাঁর রেকাবে চুমো দিল। তৈমুরও নেমে পড়লেন এবং তাদের কিছু খেলাত না দিয়ে পারলেন না। একজনকে দিলেন তিনি তাঁর শিরস্ত্রাণ, অন্যজনকে তাঁর কোমরবন্ধ এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে দিলেন তাঁর কোট। সবাই একসঙ্গে বসল। শিকার-করা প্রাণীগুলো দিয়ে তৎক্ষণাৎ এক ভোজের ব্যবস্থা করা হল। তৈমুরের নিমক খেয়ে সকলে তাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিল। তৈমুর আগন্তুক দলের একজন কাসেদকে নদীর ওপারে পাঠালেন জাটরা কী করছে, সে-সংবাদ জানবার জন্য। সে-যোদ্ধা সাঁতরিয়ে আমুদরিয়া পার হতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে ঘোড়াসুদ্ধ ডুবে গেল। পরে সে এক বালুকা-বেলায় পৌঁছে দূরবর্তী এক নদীর তীরে গিয়ে উঠল। সে ফিরে এল এই সংবাদ নিয়ে যে, জাটবাহিনী বিশ হাজার সৈন্যসহ সবুজ-নগরী থেকে বেরিয়েছে এবং চারদিকে লুটপাট করতে করতে এগিয়ে আসছে।

এ-কাসেদ নিজেও তার বাড়ির পাশ দিয়েই গিয়েছে। কিন্তু পথে পড়লেও নিজের বাড়িতে সে যায় নাই! বলেছে, 'কী করে যাব? আমার কর্তাই যেখানে গৃহহারা, সেখানে আমি নিজের ঘরে যাব কোন্ মুখে?'

খবর শুনে তৈমুর আরো অস্থির হলেন। জাট-দল তৈমুরবাহিনীর খবর পেয়ে আরো বেশি করে লুটপাট চালাতে লাগল। তৈমুর জানতেন, নদীর ওপারের লোকেরা

লুটপাটে বিরক্ত হয়ে তাঁর দলে এসে ভিড়বে। সে-সময় তাঁর সৈন্যসংখ্যা জাটদের এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল। জাট-সেনাপতি বিকিজুক এইশ্রেণীর যুদ্ধে ছিল ওস্তাদ। নদীর উত্তরপারে তার অগভীর স্থান জুড়ে সে তার বাহিনী সমবেত করল।

এই সৈন্যব্যূহ ভেদ করে নদী পার হওয়া তৈমুরের কাছেও অসম্ভব মন হল। তবু তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে নদী পার হলেন। এক মাস ধরে তিনি বিকিজুককে ঠেলে নদীর উজানদিকে নিয়ে চললেন। অবশেষে আমুদরিয়া যেখানে সরু হয়ে গভীরতা একেবারে হারিয়েছে সেখানেই তাকে এনে ফেললেন। সেখানে এক পাথুরে সেতুর উপর এসে তিনি থামলেন। সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, জাটরা সেতুর উপরে নিক্ষিপ্ত হতে চাইল না। তৈমুর সগর্বে নিজের শিবিরে ফিরে গেলেন। সে-রাত্রে পাঁচশত লোককে তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য অফিসার মোয়াভা এবং হোসেনের সবচাইতে যোগ্য সহকারী আমির মুসার পরিচালনাধীনে সেতু এবং শিবিরের পাহারায় রেখে নিজে বাকি সব সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন। জাট-শিবিরের নিকট দিয়েই তিনি নদী পার হলেন এবং কোথাও কিছুমাত্র না-থেমে পাহাড় যেখানে অর্ধবৃত্তাকারে নদীকে বেষ্টন করেছে, সেদিকে এগিয়ে চললেন।

পরদিনই জাট-কাসেদ দল তৈমুরের অভিসন্ধি বুঝতে পারল এবং বিকিজুকের কাছেও একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শত্রুদলের এক বিরাট অংশ নদী পার হয়ে গেছে। তৈমুরের পুরনো শিবিরের জনসংখ্যা যে কমে গেছে, এটা বাইরে থেকে বোঝা গেল না। বিবিজুক যদি সেতু আক্রমণ করে, তা হলে মোয়াভা ও আমির মুসা তার মোকাবিলা করবে, আর তৈমুর পেছন থেকে মোঙ্গলদের উপর হামলা চালাবেন।

কিন্তু বুদ্ধিমান বিকিজুক বিপদের গন্ধ পেয়ে সতর্ক হল এবং দিনে চুপ করে রইল। সে-রাত্রে তৈমুর তাঁর বাহিনীকে পাহাড়ের ভিতর ছড়িয়ে দিলেন এবং শত্রুশিবিরের তিনদিক থেকেই যত ইচ্ছা আলো জ্বালতে তাদের আদেশ দিলেন।

এসব আলো দেখে শত্রুপক্ষ একেবারে ভড়কে গেল এবং ভোর হওয়ার আগেই দ্রুতবেগে স্থান ত্যাগ করে গেল। তৈমুর তাঁর বাহিনী নিয়ে পলায়মান শত্রুদলের উপর প্রবল হামলা চালালেন। জাট-দল একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, আর তৈমুর পিছন থেকে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চললেন।

আমির হোসেন এই নদীর যুদ্ধে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করেন নাই। এখন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তৈমুরের সাথে তিনি যোগ দিলেন। তৈমুরকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এখন তাঁকে অতিআগ্রহীও দেখা গেল। বললেন তিনি, 'পরাজিত শত্রুদলের অনুসরণ খারাপ যুদ্ধনীতি।'

'কিন্তু শত্রুদল এখনো পরাজিত হয় নাই।' এই বলে তৈমুর অনুসরণ করেই চললেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এলে তিনি তাদের অভিনন্দন জানালেন। যোদ্ধারা তাদের ঘোড়ার চারদিক বেষ্টন করে আনন্দপ্রকাশ করতে লাগল। মেয়েরা খুশিতে তাদের ঢোলা আস্তিন নাড়ল। তৈমুরের তখনো বিশ্রাম ছিল না; কারণ ভাবী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে তাঁকে নয়া নেতার নিযুক্তির ব্যাপারে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করতে হবে, নিজের লোকদের ভিতরকার পুরনো বিবাদ মিটিয়ে

ফেলতে হবে, জাটদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মালপত্র ভাগযোগ করতে হবে এবং নিহত ও আহত সৈন্যদের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ ও ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি ঘোড়ার উপর থেকেই তাঁর উত্তরগামী অশ্বারোহীদলকে কী করতে হবে না-করতে হবে, সে-সম্পর্কে নির্দেশ দিতে লাগলেন।

তৈমুরবাহিনীর অবিরাম তাড়া খাওয়ার ফলে জাট সৈন্যদল আমুদরিয়া ও শিরদরিয়ার মধ্যবর্তী স্থল একেবারে ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। উত্তরাঞ্চলের প্রান্তরে সৈন্যসমাবেশরত রাজপ্রতিনিধি ইলিয়াসের নিকটে পাহাড়ের ওপার থেকে আগত দুজন আরোহী এগিয়ে এল। তারা ঘোড়া থেকে নেমে 'খান' সম্বোধন করে তাঁকে সালাম জানাল। বলল, 'তাঁর পিতা তুঘলক খান এ-মরজগৎ ছেড়ে আসমানের উপর পরজগতে চলে গেছেন।' এরপর তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গেল।

ইলিয়াস খান রাজধানী আলমালিকে চলে গেলেন। এ-শহরটি ক্যাথে যাওয়ার পথেই অবস্থিত। তৈমুরের সাথে ব্যক্তিগত যুদ্ধে বিকিজুক এবং আরো দুজন মোঙ্গল যোদ্ধা ধরা পড়েছিল। মা-অরা-উন্নাহারের নয়া অধিপতি এই সাফল্যে খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি তাঁর তাঁবুতে এই বন্দি অভিজ্ঞ অফিসারদের এক ভোজের আয়োজন করার আদেশ দিলেন ও খানের নিমকহালালির জন্য তাদের প্রশংসা করলেন। তাদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীরকম ব্যবহার তারা তাঁর কাছে চায়। শান্তভাবে তারা উত্তর করল, 'তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। যদি আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেন, তবে অনেকেই তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। আর যদি আমাদের বাঁচতে দেওয়া হয়, তবে অনেক মিত্র তার ফলে আপনি পাবেন। আমাদের কাছে সবই সমান—যখন যুদ্ধসাজ পরেছি, তখনি মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়েছি।'

আমির হোসেন তৈমুরকে সতর্ক করে দিলেন, ধৃত শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া ভুল হবে। কিন্তু তরুণ বিজয়ী এই মোঙ্গলদের শুধু নিজহাতে গ্রেফতার করেই নয়, তাদের খাইয়েদাইয়ে, তাদের ঘোড়া সরবরাহ করে মুক্ত করে দিয়েই বেশি আনন্দ পেলেন।

ইতোমধ্যে একটি কৌশল খাটিয়ে তিনি তাঁর সবুজ-নগরী পুনর্দখল করলেন। কৌশলটি তিনি মরুচারীদের কাছেই শিখেছিলেন। নগরীর দেয়ালের দৃষ্টিসীমায় এসেই তিনি তাঁর লোকদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের আদেশ করেছিলেন, যেন তারা চারদিক থেকেই ঘোড়া ছুটিয়ে নগরীর দিকে আসে। এদের অতি-উৎসাহী কেউ-কেউ আবার পপলারকুঞ্জের ডালপালা ভাঙল, এবং এক বিরাট ধূলিঝড়ের সৃষ্টি করল। দুর্গস্থ জাটসৈন্যগণ এসব এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী দলের আগমন-সঙ্কেত মনে করে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চম্পট দিল। সবুজ-নগরী অবরোধের আর দরকার হল না।

তৈমুরের বিবরণ-লেখকদের একজন নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন, 'তৈমুরের যুদ্ধ-ভাগ্য সবসময়েই ভালো। এ-বৎসর আগুনের সাহায্যে তিনি এক সৈন্যবাহিনী পরাজিত করেছেন, আর ধূলিঝড় সৃষ্টি করে এক নগরী দখল করেছেন।'

অস্থিরমতি তাতারদের ক্ষেত্রে সাফল্য বিপদের চাইতেও বেশি পীড়াদায়ক। তৈমুরের অতি-উৎসাহে বিরক্ত হোসেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ ও সুবিধা আদায়

করলেন, আর অস্থিরমতি তৈমুর কাবুলের অধিপতিকে এক মসজিদে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে, সঙ্গী হিসেবে তিনি বিশ্বস্ত থাকবেন। হোসেন প্রতিশ্রুতি দিলেন বটে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নেয়ার জন্য তিনি বিরক্ত হলেন। উভয়েই খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নানা দায়িত্বভার কাঁধে পড়ায় মনে-মনে পীড়িতও বোধ করছিলেন। অনুগামীদের সাথে ঝগড়াও তাঁদের করতে হচ্ছিল।

বিবরণ-লেখক আরো লিখেছেন, 'সৌভাগ্যবতী মালেকা আলজাই তাঁদের শিবিরে এসে পীড়িত তৈমুর ও হোসেনের শুশ্রূষা-ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।'

৯
বৃষ্টির লড়াই

ইলিয়াস খান যে ফিরে আসবেন, এ ছিল অনিবার্য। তৈমুর তাঁর সাথে মোকাবিলা করার জন্য অর্ধপথ এগিয়ে গেলেন শিরদরিয়ার উত্তরদিকের সমতলভূমিতে। তাতার-দেশে অভিযান চালাবার আগে মোঙ্গলেরা এখানেই তাদের ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে এবং তৈরি করিয়ে নেয়। ইলিয়াস খান পূর্ণশক্তি নিয়েই এলেন—এশিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়াসমূহে চড়ে এল তাঁর সুশিক্ষিত, সশস্ত্র, বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী। চর্মবস্ত্র-পরিহিত অশ্বারোহী-বাহিনীর উপরিভাগে জ্বলতে লাগল তাদের শিং-বাঁধানো যুদ্ধ-পতাকা।

তাতারদের চাইতে সংখ্যায় ছিল তারা কম। কিন্তু তৈমুর এদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে ছিলেন ওয়াকিবহাল। তাই পার্বত্য সৈন্যবাহিনীসহ আমির হোসেন না-আসা পর্যন্ত তিনি শত্রুবাহিনীর সাথে কাসেদ মারফত যোগাযোগ রক্ষা করতে লাগলেন। তাতারদের সর্বশক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত হল—এই সম্মিলিত বাহিনীতে ছিল বারলাস-গোত্রের মরুচারী অশ্বারোহী দল, জালাইয়ের গোষ্ঠীর দলপতিগণ, সেলডুজ বংশের অশ্বারোহী-বাহিনী, ঘোর-গোত্রের যোদ্ধারা, এবং দূর থেকে যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে সমবেত আফগান স্বেচ্ছাবাহিনী। শিরস্ত্রাণধারী ও বাহাদুর দলও এই তাতার-নিশানের নিচে সমবেত হল।

প্রায় সবাই ছিল অশ্বারোহী। শুধু পরিখার পেছনে, শিবির-পাহারারত সৈন্যদল, কয়েকটি বল্লমধারী দল এবং নওকররাই ছিল এর ব্যতিক্রম। তাই বলে অনিয়মিত বাহিনীও এদের বলা চলে না।

লোহার জালেই ইরানি যুদ্ধসাজ, লৌহবুটিযুক্ত শিরস্ত্রাণ, গলদেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে নাক বা থুতনির সাথে বাঁধা টুপি—এসবে সজ্জিত ছিল তারা। ডবল বর্ম বা ধাতুনির্মিত চাদরে তাদের কাঁধ ছিল ঢাকা। কতকগুলো ঘোড়া ছিল চর্ম বা বর্মাবরণ এবং পাতলা লোহার টুপিতে আবৃত।

শিং বা লৌহযুক্ত ধনুক ছাড়াও তাদের সাথে ছিল বাঁকা খড়্গ, লম্বা তলোয়ার

কিংবা সোজা দুধারী কিরিচ। তাদের বল্লমগুলো কখনো কখনো সরু-মুখ পাতলা দশফুট লম্বা বর্শার কাজ দিত, কখনোবা শত্রুর অস্ত্র চূর্ণকারী খাটো ভারী লৌহগ্রন্থিযুক্ত অস্ত্রের কাজ করত। অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে ছিল গুর্জ। তাদের দলে ছিল অশ্বারোহী-বাহিনী বা 'হাজারা' এবং 'মিংবাশি' বা কর্নেল-পরিচালিত পল্টন। দলপতিগণ সৈন্যবাহিনীর ভিতরে ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের উপরই যুদ্ধ-পরিচালনার ভার ছিল। তৈমুর এবং হোসেনের পাশে-পাশে ছিল নিজ নিজ অনুগামীদের বা 'তাবাচিদের' দলপতিরা।

তৈমুর তাঁর বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করলেন—ডানপার্শ্ব, মধ্যভাগ ও বামপার্শ্ব। প্রত্যেক পার্শ্বের সৈন্যদিগকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—যারা যুদ্ধ করবে, আর যারা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ডানপার্শ্বের বাহিনীকে ইচ্ছা করেই করা হয়েছিল অধিকতর শক্তিসম্পন্ন—এর পরিচালনভার দেওয়া হল হোসেনের উপর। বামভাগ ছিল দুর্বল এবং সেদিক দিয়ে ভয়ের কারণও ছিল। ও-ভাগের ভার তৈমুর নিজে নিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বারলাস দলপতিগণ—আমির জকু এবং তাঁর অনুসারীরা।

এই চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষায় তৈমুর আশান্বিত—খুশিই হয়েছিলেন। নিজেদের সংখ্যাশক্তি এবং সৈন্যসমাবেশের কৌশল পর্যবেক্ষণ করে তাতারদের মন আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হল। এরপর শুরু হল বৃষ্টি—উঁচু মালভূমির সত্যিকার বসন্তকালীন ঝড়। এই ঝড়ের স্রোতের দাপটে মাটি আর মানুষ নাস্তানাবুদ হল। ঝড়-বিদ্যুতের মাতামাতিতে আকাশ পূর্ণ হল। নরম মাটি কর্দমাক্ত জলাভূমি হয়ে উঠল। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় দুর্বল ঘোড়াগুলোর পেট পর্যন্ত কাদায় প্রলেপাবৃত হয়ে গেল। নদী স্ফীত হয়ে তীরভূমি ভাসিয়ে দিল। সৈন্যেরা নিজেদের অস্ত্রগুলো কোনোরকমে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে ভিজা পোশাকে এখানে-ওখানে যেতে লাগল। এ-সম্পর্কে বিবরণ-লিখিয়ের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ : 'এই বৃষ্টিটা ছিল জাট-মোঙ্গলদেরই একটা জাদুর খেলা। জেদ্দা-পাথরের সাহায্যে তাদের জাদুকরেরা এটা সৃষ্টি করেছিল।* তাঁর ভাষ্য থেকে আরো জানা যায়, 'এমন যে হবে জাটরা তা আগেই জানতে পেরে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তারা ভারী পশমের তাঁবুর নিচে আশ্রয় নিয়েছিল এবং পশমের কম্বল দিয়ে তাদের ঘোড়াগুলোকে ঢেকে রেখেছিল। তা ছাড়া, পানি বেরিয়ে যাবার জন্য তারা খালও খনন করে রেখেছিল।' তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল এই যে, এই তুফানে তৈমুরের লোকদের চাইতে জাটদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল। তারা পরিচ্ছন্ন ঘোড়ায় চড়েই তাতার-শিবিরের দিকে হামলা চালাতে এগিয়ে গেল।

তৈমুরও তাদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে গেলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কিছুক্ষণ ধরে ব্যক্তিগত তলোয়ারবাজি চলল। তারপর তৈমুর তাঁর বামপার্শ্বের বাহিনীকে শত্রুর ডানপার্শ্ব আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাতারবাহিনী

---

* জাদুর খেলা মোঙ্গলদের একটা পুরনো ঐতিহ্য। ইতিহাসকার এটাকে সত্য প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, পরদিন জাদুকরদের একজন মারা যাওয়ার ফলে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। জাটরা তখন দল বেঁধে তাদের অনুসরণ করল। তৈমুরের রিজার্ভবাহিনীও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেল।

দ্রুত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তৈমুর অগ্রসর হওয়ার জন্য বাদ্যধ্বনি করতে আদেশ দিলেন এবং তাঁর বারলাস-গোত্রের সৈন্যদের নিয়ে সম্মুখদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাদার সাগরে পড়ে তাঁর ছত্রভঙ্গ বাহিনী পারস্পরিক সংযোগ হারিয়ে ফেলল এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ায় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিশাহারা হয়ে গেল।

সে-পরিস্থিতিতে ধনুকের ব্যবহার নিষ্ফল। ঘোড়াগুলোর পক্ষে পা ঠিক রাখা কঠিন হল। নালাগুলোর হলদে পানি লহুতে লাল হয়ে উঠল। লোহার অস্ত্রগুলোই ছিল একমাত্র কার্যকর অস্ত্র। তলোয়ারের ঝনৎকার, ঘোড়ার হ্রেষারব, যোদ্ধাদের চিৎকার এবং 'দার-উ-গর' বলে তাতারিদের হাঁক—এসবের সম্মেলন যুদ্ধক্ষেত্রকে করে তুলল এক পাগলা-গারদ।

তৈমুর তাঁর দল নিয়ে জাট-সেনাপতির নিশান লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন এবং কুঠারহস্তে মোঙ্গল সেনাপতির একেবারে কাছে গিয়েও পৌঁছলেন। মোঙ্গল-সেনাপতি তৈমুরের আঘাত ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে তৈমুরকে খতম করার জন্য তলোয়ারহস্তে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘোড়ায় চড়লেন। ঠিক সেই সময়ে তৈমুরের পৃষ্ঠরক্ষী জকু তার বর্শা মোঙ্গল-সেনাপতির দেহের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিল। নিশান মাটিতে নেমে পড়ল।

আবার তৈমুর তাঁর জিনসংলগ্ন ড্রাম ও করতাল বাজাতে আদেশ দিলেন। নিশানের পতনে সদা-বিচলিত মোঙ্গলবাহিনী পশ্চাদপসরণ শুরু করল। কিন্তু এই যুদ্ধক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ সম্ভব ছিল না। তাদের অশ্বারোহীরা বহু কষ্টে এগিয়ে গিয়ে নতুন নতুন ঘোড়ায় চেপে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

একটা পাহাড়ের উপর উঠে তৈমুর দেখতে লাগলেন, অন্যত্র যুদ্ধের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে। আমির হোসেন মোটেই সুবিধা করতে পারছিলেন না এবং শত্রুর তাড়া খেয়ে পিছনেও তাঁকে হঠতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর রিজার্ভবাহিনীর শত্রু-প্রতিরোধ শুধু মোঙ্গলদের অগ্রগতি থামিয়ে রাখতে পেরেছিল। উভয় সৈন্যদলের মধ্যভাগই সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

তৈমুর তাঁর ছত্রভঙ্গ-বাহিনীকে আবার সংঘবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে-কাজ অল্পসময়ের মধ্যে সম্ভব ছিল না। এদিকে তিনি বিলম্বও সইতে পারছিলেন না। তাই কাছে যেসব অশ্বারোহীকে পেলেন, তাদের নিয়েই হোসেনের সাথে যুদ্ধরত মোঙ্গলবাহিনীর দক্ষিণপার্শ্ব তিনি আক্রমণ করলেন। তিনি এতটা এগিয়ে গেলেন, যেখান থেকে শত্রুদের উপরে আক্রমণ অত্যন্ত সহজ। তৈমুরের এই অপ্রত্যাশিত অগ্রগতিতে শত্রুপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হল। ইতোমধ্যে ইলিয়াস খান সতর্কভাবে রিজার্ভবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখলেন। মনে হল, পশ্চাদপসরণের সংকল্পই তিনি করেছেন।

তৈমুর এই সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করলেন না। তিনি তাঁর নিজস্ব কাসেদ দিয়ে হোসেনকে খবর পাঠালেন, অবিলম্বে তাঁর বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে তিনি যেন এগিয়ে যান।

হোসেন চিৎকার করে উঠলেন, 'কেন, আমি কি কাপুরুষ যে আমাকে এইভাবে আমার লোকদের সাক্ষাতে আদেশ দিয়ে পাঠানো হল?' তৈমুরের কাসেদের মুখে আঘাত করলেন তিনি এবং কোনো উত্তরই দিলেন না।

সময় বয়ে যাচ্ছিল। ক্রোধ সংবরণ করে তৈমুর আমিরেরই আত্মীয় দুইজন অফিসারকে আবার পাঠালেন হোসেনের কাছে এই বলে যে, ইলিয়াস একেবারে আত্মসমর্পণের মুখে—কাজেই অবিলম্বে এগিয়ে না গেলে চলবে না।

হোসেন তাদের গালি দিয়ে বললেন, 'কেন, আমি কি পালিয়ে গেছি? তবে কেন সে আমাকে এগিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করছে? লোকদের জড়ো করতে আমাকে সময় দিতে হবে।'

কাসেদরা উত্তরে বলল, 'খাউদসর্মা! দেখুন, দেখুন। তৈমুর এখন শত্রুপক্ষের রিজার্ভবাহিনী আক্রমণ করেছেন!'

হয় হোসেন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, কিংবা এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। যাহোক, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পূর্বেই তৈমুরকে প্রত্যাবর্তন করতে হল। মাঠেই তিনি শিবির স্থাপন করলেন এবং মনে তিক্ততা জমে ওঠায় হোসেনকে তিনি দেখতেও গেলেন না, কিংবা দূতদের কথা শুনতেও আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, হোসেনের সাথে আর কখনো তিনি কোনো যুদ্ধে যাবেন না।

পরদিন বৃষ্টি আরো বেশি হল। তেতো-বিরক্ত মনে তৈমুর কিন্তু একাকী ইলিয়াসের অনুসরণে এগিয়েই চললেন। এক স্বতন্ত্র মোঙ্গলবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে তৈমুর পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন। নিহতদের লাশভরতি জলাভূমি ও নদীর খাড়ির উপর দিয়ে ঝড়-মাথায় ঘোড়া ছুটিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে করতে নিজের ক্ষতির কথা স্মরণ করে তাঁর মন নিরানন্দে পূর্ণ হল। শীতার্ত ও তেতো-বিরক্ত হয়ে নীরবে তিনি ঘোড়া চালাচ্ছিলেন এবং দূরে তাঁকে অনুসরণ করে আসছিল বারলাস-গোত্রের লোকেরা। তাঁর চরম পরাজয় ঘটেছিল এবং এজন্য হোসেনক তিনি কখনো ক্ষমা করেন নাই।

হোসেন তাঁর কাছে ভারতে চলে যাওয়ার কয়েকটি পরিকল্পনাসহ লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মনের বর্তমান অবস্থায় তিনি তার কোনোটাই গ্রহণ করলেন না। তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন, 'তুমি ভারতের রাস্তাই ধরো, কিংবা সাত দোজখেই যাও, আমার তাতে কী?'

তিনি সমরখন্দে ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, নগর অবরোধের আয়োজন চলছে। জাটরা যখন সমরখন্দ নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে নতুন সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় তিনি নিজ উপত্যকায় চলে গেলেন।

কিন্তু গিয়ে দেখলেন, তাঁর আলজাই আর নাই—হঠাৎ অসুখ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর বাড়ির বাগানেই শাদা কাফনে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

১০
দুইজন আমির

মালেকা আলজাইয়ের মৃত্যুতে তৈমুর ও হোসেনের মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের যে-বন্ধন-সূত্রটুকু ছিল, তা ছিঁড়ে গেল। হোসেন তাঁর বোনের সাথে একাধিকবার আপত্তিকর ব্যবহার করেছিলেন। তৈমুর তা ভোলেন নাই। তিনি সবসময় এই দুঃখটুকু মনের গোপনে পোষণ করে এসেছেন। এখন স্ত্রীর মৃত্যুতে দুঃখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। পুত্র জাহাঙ্গিরকে নিয়ে তিনি গোষ্ঠীর লোকজনসহ দক্ষিণদিকে আবার নদীর ওপারে চলে গেলেন। গতবার গ্রীষ্মকালে সেখানেই তিনি আলজাইসহ কাটিয়েছিলেন।

হজরত জইনুদ্দিন তাঁকে লিখলেন, 'আমরা খোদার, এবং খোদার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের আছে একটা স্থান এবং আছে মৃত্যুর একটা নির্দিষ্ট সময়।'

কিন্তু তৈমুর অদৃষ্টবাদী ছিলেন না এবং এ-কারণে মোল্লা ও ইমামদের বাণী তাঁর মনে উৎসাহের আগুন জ্বালাতে পারত না। বাইরের শান্তভাব দেখে মনে হত, সত্যিকার বিশ্বাসীদের মনের প্রশান্তি বুঝি তিনি লাভ করেছেন—যে-বিশ্বাসীরা ভাগ্যের লিখনকেই নির্বিচারে মেনে নেয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি নানা চিন্তায় এবং পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নানা ইচ্ছার তাড়নায় জর্জরিত হচ্ছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে গিয়ে তিনি নামাজিদের সারিতে আসন গ্রহণ করতেন এবং গভীর মনোযোগের সাথে নামাজ আদায় করতেন। গভীর রাত্র পর্যন্ত তিনি দাবাখেলার বোর্ড পেতে থাকতেন এবং ছকের উপর হাতি ঘোড়া চালাতেন—কোনো-কোনো সময়ে একাকীই। খেলায় যখন তাঁর বিরোধীপক্ষ থাকত, তখন প্রায় সবসময় তিনিই জয়লাভ করতেন। তৈমুর ছিলেন চৌকস দাবা-খেলোয়াড়।

এ-খেলার কৌশল ভালো করে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিগুণসংখ্যক ছক ও ঘুঁটিযুক্ত এক নতুন বোর্ড তৈরি করিয়েছিলেন। এই বোর্ডের উপর তিনি নানাভাবে ঘুঁটি-চালনার পরীক্ষা চালাতেন। কাছে বসে তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে জাহাঙ্গির পিতার অখণ্ড মনোযোগ-আকর্ষক এইসব অদ্ভুত ও উজ্জ্বল খেলনাগুলোর দিকে তার কালো চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকত।

তৈমুর যখন এমনিভাবে আত্মনিমগ্ন, তেমনি সময়ে সমরখন্দ থেকে সংবাদ নিয়ে এলেন কয়েকজন মোল্লা। তাঁরা বললেন, 'বিশ্বাসীদের গলা থেকে অত্যাচারের জিঞ্জির খসে পড়েছে! মাননীয় মোহাদ্দেসগণ বোখারা থেকে সমরখন্দে এসে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করছেন—যাতে আমাদের আমির এবং দলপতিগণ সাহসের সাথে অত্যাচারের মোকাবিলা করতে পারেন। অভিশপ্ত শত্রুদল যদিও শহরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করতে পেরেছিল, কিন্তু সমরখন্দের লোকেরা তাদের দুই আমিরের পরিচালন ব্যতিরেকেই, শহরের দেয়াল ও রাস্তা রক্ষা করেছে এবং অভিশপ্ত শত্রুদের হটিয়ে দিয়েছে। তারপর খোদারই

কুদরতে জাটদের ঘোড়াগুলোর মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। চারভাগের তিনভাগ ঘোড়াই এর ফলে অক্কা পেয়েছে—এমনকি তাদের রাজদূতদের পর্যন্ত সওয়ারি ঘোড়ার অভাব হয়েছিল। ফলে তারা তূণীর ও মালামাল নিজেদের পিঠে এবং তরবারিগুলো কাঁধে চাপিয়ে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে দুনিয়ায় আর কখনো জাটসৈন্যদের এভাবে পায়ে হেঁটে চলে যেতে দেখা যায়নি নিশ্চয়ই।'

মোল্লাদের পরে তৈমুরের কর্মচারীরাও এল। তারাও মোল্লাদের কথার সত্যতা স্বীকার করে জানাল, সমরখন্দ শহরবাসীরা জাটরা অপসারিত না-হওয়া পর্যন্ত শহর রক্ষা করেছে। তারা আরো জানাল, ঘোড়ার মড়ক এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, তাতার অশ্বারোহীরাও শেষ পর্যন্ত তাদের অনুসরণে বিরত হয়।

এই আকস্মিক ভাগ্যোদয় হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে আনল। তিনি বিজয়গৌরবে সমরখন্দে প্রবেশ করলেন। এমন ভীষণ শত্রুদলকে পরাজিত করার গৌরবে আত্মহারা জনসাধারণ তাঁকে বিপুল আনন্দে বরণ করল। জানালায়, ছাদের প্রাচীরে গালিচা ঝুলল; মসজিদে মসজিদে হল জনতার ভিড়, প্রতি বাগান থেকে আমিরের সংবর্ধনায় ঝংকৃত হল সংগীতধ্বনি।

হোসেন এবং তৈমুরই হলেন এখন ভারত থেকে আরলসাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের প্রকৃত শাসকর্তা। নীতিগতভাবে তৈমুরও ছিলেন হোসেনের সাথে সমদাবিদার। তিনিই ছিলেন সৈন্যবাহিনীর সত্যিকার পরিচালক। তাঁর অনুগামীও ছিল সমসংখ্যকে। কিন্তু হোসেন ছিলেন রাজা-বানানেওয়ালের পৌত্র এবং এক শাসনকর্তার পুত্র। তিনি হাতের পুতুল খানকে নামেমাত্র প্রভু বলে স্বীকার করে নিলেন। বর্তমান খানের একমাত্র এই গুণ ছিল যে, তিনি একজন 'তুরা'—চেঙ্গিজ খানের বংশধর। যথাযোগ্য অনুষ্ঠানাদিসহকারে খানকে এনে প্রাসাদে অধিষ্ঠিত করা হল এবং হোসেন তাঁর পিতামহের মতো তাঁর অধীনে গ্রহণ করলেন দেশ-শাসনের ভার।

ঘটনাপ্রবাহে বাধ্য হয়ে তৈমুরকে হোসেনের চাইতে নিচু আসন গ্রহণ করতে হল। ট্যাক্স আদায়, বিচারের রায়দান এবং জমির বন্দোবস্ত করার ভার হোসেন নিজহস্তে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এক বিষয়ে তৈমুর জিদ করলেন—তাঁর উপত্যকা এবং সবুজ-নগরী থেকে আমুদরিয়া পর্যন্ত জেলার ভার তাঁর উপর থাকবে। তাঁর চূড়ান্ত কথা, 'আমুদরিয়া পর্যন্ত ভূভাগ আমার।'

তিনি মর্যাদার সাথে সবকিছু সহ্য করলেন। তাঁর উদারতার ফলে এই ব্যাপারে তিক্ততার সৃষ্টি হল না। হোসেন যখন বারলাস-গোষ্ঠীর লোকদের উপর মাথাপ্রতি বিপুল করভার চাপিয়ে দিলেন, তৈমুর প্রতিবাদ করে শুধু জানালেন, এরা গতযুদ্ধে তাদের প্রায় সব সম্পত্তি খুইয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেই সব প্রাপ্য হোসেনকে মিটিয়ে দিলেন—এমনকি, তা করতে গিয়ে মালেকা আলজাইয়ের মণিমুক্তা—তাঁর বিবাহে প্রাপ্ত কানের দুল ও মুক্তার হার পর্যন্ত তাঁকে দিতে হল। হোসেন এসব মণিমুক্তা চিনতে পারলেন বটে, কিন্তু কোনোরূপ মন্তব্য না করে সেসব গ্রহণ করলেন।

দুর্দান্ত ওমরাহগণ এবং অনুগৃহীত ব্যক্তিদের জন্যই দুই আমিরের মধ্যে চূড়ান্ত

বিবাদের সূত্রপাত হল। তাঁর হাতের পুতুল খানকে অধিষ্ঠিত করতে গিয়ে হোসেন জাটদের আক্রমণের একটা নতুন সুযোগের সৃষ্টি করলেন। ওমরাহদের প্রভাব খর্ব করতে গিয়ে তিনি নয়া শত্রুর জন্ম দিলেন। যখন তৈমুরের সাথে তাঁর সহযোগিতার সূত্র ছিন্ন হল—কার দোষে এমন হল, তা কেউ জানে না—তার পরিণাম হল গৃহযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র এবং জাটদের সামরিক হামলা। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে তাতারদের দেশ সশস্ত্র সৈন্যদের শিবির হয়ে রইল।

গৃহযুদ্ধের এই সংকটের দিনগুলোতে তৈমুরের মধ্যে অশরীরী সংগ্রামী আত্মা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিপুল কর্মশক্তি, নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর বিবেচনালেশহীনতা এবং তাঁর মুক্তহস্ত দান সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণের উপায় ছিল না। রাত্রে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে কাফেলার লোকেরা আমির তৈমুর সম্পর্কে গল্প করত, 'ঠিক, নাম তাঁর ঠিকই দেওয়া হয়েছিল। সত্যই তাঁর মধ্যে ছিল লোহা—একেবারে অনম্য লৌহ।' সম্ভবত বাজারে ও শিবিরে প্রচলিত এই কাহিনীটি ছিল তাঁর কার্সি দখল সম্পর্কে।

এই শহরটি ছিল বহুদিন আগে পরলোকগত খোরাসানের এক মুখোশধারী ভাববাদীর আস্তানা। এক ধার্মিক লোক কেরামতি দেখিয়ে বহু লোকের বিস্ময় ও ধর্মোৎসাহ জাগিয়েছিলেন। তাঁর কেরামতির বিষয়বস্তু ছিল এই, আকাশে যখন চাঁদের অভাব, প্রতি রাত্রে সেই সময়ে তিনি তাঁর কুয়ার তলায় চাঁদের উদয় দেখাতেন। এই কারণে সকলে তাঁর নাম দিয়েছিল—চাঁদসৃষ্টিকারী। ইতিহাস কিন্তু জানে তাঁকে বিপদসৃষ্টিকারী বলেই।

কার্সিতে তৈমুর একটি পাথরের কেল্লা তৈরি করেছিলেন। এতে তিনি কিছুটা গর্বও অনুভব করতেন। গৃহযুদ্ধের সময়ে সমস্ত কার্সি ছিল হোসেনের সৈন্যবাহিনীর দখলে। তৈমুরের লোকেরা তাদের শক্তির কথা জানত। কার্সি দখলকারী তিন-চার হাজার সৈন্যবাহিনীর পরিচালক আমির মুসাকেও তারা চিনত। এই আমির মুসাই বিকিজুকের মোকাবিলায় পাথুরে সেতু রক্ষা করেছিল। সে ছিল অভিজ্ঞ সৈনিক। মদ এবং উৎকৃষ্ট খানা তার বড় প্রিয় ছিল। অবশ্য সে ছিল কখনো কখনো অসতর্ক, কিন্তু বিপদের সময়ে সে ছিল নির্ভরযোগ্য।

তৈমুরের সাথে সে-সময়ে ছিল মাত্র দুইশত চল্লিশ জন সৈন্য। আর ছিল কয়েকজন অফিসার—সেতুর যুদ্ধে মুসার সহযোগী আমির জকু এবং মাউভা, আর বিপদের ঝুঁকি নিতে ওস্তাদ আমির দাউদ। কিন্তু যখন তাদের তিনি বললেন যে, তিনি কার্সি দখল করতে চান, তারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বলল, এখন খুবই গরম পড়েছে—এ-সময়ে এমন অভিযানের কল্পনাই করা যায় না। তা ছাড়া, তাদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগে করতে হবে।

তৈমুর গালি দিয়ে উঠলেন, 'অল্পবুদ্ধি মানবের দল! তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব বলে আমি কি প্রতিশ্রুতি দিইনি?'

আমিরদের একজন উত্তর দিল, 'না, তা সত্য। কিন্তু তারা তো দেওয়ালের ভিতরে নাই!'

তৈমুর হেসে বললেন, 'কার্সির চারিদিকেই দেয়াল রয়েছে মনে করো, যদি কার্সি আমাদের হয়!'

তারা ভাবতে লাগল। কিন্তু ভেবেও কোনো কূল-কিনারা না-পেয়ে দাউদ পর্যন্ত নীরব রইল, জকু মাথা নাড়ল মাত্র। বলল, 'হুজুর, আমাদের আরো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। হঠকারিতার একটা সময় আছে, আবার সাবধানতা ও চিন্তাভাবনারও একটা সময় আছে। মুসা বহুদিন যুদ্ধের নিশানের তলে কাটিয়েছে। কাজেই উটে-চড়া স্ত্রীলোকের মতো তাকে কাবু করা যাবে না।'

গম্ভীরকণ্ঠে তৈমুর বললেন, 'তা হলে স্ত্রীলোকের কাছেই তোমরা চলে যাও এবং তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আমি তাদেরই মাত্র সঙ্গে নিতে চাই, যারা শত্রুদলের বিরুদ্ধে সেতু রক্ষা করেছিল। তুমি মোয়াভা এবং তুমি এল্‌চি—আর কেউ আছে?'

অনেকেই জানাল, তারাও তৈমুরের সাথে নদী পার হয়ে জাটদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

'তা হলে যাও যেখানে তোমাদের পরিবার-পরিজন রয়েছে। না, বরং বাজারে যাও, এবং সেখানে গিয়ে অতীতের গৌরব-কীর্তন করো। আমি অন্য সবার সঙ্গে কার্সির দিকেই ঘোড়া ছুটাব।'

তারা জানত, তারা না-গেলেও তৈমুর তাঁর কথামতো কাজ করবেনই। সকলে একত্রে পরামর্শ করার জন্য চলে গেল। একবার কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তৈমুরকে তা থেকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। একবার কোনো আদেশ দিলে তার কোনো পরিবর্তন কখনো হত না। তাঁর উদ্দেশ্যের এই অনন্যতার জন্য কখনো কখনো জীবন নষ্ট হয়েছে, দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে—যা সহজেই পরিহার করা সম্ভব হত। কিন্তু তা তৈমুরের উদ্দেশ্যকে কতকটা অদৃষ্টের অমোঘতা দান করেছিল।

দলের প্রধানরা যখন তাঁর সাথে যোগ দেবার জন্য ফিরে এল, জকু এক হাতে কোরআন অন্য হাতে তরবারি নিয়ে শপথ করল, 'হুজুর, আপনাকে অনুসরণ করতে আমরা এই কোরআন-হাতে শপথ করছি। আর এই আমার তরবারি—যদি কখনো আপনাকে অমান্য করি, এর আঘাতে আমাদের জীবন নেবেন।'

আবার তারা একসঙ্গে বসে গেল এবং কী করে মুসাকে বার করে নিয়ে আসা যায়, তার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল।

এদের আলোচনা কিছুক্ষণ শুনে তৈমুর হেসে বললেন, 'তোমরা নিতান্তই নির্বোধ। তিনহাজার সৈন্যসহ মুসাকে যদি তোমরা বার করে আনতে পারো, তা হলেও লাভ বিশেষ কী হবে? তোমরা তো মাত্র একশত জন এবং আরো মাত্র অতিরিক্ত একশত চল্লিশ জন।'

সঙ্গীদের নীরব দেখে দাউদ বলল, 'এর চাইতে ভালো হবে, যদি রাত্রিকালে গোপনে কার্সিতে প্রবেশ করে ঘুমন্ত মুসাকে তাক লাগিয়ে দেয়া যায়। এভাবেই তাকে আমরা বন্দি করতে পারি।'

বিরক্তির স্বরে তৈমুর বললেন, 'হাঁ, ভালো হবে বইকি! কিন্তু তারপর তোমরা বোধহয় তিনহাজার ঘুমন্ত সৈন্যের বিছানায় যাবে—কেমন?'

দাউদ আত্মরক্ষাকল্পে বলল, 'সবই খোদার হাত। মুসা ভালো করেই জানে যে, আমরা এখানে রয়েছি। কাজেই সে কখনো বেরিয়ে আসবে না যতক্ষণ আমরা এখানে আছি। তার মনিব তাকে কার্সি রক্ষা করতে আদেশ দিয়েছেন—মুসা সে-আদেশের ব্যতিক্রম কিছু করবে না।'

তৈমুর চিন্তা করতে করতে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আমি যদি তাকে নদীর ধারে মাঠে ডেকে পাঠাই, আর মদে তার তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করি—সে যাবে কি?'

দাউদ হাসল। কারণ তখন ভীষণ গরম পড়েছে। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো ময়দানের যেখানে-সেখানে তাঁবুর আস্তানা গেড়েছে বটে, তবু ঘামের জন্য গায়ে কাপড় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এর তুলনায় কার্সির দেওয়ালের ভেতরটা তো নরকের অগ্নিকুণ্ডবিশেষ। কার্সি বস্তুত শীতাবাস—গ্রীষ্মাবাস মোটেই নয়। মদ ও খানার প্রতি মুসার অনুরাগের কথাও সবারই জানা আছে। এসব ভেবে দাউদ বলল, 'খোদা না করুন, সে যেতে চাইবে বইকি! কিন্তু সে যাবে না।'

তৈমুর একথার জবাবে বললেন, 'তবে আর তাকে ডেকে পাঠাব না।'

তিনি তাঁর সঙ্গীদের আর কিছু বললেন না। মনে হল, কার্সি পুনর্দখল সম্পর্কে তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন করেছেন। কারণ তিনি দক্ষিণে হিরাতের মালিকের কাছে নানা উপহারসহ বিশিষ্ট দূত পাঠালেন। লোকজনসহ তিনি খোরাসানের রাস্তা বেয়ে হিরাত-অভিমুখে চলতে লাগলেন। বালির পাহাড়ের প্রান্ত-বরাবর পর্বতের হলদে কাদার ঢালুপথের সমতলে এসে, অসম্ভব গরম সত্ত্বেও, ইসহাকের কূপের কাছে তিনি তাঁবু খাটালেন।

তাঁর বিশিষ্ট দূত ফিরে না-আসা পর্যন্ত দীর্ঘ একমাস ধরে তিনি কূপের ধারে উত্তরগামী কাফেলাদের থামিয়ে রেখে দিলেন। তিনি যেরূপ আশা করেছিলেন, তাঁর দূত মালিকের নিকট থেকে প্রচুর উপহারসহ ফিরে এল। সঙ্গে হিরাত যাবার জন্য মালিকের একখানা আমন্ত্রণপত্রও ছিল। এই সময়ের মধ্যে কূপের ধারে প্রচুর লোকের আনাগোনা হল এবং দূতের আনা খবরটি সবারই জানা হয়ে গেল।

পরদিনই তৈমুর কাফেলাগুলোকে মুক্তি দিলেন এবং এমন ভাব দেখালেন যে, তিনিও হিরাতযাত্রার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বণিকরা রাস্তায় অন্যান্য লোকদের হাত থেকে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য তৈমুরের কাছে একজন পথপ্রদর্শক চাইলেন। কিন্তু তৈমুর বুঝিয়ে দিলেন যে, কার্সির রাস্তায় তাঁর কোনো অনুগামী নাই। তারপর তিনি তাঁর দুশো চল্লিশ জন অনুচরসহ দক্ষিণদিকে ঘোড়া ছোটালেন, আর কাফেলার লোকেরা দক্ষিণ-উত্তর দিকে আমুদরিয়া পেরিয়ে কার্সি যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেল।

কার্সিতে মুসা তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, তৈমুর নিশ্চিতভাবে হিরাতের দিকে চলে গেছেন—নিশ্চয়ই মালিকের কাছে আশ্রয়লাভের আশায়ই। আর দেরি না করে মুসা তৈমুর কর্তৃক উল্লিখিত সুন্দর তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে চলে গেল—যেখানে, বিবরণ-লিখিয়েদের ভাষায়, 'ভোজের জন্য কার্পেট বিছানো হল, মদের বোতলের ছিপি খোলা হল।' কিন্তু কার্সি দুর্গরক্ষাকল্পে সে মাত্র কয়েকশত লোকসহ তার ছেলেকে রেখে এসেছিল।

তৈমুর তাঁর পরবর্তী তাঁবুতে সপ্তাহখানেকের মতো অপেক্ষা করলেন—যাতে ইতোমধ্যে কাফেলা গিয়ে কার্সিতে পৌঁছতে পারে। তারপর দ্রুতগতিতে চলে আবার তিনি আমুদরিয়ার পারে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে না-থেমে নদীর স্রোতে ঘোড়াসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে গিয়ে উঠলেন। তাঁর চল্লিশজন অনুচরও তাঁর অনুসরণ করে নদী পার হয়ে গেল।

বাকি লোকদের জন্য নৌকা পাঠিয়ে দেয়া হল। তারা এলে আগের চল্লিশজন তাদের ঠাট্টা করল। রাস্তা থেকে দেখা না যায় এমন স্থানে তারা সে-রাত কাটাল। ভোরে কার্সিযাত্রী লোকদের আটকিয়ে রাখার জন্য কয়েকজন অনুচরকে রাস্তায় পাঠিয়ে দেয়া হল। সূর্যাস্তের পরে আবার সকলে ঘোড়ায় চড়ল এবং খোলা মাঠ পেরিয়ে কার্সির উপকণ্ঠে এক কুয়ার ধারে এসে পৌঁছল। ঝাউগাছের ঝোপে পরবর্তী সমস্ত দিনটা তারা লুকিয়ে রইল। মুসার যেসব লোক এই কুয়ার ধারে হঠাৎ এসে পড়েছিল, তাদের বন্দি করা হল। তৈমুর নিজের লোক ও বন্দিদিগকে রশি দিয়ে সিঁড়ি তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে রশির সিঁড়িগুলো নিয়ে আবার তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। বন্দিগণকে রক্ষীদের হেফাজতে সেখানেই ছেড়ে দেওয়া হল।

জকু বলল, 'আমরা খুবই দ্রুত এসেছি এবং এজন্যে সকলে আমাদের সাথে আসতে পারেনি। আমাদের এই অভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে কোনোরূপ ঝুঁকি না নিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

তৈমুর সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'ধীরে ধীরে আমাদের লোকদের নিয়ে এসো। আমি আগেই চলে যাচ্ছি—দেয়ালের কোন্ স্থানে দড়ির সিঁড়ি ঝুলাতে হবে, সেটা ঠিক করতে হবে।'

মাত্র দুজন লোকসহ তিনি ঘোড়া ছোটালেন। গাছের সারির ভিতর দিয়ে প্রাসাদের চূড়া দৃষ্টিগোচর হলে তাঁরা ঘোড়া থেকে নামলেন, ঘোড়াগুলোর সাথে একজনকে রেখে আবদুল্লাহসহ তৈমুর এগিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ কিছুতেই তৈমুরকে একাকী যেতে দিল না। ক্রমে তাঁরা দুর্গ-পরিখার নিকটে এসে পড়লেন। কিছুক্ষণ তাঁরা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতর থেকে কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না।

পরিখার তীর ধরে এগিয়ে তাঁরা এমন স্থানে এলেন যেখানে হাঁটু-পরিমাণ পানির নিচে দিয়ে দুর্গের পাথরনির্মিত পয়ঃপ্রণালী চলে গেছে। তৈমুর এই পাথরের উপর উঠলেন। পিছনে পিছনে আবদুল্লাহ। সেখান থেকে তৈমুর দুর্গের দিকের দেয়ালের নিচেকার মাটির পড়তি অংশের কোণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লেন।

রাস্তা হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি সেখান থেকে এগিয়ে চললেন, অবশেষে কাঠের দরজা হাতে ঠেকল। কোন্ দানবীয় শক্তি তাঁকে এ-কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা জানা যায় নাই। যাহোক, দরজা খুঁজে পেয়ে তিনি দেখলেন, ভিতর থেকে ওটা দেয়াল হয়ে গেছে। দরজায় তিনি আঘাত করলেন। কিন্তু তার কোনো জওয়াব পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধান করতে করতে এমন এক জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে দেয়ালের মাথায় একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। সেখান দিয়েই প্রবেশ করা সুবিধাজনক হবে মনে করে স্থানটা তিনি আবদুল্লাহকে দেখিয়ে রাখলেন। আবদুল্লাহ জায়গাটা চিনে রাখতে

পারবে, সে-সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তিনি নিজের ঘোড়ার নিকট ফিরে এলেন এবং সেখান থেকে দেয়ালের ওপাশে অপেক্ষমাণ নিজের লোকদের কাছে চলে গেলেন। তেতাল্লিশ জনকে ঘোড়াগুলোর হেফাজত করতে বলে বাকি প্রায় একশত জনকে হামলার জন্য তৈরি থাকতে আদেশ দিলেন।

তৈমুর আবার তাদের ছেড়ে সেই ফাটলের সন্ধানে গেলেন, আর আবদুল্লাহ ছোট ছোট দলে ভাগ করে সকলকে নর্দমা পার করতে লাগল। তৈমুরকে দেয়ালের উপরে বসে থাকতে দেখা গেল। এরপর কী করতে হবে, তৈমুর সকলকে তার নির্দেশ দিলেন।

দেয়ালের ভিতরে পাহারারত সান্ত্রিদের ঠিক করতে কয়েকজনকে পাঠানো হল। তারা কিন্তু গিয়ে দেখল, সান্ত্রিরা সবাই নিদ্রিত। তখন ভোর হয়ে এসেছিল। দুর্গের ভিতর সামান্য সংঘর্ষ কিছু হল বটে, কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৈমুর নিজের সঙ্গীদের একত্র করে দুর্গের চূড়ায় উঠে শিঙা বাজিয়ে দিলেন।

কার্সির সব লোক তাড়াতাড়ি লেপ ছেড়ে নিজ নিজ গৃহশীর্ষে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে এই সঙ্কেতধ্বনির মানে বুঝতে চেষ্টা করল। তৈমুরের শক্তির পরিমাপ করতে না-পেরে এবং বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে মুসার অধিকাংশ অফিসারই বশ্যতা স্বীকার করতে এগিয়ে গেল। তৈমুর এদেরকে তাঁর দলে যোগ দিতে বললে তারা সম্মতি জানাল। মুসার ছেলেই কেবল নিজের ঘরে থেকে কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু যখন তার ঘরে আগুন ছুড়ে দেয়া হল, নিজের তলোয়ার গলায় বেঁধে তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করল।

তৈমুর তার সাহসের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কার্সিতেই তাকে রাখলেন। মুসার পরিবারের বাকি সবাইকে তিনি মুসার কাছে সেই তৃণভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন।

জকু পরে বলেছিল, 'আমাদের মনিবের সৌভাগ্যের জন্যই এই নগরী আমাদের হস্তগত হয়েছিল। এবং এজন্য তাঁর তাঁবেদার হিসেবে আমাদেরও গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে।'

পরে হোসেনের হাজার হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়েও যে তৈমুর এই কার্সির দুর্গ রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তাতে কেউই খুব বিস্ময় অনুভব করেনি। তাদের ধারণা ছিল, জয় এবং পরাজয় দুই-ই খোদার দান। মাননীয় জইনুদ্দিন আর তাঁর মোল্লা-সম্প্রদায় এ-সম্পর্কে তাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

১১
দুনিয়ার ছাদের উপরে

বিবাদ-বিসংবাদের এই অনিশ্চিত দিনগুলোতে সকলের চোখ তৈমুরের দিকেই পড়েছে। তাঁর দুঃসাহস তাদেরকে করেছে প্রশংসামুখর। তাঁর বিজয়াভিযান হয়েছে তাদের খোশগল্পের বিষয়বস্তু। এমনকি, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা তাঁর বিরোধিতা করেছে, তাদের কাছেও তৈমুরের গল্প ছিল মনোরম। তাদের অস্থির কল্পনায় তৈমুরের সাহসিকতা ছিল একটি নিরেট খাঁটি বস্তু। তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোক

হোসেনের প্রতি বিরক্ত হয়ে তৈমুরের পতাকাতলে এসে ভিড়ে পড়ল। মোঙ্গলি বোগা নামে মোঙ্গল-গোত্রের একজন প্রাচীন যাযাবর দলপতি একরূপ বিনা-আহ্বানেই তৈমুরের দরবারে গিয়ে তাঁর অনুগত আমিরদের দলে আসন গ্রহণ করল। এই মোঙ্গলি ছিল তৈমুরের একজন দুর্দান্ত শত্রু। একবার সে, ছয় হাজার লোক পেলে, তৈমুরকে ধরিয়ে দেয়ারও প্রস্তাব করেছিল। সে বলল, 'এখন তৈমুরের নিমক একবার যখন খেয়েছি, আর আমি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কারুর কাছে যেতে পারি না।'

তৈমুরের বেপরোয়া নেতৃত্ব এবং তাঁর প্রতি এইসব লোকের আনুগত্যের উপরই স্থাপিত হল এক বিরাট সাম্রাজ্য—ইতিহাসে যা তৈমুর লঙের সাম্রাজ্য বলে পরিচিত লাভ করেছে।

পরবর্তীকালে এই মোঙ্গলিই তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে তৈমুরের পক্ষে এক যুদ্ধজয় করেছিল। তাতারদের এক বিচ্ছিন্ন দল 'কালো ভেড়া' তুর্কম্যানদের দলপতি কারা ইউসুফের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তৈমুরবাহিনীর উপর চারদিক থেকে এমন চাপ পড়ল যে, তাদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠল। এমন সময়ে মোঙ্গলি দল থেকে খসে পড়ে একটা জিনিসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। জিনিস সে পেলও। জিনিসটা আর কিছু নয়—একটা লম্বা-দাড়িওয়ালা ন্যাড়ামাথা তুর্কম্যানের কর্তিত মস্তক।

মোঙ্গলি এই মাথাটা তার বর্শার আগায় চড়িয়ে তাতারবাহিনীর দিকে ঠেলে দিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কারা ইউসুফ নিহত হয়েছে!' তাতার দল তাদের সাহস ফিরে পেল, আর শত্রুদের যারা এ-চিৎকার শুনতে পেল, তারা হয়ে গেল একেবারে মনমরা। অল্পসময়ের মধ্যেই দুশমনরা পরাজয় স্বীকার করল এবং জীবিত ও ক্রুদ্ধ কারা ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে দিল চম্পট।

একাধিকবার এই বুদ্ধিমান ও একগুঁয়ে তাতার আমিরগণ তৈমুরকে চরম বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে। নির্ভীক রাজদূত এল্‌চি বাহাদুর সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি মুরাটের মতো এল্‌চি বাহাদুরেরও ছিল পালকযুক্ত শিরস্ত্রাণ ও সোনালি রঙের বুটজুতা পরার শখ। চেহারার জৌলুস বা দম্ভের জন্যই সম্ভবত অন্যদেশে রাজদূত হয়ে যেতে সে পছন্দ করত। কিন্তু যুদ্ধেও পালক, বুটজুতা প্রভৃতি ব্যবহার করত।

উপরোল্লিখিত বিশেষ ঘটনাটির সময়ে তৈমুর জাটদের এক হামলা প্রতিরোধ করে ফিরে এসে আমুদরিয়ার উৎসস্থল উঁচু পার্বত্যভূমিতে বদখ্‌শানের সরদারদের সেনাবাহিনীকে হামলা করার জন্য খুঁজে ফিরছিলেন। পার্বত্য সরদাররা পাহাড়ের বরফমণ্ডিত গভীর অংশে বৃক্ষহীন নির্জনতায় পালিয়েছিলেন। তেমন স্থানে দুই দলে লুকোচুরি খেলা চলল কিছুদিন ধরে। একজন কাসেদ এসে তৈমুরকে খবর দিল, তার অগ্রবাহিনীর লোকেরা পারস্পরিক সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে এবং বদখ্‌শানিদের দ্বারা ধৃত হয়েছে। এই ধৃত সৈন্যদের নিয়ে বদখ্‌শানিরা এখন অন্য গিরিসঙ্কটের পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

এ-ব্যাপারে তাতারদের কঠোর নিয়ম ছিল এই যে, তাদের নেতারা কখনো অনুগামীদের পরিত্যাগ করে যাবে না। কিন্তু তৈমুরের সঙ্গী-যোদ্ধারা তাদের এই

পরিত্যক্ত বাহিনীকে সাহায্য করবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পেল না। এদের এসব ক্লান্তিকর ও নৈরাজ্যজনক আচরণে তৈমুর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি তাদের সবাইকে ডেকে আদেশ দিলেন, কাসেদকে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে হবে এবং বদখ্‌শানিরা যে-গিরিসঙ্কটের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তা খুঁজে বার করতে হবে।

তৈমুরের লোকেরা ধীরে ধীরে বরফমণ্ডিত পথ দিয়ে চলতে লাগল। প্রায়ই সওয়ারসহ ঘোড়াগুলো পিছল খেয়ে লেজে-মাথায় এক হয়ে গভীর খাদে পড়ে অক্কা পেতে লাগল। তৈমুর তবু এগিয়ে যেতে লাগলেন। যখন তিনি গিরিসঙ্কটে গিয়ে পৌঁছলেন তাঁর সাথে আছে মাত্র তখন তেরোজন সৈন্য। গিরিসঙ্কটের চূড়ায় যাতে বদখ্‌শানিরা আগে পৌঁছতে না পারে, সেজন্য তাঁরা দ্রুত অগ্রসর হলেন। এল্‌চি বাহাদুরসহ তাঁরা তেরোজন চূড়ায় আরোহণ করে নির্দিষ্ট স্থান থেকে অগ্রসরমাণ বদখ্‌শানিদের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রথম শত্রুদলে ছিল মাত্র পঞ্চাশজন যোদ্ধা; কিন্তু গিরিসঙ্কটের নিম্নভাগে দেখা গেল আরো দুশোজন রয়েছে। এল্‌চি বাহাদুর এই সময়ে তার এক নিজস্ব চাল চালল। একাকী সে গিরিচূড়া থেকে কিছুটা নেমে গিয়ে দুশো লোকের মোকাবিলা করল। চকমকে কটিবন্ধে বাঁধা তার বাদামি রঙের দেহাবরণ এবং শূকরের চামড়ার শিরস্ত্রাণ দেখে তারা থমকে দাঁড়াল। রক্ত-লাল ঘোড়ায় চড়ে তার আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে ভড়কে গেল। তার তূণীরে ছিল তীর এবং স্বর্ণমণ্ডিত আইভরির খাপে ছিল তলোয়ার। এল্‌চি তাদের ডেকে বলল, 'ওহে জারজপুত্রের দল! ঘোড়া থামিয়ে উপরে চেয়ে দ্যাখো কে এখানে। আমির তৈমুর আগেই সেখানে এসে গেছেন।'

এই বলে সে নিরুদ্বেগে শত্রুদলের ভিতরে ঢুকে গেল—যেন যুদ্ধের কথা তার মনের কোণেও স্থান পায় নাই! উপরে অঙ্গুলিনির্দেশ করে সে তীরের ঝাঁকের মধ্যে তৈমুরের শিরস্ত্রাণ দেখাল। এল্‌চি গম্ভীরভাবে তাদের পরামর্শ দিল, 'ভেবে দ্যাখো, তোমরা যদি মারা যাও, তা হলে তোমাদের পরিবারের লোকেরা তোমাদের মূর্খ বলবে। এখন যখন তৈমুরের দয়ার উপরই তোমাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে, তখন মারা গিয়ে লাভ কী! কাজেই তাঁর সাথে শান্তিস্থাপনই ভালো নয় কি? তার চাইতেও ভালো হয়, যদি তাঁর যেসব লোক তোমরা বন্দি করে এনেছ, তাদের ফিরিয়ে দাও। তাতে তিনি তোমাদের উপর খুব খুশি হবেন।'

এল্‌চি এইভাবে তাদের তোষামোদ করল। শত্রুদল হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গীহীন হয়ে যাঁর লোক তাদের মোকাবিলা করতে পারে, এই তৈমুরের তাতারিরা সংখ্যায় অনেক বেশি বলেই তাদের স্থির ধারণা হল। তারা নতিস্বীকার করার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। এল্‌চিও নামল—এবং বিবরণে এ-ও পাওয়া যায় যে, সে তাদের পিঠ চাপড়িয়েও দিল। এরপর তীরবৃষ্টি বন্ধ হল। বন্দিদের এল্‌চির সামনে আনা হল এবং সে তাদের একনজর দেখেও নিল।

এল্‌চি বদখ্‌শানিদের তিরস্কার করল, 'তোমরা কি এইসব লোকদের নিতান্ত গোরু-ছাগলের মতোই তলোয়ারহীন অবস্থায় তৈমুরের কাছে পাঠাবে? যখন বন্দি করো, তখন নিশ্চয়ই এদের হাতে তলোয়ার ছিল।'

পাহাড়িরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারা পাহাড়ের চূড়ায় অপেক্ষমাণ

ভীষণদর্শন তৈমুরকে যেন দেখতে পাচ্ছিল। এবং বুঝতে পারছিল, তাদের নিরাপত্তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা এল্‌চির কথামতোই তাদের কাজ করতে হল—লুণ্ঠিত অস্ত্রাদি সব তারা ফিরিয়ে দিল এবং এল্‌চির ছয়শত মুক্ত তাতারকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে চলল। তৈমুরকে জানাল, বদখ্‌শানিরা তাঁর ঘোড়ার রেকাবে চুমু দেওয়ার জন্য নিচে অপেক্ষা করছে।

তৈমুর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। আগের চাইতে বেশি ভীত বদখ্‌শানিরা তাদের ধনুকের খাপে মাথা রেখে শান্তির শপথ গ্রহণ করল। যে-পর্যন্ত-না ধীরগতি তাতাররা সেখানে এসে পৌঁছল, ততক্ষণই তৈমুর ও এল্‌চি তাদের নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখল।

রুচিবাগীশ রাজদূত (এল্‌চি) এরপর বলল, 'এটা ঠিক বসবার জায়গা নয়। বরফ ছাড়া এখানে কিছু নাই—না আছে খাবার কিছু, না আছে শোবার মতো স্থান।'

বদখ্‌শানি দলপতিরা তখন প্রস্তাব করল, এবার গ্রামের দিকে নেমে যাওয়া যাক। এর পরে দুনিয়ার ছাদ থেকে সৈন্যবাহিনী নেমে এল। সেখানে তাদের ভোজের ব্যবস্থা হল।

এল্‌চির এই ব্যাপারটা তার শুধুমাত্র আস্ফালন ছাড়া আর কিছু নয়। এ-ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দেয় মার্শাল মুরাট কর্তৃক ভিয়েনার পুলের উপর অবস্থিত অস্ট্রিয়ান বাহিনীর উদ্দেশে তাঁর রুমাল-আন্দোলনের কথা—যখন তিনি পুলের উপর অস্ট্রিয়ানদের কামান দখল করেন এবং তাঁর ফরাসিবাহিনী পুলের নিচে পুঁতে-রাখা বিস্ফোরক বোমাগুলো অপসারণ করে। এক বছর বা তারও কিছু পরে এল্‌চি বাহাদুর তার ঘোড়াসহ এক নদী সাঁতরিয়ে পার হওয়ার চেষ্টায় মারা যায়।

এইসব তাতারি আমিরগণ জানতেন, তৈমুরের নেতৃত্বাধীন তাঁদের জীবনের মেয়াদ খুব বেশিদিনের নয়। কিন্তু তৈমুরও সকলের সাথে সবরকম বিপদের ঝুঁকিই নিতেন এবং তাঁর দেহেও আঘাতের সংখ্যা মোটেই কম ছিল না। তাঁর সাথে তাদের দিনগুলো উত্তেজনার ভিতর দিয়েই কাটত এবং তারা গান গাইতে গাইতেই বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

তিনি একবার তাদের বলেছিলেন, 'যোদ্ধাদেরও নাচবার সময় আছে। যুদ্ধক্ষেত্রই হচ্ছে তাদের নাচঘর, যুদ্ধের হাঁক এবং তরবারির ঝনঝনাই হচ্ছে তাদের সংগীত, আর শত্রুশোণিতপ্রবাহই হচ্ছে মদ্য।'

এইভাবে ছয় বছর যখন শেষ হয়ে এল, দেখা গেল, অধিকাংশ তাতারি আমিরই তৈমুরের বশ্যতা স্বীকার করেছেন। প্রথমদিকে তাঁকে 'কাজাক' বলা হত, মানে—ভ্রাম্যমাণ যোদ্ধা, যিনি চল্লিশ ঘণ্টাও এক জায়গায় থাকেন না। এ-শব্দটা এখনো পর্যন্ত কসাকদের মধ্যে বেঁচে আছে। যাক, এখন তৈমুর এক বিরাট বাহিনীর প্রভু। যখন মুসার বাহিনী, জালাইর দল তাঁর পতাকাতলে এসে ভিড়ল, তখন আর বাকি কিছু বড় রইল না। জালাইররা আধা-মোঙ্গল। তারা এক বিপুল এবং দুর্দান্ত বাহিনী সংগ্রহ করতে পারত—যেমন প্রায় একযুগ আগে ইংলন্ড এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করে ক্রেসি ও পয়টারের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। তৈমুরের জ্যেষ্ঠপুত্রের মা ছিলেন এই জালাইর-বংশের মেয়ে।

তৈমুরের মতো যোদ্ধার পরিচালনাধীনে এই বিরাট বাহিনীর মোকাবিলায় হোসেনের শক্তি বসন্তকালীন বৃষ্টিতে বরফের মতো মিলিয়ে গেল। আমুদরিয়ার দক্ষিণদিকে তিনি বিতাড়িত হলেন। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে অবশেষে বল্‌খে এসে তিনি একবোরে কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গেই নগরীর পতন হল। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুক্কায়িত হোসেন শেষবারের মতো তৈমুরের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে, তিনি দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য মক্কায় চলে যাবেন।

এর পরিণতি কী হল, সে-সম্পর্কে ইতিহাসে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, হোসেন যদি আত্মসমর্পণ করতে তাঁর কাছে আসতেন, তা হলে তাঁর জীবনরক্ষার প্রতিশ্রুতি তৈমুর দিয়েছিলেন। কিন্তু হোসেন শেষ পর্যন্ত তাঁর মত পরিবর্তন করে ছদ্মবেশে এক মসজিদের চূড়ায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে হয় তিনি মসজিদের মোয়াজ্জিনের নজরে পড়ে যান, কিংবা এক সৈনিকের। সে নাকি তার হারানো ঘোড়া খুঁজতে মসজিদে ঢুকেছিল!

কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সে-সম্পর্কেও সঠিক কিছু জানা যায় না। মনে হয়, তাঁকে নিয়ে কী করা হবে তা নির্ধারণের জন্য নেতৃস্থানীয়দের এক জমায়েত বসে এবং তৈমুর সে-বৈঠক ছেড়ে চলে যান এই বলে, 'আমির হোসেন ও আমি বন্ধুতার শপথবদ্ধ; কাজেই আমার হাত থেকে তিনি নিরাপদ।' দ্বিতীয় এক বিবরণে দেখা যায়, মোয়াভা ও অন্য একজন অফিসার তৈমুরকে কিছু না জানিয়েই সে-জমায়েত থেকে আলগোছে সরে পড়ে এবং মুক্তি দেবার ভান করে হোসেনকে হত্যা করে।

আসলে সত্যকথা হচ্ছে এই যে, তৈমুর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুতে কোনোরূপ বাধা দেন নাই। ইতিহাসে বলা হয়েছে, 'হোসেনের স্থান নির্দিষ্ট ও কাল পূর্ণ হয়েছিল এবং কোনো মানুষই তার ভাগ্যকে এড়িয়ে যেতে পারে না।'

১২
জইনুদ্দিনের এলান

তৈমুর একটা উদ্দেশ্য নিয়েই বল্‌খে দেরি করেছিলেন। রৌদ্রতপ্ত এই উপত্যকায় আখ জন্মে নদীর শুকনো তলদেশের পাশে পাশে, সওদাগরের কাফেলা সূর্যের দেশ থেকে পরম ধীরগতিতে ভারতের দিকে চলে যায়, আর তাদের পায়ের তলা থেকে যেন এক-একটা পাহাড় নেমে যায়। এই স্থানটা ছিল সহস্র স্মৃতিবিজড়িত এবং ওর বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছিল শতাব্দীর ধূলিকণা।

এখানে কোথাও কাদা ও নরম পাথরকুচির নিচে একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সংগুপ্ত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক কালে সেটা অগ্নিউপাসকদের দ্বারা নির্মিত হয়। সেখানে পায়ের নিচে ছড়ানো রয়েছে একটা বুদ্ধমূর্তির বিভিন্ন অংশ। এ-মূর্তি এককালে প্রতিষ্ঠিত ছিল গৈরিকবসন-পরিহিত তীর্থযাত্রীদের এক মিলনস্থলে। লোকেরা এ-স্থানকে নগররানি বলত; আলেকজান্ডার একে ব্যাক্‌ট্রিয়া বলে জেনেছিলেন এবং এখন একে বলে

'কুবাতুল ইসলাম'—অন্যতম ইসলামি কেন্দ্র। চেঙ্গিজ খানের বাহিনী একে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এর চারদিকে আবার নতুন নতুন মসজিদ ও মন্দির উঠল—হল সমাধিক্ষেত্রে পরিণত। পরে তৈমুর এই নগরীকে পুনর্নির্মাণ করেন।

হোসেন যেখানে কাফন পরে দৃষ্টিহীন চোখে মক্কার দিকে মুখ করে পড়েছিলেন, তৈমুর সেই জায়গায় প্রতীক্ষারত ছিলেন। হোসেনের মৃত্যু হওয়ায় একজন নতুন আমির মনোনীত করার ভার পড়ল তাতার দলপতিদের উপর। এই ছিল চেঙ্গিজ খানের আইন। আইনে একথাও ছিল যে, আমিরকে মোঙ্গল খাকানদের বংশধর—চেঙ্গিজ খানের বংশের 'তুরা' হতে হবে।

এই 'কুরুলতাইসে'—মানে, গোষ্ঠীপতিদের এই জমায়েতে, ভারতের গিরিসঙ্কট থেকে উত্তরদিকের ভ্রাম্যমাণদের অকর্ষিত সমতলভূমি পর্যন্ত সব জায়গায় ক্ষুদ্র দলপতিরা এসে যোগ দিল। আর এলেন জমকালো পাগড়িধারী ব্যক্তিরা—ইরানি আমিরগণ, বোখারার ওলামা প্রতিনিধিগণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতারা, গির্জার পাদরি এবং তর্কচূড়ামণির দল। তাঁদের সঙ্গে এলেন বিশ্বাসীদের নেতৃস্থানীয় ইমামগণ এবং এঁদের মধ্যে ছিলেন শাদা-পোশাক-পরিহিত বিরাট পাগড়িধারী জইনুদ্দিন। বার্ধক্যে তাঁর চোখ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন মাননীয় দরবেশ খাজা বাহাউদ্দিন—মা-অরা-উন্নাহারে সাধুব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সম্মানিত। সৈন্যবাহিনী এবং ধর্মযাজকগণ তৈমুরের সাথে আলোচনা করতে এলে তিনি পুত্র জাহাঙ্গিরসহ দূরে সরে রইলেন।

কোনো-কোনো আমির তৈমুরের নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতেও সাহসী হয়েছিল। বদখ্শান গোত্রের একজন মুখপাত্র বললেন, 'ভ্রাতৃসুলভ মৈত্রীভাবে সব জমি ভাগ করে ফেলা যাক; প্রত্যেকেই নিজ-নিজ এলাকা শাসন করুক এবং বহিরাক্রমণ রোধকল্পে সকলে একত্র হোক।'

তৈমুরদলীয় প্রাক্তন আমিরগণ এ-ব্যবস্থার ত্রুটি দেখালেন, বললেন, 'একজন বড়ভাই দরকার। জমি ভাগ করে যদি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা হলে জাটরা এসে প্রত্যেককে কাবু করে ফেলবেই।'

শক্তিশালী দলপতিরা চাইলেন আগেকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে। বললেন, 'আমাদের মধ্যে কাউকে শাসক নির্বাচিত করলে তা হবে সম্পূর্ণরূপে আইনবিরোধী। চেঙ্গিজ খানের কোনো বংশধরকেই আমাদের শাসক নির্বাচন করতে হবে এবং তৈমুর হবেন তাঁর প্রতিনিধি।'

এবার উঠলেন আবুল হাসান নামক একজন দরবেশ। তিনি এ-সম্পর্কে ধর্মীয় নির্দেশ পরিষ্কার ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, 'তোমাদের মতো কাফেরের আজ্ঞাবহ হওয়া হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের পক্ষে শরিয়তবিরোধী।* চেঙ্গিজ খান সম্পর্কে সম্পর্কে এই বলা চলে যে, তিনি ছিলেন মরুভূমির বাসিন্দা এবং

---

* এরা ছিল জালাইর ও সেলডুজ দলপতি—প্রাচীন তাতার জাতের লোক। তখনও পর্যন্ত এরা চেঙ্গিজ খানের আইনই মেনে চলত। চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর একশত চল্লিশ বৎসর পরে বল্খের এই বৈঠকে এই প্রথম তাতারগণ উক্ত পুরনো প্রথা ত্যাগ করেছিল।

শক্তি ও তরবারির জোরে তিনি মুসলমানদের জয় করেছিলেন। কিন্তু এখন তৈমুরের তরবারি কোনো দিক দিয়েই চেঙ্গিজ খানের তরবারির চাইতে কম শক্তিসম্পন্ন নয়।'

তিনি এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় নীরব মধ্যস্থদের মধ্যে উত্তেজনা জাগিয়ে তুললেন। বললেন, 'তোমরা হোসেনকে পরিত্যাগ করে মরুভূমিতে লুকিয়েছিলে। তৈমুর এগিয়ে না-আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ গোপন স্থান থেকে মুখ বার করো নাই। তিনি শত্রুকে শায়েস্তা করার জন্য তোমাদের সাহায্য চান নাই; এখনো তোমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী নন। তাতার হিসেবেই তোমাদের এতক্ষণ আমি এত কথা বললাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরা মুসলমানও। আমি হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর পৌত্রের বংশধর হিসেবে, ইসলামের বিশ্বাসী অন্যান্য প্রধানদের বংশধরদের সাথে পরামর্শ করে, এই ঘোষণা করছি—তৈমুরই হচ্ছেন 'মা-অরা-উন্নাহার' তথা সমগ্র তুরানভূমির অধিপতি।'

ধর্মবেত্তারা যে এরূপ নির্দেশ দিলেন, তার কারণ এ নয় যে, তৈমুর খুব ধার্মিক লোক ছিলেন—বরং এ-কারণে যে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি তখনকার অরাজকতার মধ্যে শান্তিস্থাপনে সমর্থ এবং ইসলামের শত্রু উত্তরদিকের যাযাবর-শক্তিকে দমন করার শক্তি রাখেন। তৈমুরের নির্বাচন অনিবার্য করে তুলেছিল প্রধানত যোদ্ধার দল। এরা তৈমুর ছাড়া অন্য কারুর তাঁবেদারি মানতে রাজি ছিল না।

পরদিন বিভিন্ন গোত্রের দলপতি ও প্রধানগণ তৈমুরের শামিয়ানায় সমবেত হয়ে তাঁর সামনে নতজানু হলেন এবং তাঁর বাহু ধরে তাঁকে শাদা কম্বলের উপর তাদের সর্বময় প্রভু হিসেবে বসিয়ে দিলেন। মোঙ্গল-গোত্রের এটা প্রাচীন প্রথা। এভাবেই শিরস্ত্রাণধারীরা তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল।

আমরা যাকে অভিষেক বলি, তাতে ধর্মবেত্তাদেরও অংশ ছিল। জইনুদ্দিন এক আমিরের কাছ থেকে আর-এক আমিরের কাছে একখণ্ড কোরআন হাতে করে এবং প্রত্যেককে কোরআন ছুঁইয়ে এই শপথ করতে বললেন যে, তৈমুর ছাড়া কারুর তাঁবেদারি তাঁরা করবেন না। আধুনিক যুগে আমরা একে বশ্যতা, স্বীকৃতির অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করি। কিন্তু এসব লোকের কাছে এ-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল তার চাইতেও অনেক বেশি।

এখন থেকে যোদ্ধা তৈমুর হলেন আমির তৈমুর। এবং সকলে গ্রহণ করবে এখন শুধু তাঁরই নিমক। তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততাই হবে তাদের সম্মান এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে তাদের নামের এবং বংশধরদের আত্মার উপর কলঙ্ক। তাদের ঝগড়া-বিবাদে তৈমুর হবেন সালিশ এবং তাদের সম্পত্তির তিনিই হবেন অভিভাবক। তিনি যদি এসব কাজে ব্যর্থ হন, তা হলে তারা আর-একটা জমায়েত বা 'কুরুলতাই' ডেকে আর-একজন আমির নির্বাচন করবে।

নতুন আমিরের সামনে গালিচার উপর দাঁড়িয়ে জইনুদ্দিন স্বর উঁচুতে তুলে বললেন, 'খোদার ইচ্ছায় তুমি জয়ী হবে। তোমার শক্তি এবং তোমার মাধ্যমে ইসলামের শক্তি আরো বাড়বে।'

কিন্তু যে-লোকটি শাদা কম্বলের উপর আবলুশ কাঠের সিংহাসনে বসেছিলেন, তিনি বোখারার সাধুদের সাথে সৈয়দজাদাদের উচ্চকণ্ঠের কলহ উপভোগ করছিলেন

এবং মৃদু মৃদু হাসছিলেন। কলহটা বেধেছিলে কারা তৈমুরের ডানদিকের সবচাইতে নিকটের আসনগুলোতে বসবে, এই নিয়ে। কিন্তু কোনো বিরক্তির চিহ্ন ছিল না তাঁর মুখে। তৈমুরের মাথা মোড়ানো ছিল না। তিনি ধারণ করেছিলেন পালিশ-করা ইস্পাতের বন্ধনীতে আবদ্ধ অস্ত্র আর স্বর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ ছিল তাঁর মাথায়। ওটা তাঁর ঘাড় ও কান ঢেকে দিয়েছিল।

নতুন অনুগত ব্যক্তিদের তিনি দিলেন খেলাত। তাঁর যা-কিছু ছিল—উঁচুজাতের ঘোড়া, পোশাক, অস্ত্র এবং জিন। তাদের শামিয়ানায় সে-রাত্রে তিনি পাঠালেন খাদ্য আর ফল। যে-সৈয়দগণ তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তৈমুরের শিবিরে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু তৈমুরের অপরিমিত দানের প্রতিবাদ করলেন।

তিনি উত্তরে তাঁদের জানালেন, 'যদি সত্যই আমি আমির হয়ে থাকি, তা হলে তো সব সম্পদই আমার। আর তা যদি না হয়ে থাকি, তবে যা আমার আগে থেকেই আছে, তা আগলে রেখে কী লাভ হবে আমার?'

পরদিন তিনি তাঁর নতুন উজির, অফিসার এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নিযুক্ত করলেন। এঁরা অধিকাংশ ছিলেন পরিচিত ব্যক্তি। আমির দাউদ পেলেন সমরখন্দের শাসনভার এবং হলেন উপদেষ্টা পরিষদের নেতা। বারলাস-গোত্রের বুড়ো আমির জকুকে নিশানবরদার করে দামামা বাজাবার অধিকার দিয়ে সম্মানিত করা হল। তাঁকে একজন তাবাচি এবং এডিকংও নিযুক্ত করা হল। বাহিনীর সেনানায়কদের তালিকায় দুইটি অপরিচিত নাম দেখা গেল : একজন মোঙ্গল, অন্যজন আরব—যথাক্রমে খিতাই বাহাদুর ও শেখ আলি বাহাদুর।

প্রথম থেকেই একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁর অনুগৃহীত জন কেউ ছিল না। জইনুদ্দিনের মতো অনেকেরই ছিল তাঁর কামরায় প্রবেশের সবসময়ের জন্য অবাধ অধিকার। কিন্তু তাঁদের সে-অধিকার আর রইল না। সবটুকু শাসনক্ষমতা তিনি নিজের হাতে রাখলেন। তিনি অপরের পরামর্শ গ্রহণ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য হওয়ার উপায় ছিল না। উদ্দেশ্যের এই অনন্যতা এশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তৈমুরের ক্ষেত্রেও এ ছিল অপ্রত্যাশিত, কারণ এই সেদিন পর্যন্তও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে ছিলেন অসাবধান।

বিরোধীদের প্রতি আঘাত হানতে তাঁর দেরি হল না। বল্‌খের জমায়েত শেষ হওয়ার আগেই তিনি আক্রমণ করেছিলেন হোসেনের অনুগামীদের। এদের বন্দি করে শৃঙ্খলিত ও হত্যা করা হয়েছিল। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে এবং গুঁড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। জাট-মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধের খেয়াল তাঁর বরাবরই ছিল। এখন একটা বার্ষিক ব্যাপার হয়ে উঠল উত্তরদিকের পাহাড়ে অভিযান পরিচালনা করা। এদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীনভাবে অস্ত্রচালনার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তৈমুরের সুদৃঢ়ভাবে এ-বিশ্বাস হয়েছিল যে, আক্রমণ করাই হচ্ছে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি লক্ষ করলেন, আক্রমণকারী মোঙ্গলই হচ্ছে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত মোঙ্গলের চাইতে অধিকতর দুর্দমনীয়।

উপযুক্ত ঔষধের আস্বাদনের ফলে জাট-গোত্রের লোকেরা সীমান্ত উপত্যকা

পরিত্যাগ করে উত্তর-অঞ্চলের গিরিসঙ্কটের পথে তাদের রাজধানী আলমালিকের দিকে চলে গেল। তৈমুর তখন আর বেশি অগ্রসর হলেন না। শিরদরিয়া এবং ভারতের মধ্যবর্তী এলাকায় একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। তাঁর একগুঁয়ে তাতারবাহিনী শৃঙ্খলারক্ষায় নয়াভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। দুজন আমিরকে বহু আগেই কোনো-এক জাট-গোত্রের লোকদের শায়েস্তা করার জন্য উত্তরদিকে পাঠানো হয়েছিল। তাদের চারণভূমি পরিত্যক্ত দেখে আমিরগণ এই বিশ্বাস নিয়ে দরবারে ফিরে চলেছিলেন যে, তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে।

বিশ্রামের আশায় খুশি হয়ে এবং নিষ্ফল ভ্রমণশেষে ভূরিভোজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যখন তাঁরা শিরদরিয়া হেঁটে পার হচ্ছিলেন, তখন একদল অশ্বারোহীর সামনে তারা পড়ে গেলেন। দলটি ঠিক তাঁদের মতোই উত্তরদিকে যাচ্ছিল। কোথায় তারা যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর এল, 'তোমরা যে-জাটদের সন্ধান পাওনি, আমরা তাদের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি।'

আমিররা প্রথমে খুবই রেগে উঠলেন। কিন্তু পরে চিন্তা করতে লাগলেন। তৈমুরের কাছে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁরাও ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় দলেরই সঙ্গী হলেন। উঁচু পাহাড়ে শীতকাল কাটিয়ে সম্মিলিত বাহিনী সমরখন্দে পৌঁছার এক বছর পরের ঘটনা এটা। তারা কিন্তু জাটদের পালিত পশুগুলো এবং তাদের কতকগুলো কর্তিত মুণ্ড নিয়ে এবং বহু গ্রাম বিধ্বস্ত করে ফিরে এল। তৈমুর বহুত বহুত তারিফ করে সবাইকে সমানভাবে পুরস্কার দিলেন—আমির দুজনের প্রাথমিক চেষ্টার ব্যর্থতার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না। যদি তা তিনি করতেন, তা হলে আমির দুজন নিজেদের অসম্মানিত মনে করতেন এবং নিজের লোকজনসহ দল ছেড়ে দিয়ে রক্তক্ষয়ী বিবাদের সূত্রপাত করতেন।

অন্যান্য দলপতিদের কেউ-কেউ কোনো কারণে দুঃখিত হয়ে, বা নিজেদেরকে স্বাধীন কল্পনা করে নিজ-নিজ দুর্গে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক মাস যেতে-না-যেতেই দেখলেন, তৈমুরের অশ্বারোহীরা তাঁদের দেয়ালের দ্বারে এসে হানা দিয়েছেন। দেয়ালের ভিতর থেকে তাঁদের বার করে সোজা তৈমুরের গালিচায় নিয়ে আসা হল। তৈমুর তাঁদের খেলাত বখশিশ করলেন। একজন কর্মচারী এক যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে খুঁজে বার করে তার অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল এবং লেজের দিকে মুখ করে তাকে এক গাধার পিঠের জিনে আটকে দেওয়া হল। কয়েকদিন ধরে এই অবস্থায় সমরখন্দের রাস্তা দিয়ে জনতার হাসিঠাট্টার মধ্যে তাকে ঘোরানো হল।

কাত্‌লানের কায়খসরু নামে বড় বংশের একজন ইরানি খিভা মরুভূমিতে শত্রুর সম্মুখেই তৈমুরকে ত্যাগ করে গিয়েছিল। তাতারগণ ভীষণ যুদ্ধে মেতেছিল। এখানেই শেখ আলি বাহাদুর ও খিতাই বাহাদুরের অনুসরণ করতে করতে এল্‌চি বাহাদুর ঘোড়াসহ নদী সাঁতরিয়ে পার হতে গিয়ে মারা পড়ে। যাহোক, এ-যুদ্ধে তাতারদেরই জয় হয়। কায়খসরুকে ধরে এনে আমির ও জজদের কাছে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। অবিলম্বে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

তৈমুরের পুরনো তাতার-সঙ্গীরা দলের নতুন লোকদিগকে আশ্বাস দেয়, 'মালিকের আদেশ মেনে চলাই ভালো। যারা অন্যরূপ বলে, তারা মিথ্যাবাদী।'

নবাগতদের মধ্যে জাট-মোঙ্গলদের ছেলেরাও ছিল। বিরোধ নিষ্ফল ভেবে তারা তৈমুরের দলে যোগ দিয়েছিল। তাদের একজন হচ্ছে বায়ান—বিকিজুকের পুত্র বায়ান। বর্তমানে যিনি আমির, তিনি কীরূপ সহৃদয়তার সাথে তার পিতার প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন, সেকথা তার স্মরণে ছিল। আর একজন খিতাই বাহাদুর—ক্যাথেবাসী, বীরযোদ্ধা, কোপনস্বভাব, কিন্তু একজন প্রত্যুৎপন্নমতি দলপতি। সে ঘোড়ার কেশরযুক্ত চামড়ার অঙ্গাবরণ পরত। তারই মতো কোপনস্বভাব শেখ আলির সাথে তার স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বিস্ময়করভাবে।

তারা দুজন এক অগ্রগামী বাহিনীর পরিচালক হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল জাটদের। অবশেষে একটা ছোট নদীর ওপারে তাদের দলসুদ্ধ পাওয়া গেল। বাহাদুররা নদীর তীরে নেমে, অতঃপর কী করা উচিত, সে-সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করল কয়েকদিন ধরে। খিতাই সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষপাতী; কী করে জাট-অশ্বারোহীদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চুপিসারে নদী পার হওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে কয়েকটি মতলবের কথা সে বুঝিয়ে বলল। এ-সম্পর্কে শেখ আলির কোনো পরিকল্পনা ছিল না; কাজেই নীরবে সে তার কথা শুনল। কিন্তু খিতাই শেখের নীরবতাকে তার অসম্মতি এবং সম্ভবত তার দ্বিধা-সন্দেহ বলে মনে করল। সে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ হে?'

শেখ কতকটা অলসস্বরে উত্তর দিল, 'আল্লার দোহাই! আমি ভাবছি, মোঙ্গলরা সম্ভবত এভাবেই যুদ্ধ করে যাচ্ছে।'

সমতলভূমির বীর যোদ্ধার মুখ কালো হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল সে এবং গম্ভীরভাবে বলল, 'চেয়ে দ্যাখো! মোঙ্গলরা কীভাবে যুদ্ধ করে, তা এখনই দেখতে পাবে।'

শেখ আলি কনুই পর্যন্ত মাথা তুলতে-না-তুলতেই খিতাই জিন না কষেই ঘোড়ায় চড়ে বসল এবং নদী পার হতে লাগল। বিস্মিত জাটদের মাঝখান দিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। প্রথমেই সামানে যে-দুজন পড়ল, তাদের সে কেটে ফেলল। এরপর কয়েকজন জাট-অশ্বারোহী কর্তৃক আক্রান্ত হল। শেখ আলির কৌতূহল বিস্ময়ে পরিণত হল। লাফিয়ে উঠে সে ঘোড়া আনতে হুকুম করল। ঘোড়ার জিনে বসেই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খঞ্জরহাতে অশ্বারোহী বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকে সে খিতাইয়ের দিকে যেতে লাগল। সে হেঁকে বলল, 'এ কী পাগলামি শুরু করেছ? সরে যাও।'

'না, তুমি সরে যাও।'

'খোদা রক্ষা করুন', বিড়বিড় করে একথা বলে শেখ আলি খিতাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জাটরা তাদের দুজনকেই ঘিরে ধরে এগুতে লাগল। ইতোমধ্যে তাদের অনুগামী বাহিনীও তাদের পিছনে পিছনে কোনোরকমে সেখানে এসে পড়ল। শত্রুদের কেটে পথ করে তাদের মুক্ত করল এবং নিরাপদে তাদের নিয়ে ফিরে এল। এরপর খিতাই ও শেখ আলি আবার একত্রে বসে ঠাণ্ডা মেজাজে পুনরালোচনায় মন দিল।

১৩
সুফিদের কাণ্ড

এই ধরনের লোকদেরই সংযত ও পরিচালিত করা ছিল তৈমুরের একটা বড় কাজ। এর জন্য দরকার ছিল বিজ্ঞতা এবং অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির। সকলে তাঁকে সমর্থন করে বলত, 'তিনি ঠিক বিচার করেন এবং তেমনি প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃতও করেন।' মরুভূমির ওপারের প্রতিবেশীরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে—তাঁর উপর নজর রাখবার জন্য যেসব দূত পাঠিয়েছেন, তাদের কীভাবে তৈমুর গ্রহণ করেন, তা দেখবার জন্য তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

এই প্রতিবেশীরা ছিল শক্তিশালী এবং অরাজকতার আমলে তাতারদের আক্রমণ করে তারা প্রচুর লাভবানও হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন খারেজমের সুফি—খিভা, উরগঞ্জ ও আরলসাগরের মালিক। জাট খানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ তাদের একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জন্মের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন জালাইর। কিন্তু তৈমুরকে তাঁর মনে পড়ত একজন ভ্রাম্যমাণ হিসেবে—যিনি লাল বালি এলাকার তুর্কম্যান উপজাতির লোকদের সাথে জীবনমরণের সংগ্রাম করেছিলেন। আমুদরিয়ার মুখে অবস্থিত উরগঞ্জ শহর ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী ব্যবসাকেন্দ্র। তার দেয়াল ছিল উঁচু। এর জন্য সুফির গৌরববোধ কম ছিল না। তিনি মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাঁর দূতের কাছে তৈমুর অধিকতর মূল্যবান উপহার পাঠালেন। সুফিকে তিনি অনুরোধ জানালেন, তাঁর ছেলে জাহাঙ্গিরের সাথে তাঁর সুন্দরী মেয়ে খানজাদের বিয়ে দিলে তিনি খুব খুশি হবেন। যদিও মনে হল, এ-অনুরোধ বন্ধুত্বমূলক, কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল এই যে, তৈমুর সুফিকে তাঁর অনুগত ব্যক্তি বলেই গণ্য করেন—তিনি দাবি করতে চান তাঁর নিকট থেকে জাট খানের বিশেষ অধিকার। সুফি উত্তরে জানালেন, 'আমি তরবারি দিয়ে খারেজম জয় করেছি এবং তরবারি দিয়েই মাত্র এটা আমার নিকট থেকে জয় করা সম্ভব।'

তৈমুর তক্ষুনি মরুভূমিতে অভিযান করতেন; কিন্তু একজন ধার্মিক মুসলমান সমরখন্দের আমিরকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে রাজি করালেন এই বলে যে, তিনি নিজে একবার খারেজম যাবেন এবং সুফিকে তাঁর প্রস্তাবে রাজি করাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু ধার্মিক লোকটি পৌঁছামাত্রই সুফি তাঁকে বন্দি করলেন। কাজেই তৈমুরকে আর সংযত করা সম্ভব হল না।

তৈমুর তাঁর আমিরদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে আহ্বান জানালেন। ভ্রাম্যমাণ হয়ে যে-পথ দিয়ে আগে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরেই এগিয়ে গেলেন। কাতলানের কায়খসরু এই পথেই তাঁর দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যাক, তৈমুরবাহিনী খিভানগরী ঘিরে ফেলল। তাদের সাথে কোনোরূপ ইঞ্জিনই ছিল না। তাঁর সৈন্যরা ব্রাশ-হাতে শুষ্ক পরিখায় নেমে পড়ল এবং সিঁড়ি লাগিয়ে নগরীর দেয়াল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

এ-সম্পর্কিত বিরবণী থেকে জানা যায়, শেখ আলিই সবার আগে দুর্গপ্রাকারে হাত লাগাতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাঁর পশ্চাদ্বর্তী অফিসারটি তাঁর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর

কনুই ধরে তাঁকে ঠেলে নিয়ে পরিখায় ফেলে দেয় এবং নিজেই সবার আগে দুর্গপ্রাকারে উঠে পড়ে। যে-পর্যন্ত-না তার সঙ্গীরা তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারল, ততক্ষণ সে খিভাবাসীদের গতিরোধ করে রাখল। এই বেপরোয়া অগ্রগতির ফলে খিভার পতন হল। তৈমুর তখন উরগঞ্জের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সুফি সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবরোধ ইঞ্জিনগুলোর, বিশেষ করে, পাথর-নিক্ষেপকারী যন্ত্র প্রভৃতির দরকার হয়ে পড়ল সেখানে। সেগুলো স্থাপনের যখন আয়োজন হচ্ছিল, সে-সময়ে সুফির নিকট থেকে তাঁর কাছে সংবাদ এল, 'কেন আমাদের এ-লোকক্ষয়! আসুন, অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হয়ে আমরা উভয়ে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করি। যার তরবারি অপরের রক্তপাত করতে সমর্থ হবে, সে-ই হবে জয়ী।'

সুফির দূত দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান ও সময়ের কথা জানাল। স্থানটি ছিল নগরীর সিংহদ্বারের বাইরে এক সমতলভূমিতে।

তৈমুরের আমিরদের যারা একথা শুনল, তারাই এ-প্রস্তাবের প্রতিবাদ করল। বিকিজুকের পুত্র বায়ান চিৎকার করে বলল, 'হুজুর, এ হচ্ছে আমাদের যুদ্ধ। আপনার স্থান এই চন্দ্রাতপতলে সিংহাসনে। সে-স্থান ত্যাগ করা আপনার পক্ষে উচিত হবে না।'

সবাই তাঁর হয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি চাইল। কিন্তু তৈমুর বললেন, 'কোনো অফিসার নয়, স্বয়ং সুফি—খারেজমের মালিক—তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছেন।' সুফির দূতকে তিনি জানালেন : তিনিই একাকী নির্দিষ্ট সময়ে সিংহদ্বারে উপস্থিত থাকবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর আমিরদের বেদনাভারাক্রান্ত চোখের সমানে তৈমুর হালকা বর্ম তাঁর গায়ে চড়ালেন, তাঁর তরবারিবাহক তাঁর বামবাহুর উপর ঢাল বেঁধে দিল এবং কোমরবন্ধে এঁটে দিল তাঁর খঞ্জর। মাথায় এবং কাঁধে তিনি পরিচিত কালো ও সোনালি রঙের শিরস্ত্রাণ বাঁধলেন এবং খুবই খুশিমনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘোড়ার কাছে গেলেন।

তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর অফিসারদের মধ্য থেকে বৃদ্ধ সাইফুদ্দিন দৌড়ে এসে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এমন সাধারণ লোকের মতো তৈমুরের যুদ্ধে যাওয়া উচিত হচ্ছে না। তৈমুর একথার কোনো উত্তর না দিয়ে তাঁর এই অতিআগ্রহী অনুগত লোকটিকে তরবারির বাঁট দিয়ে আঘাত করলেন। সাইফুদ্দিন লাগাম ছেড়ে দিয়ে আঘাত এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে পিছু হটলেন।

তৈমুর একাকী শিবির থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অবরোধ ইঞ্জিনের লাইন পেরিয়ে ইতঃপূর্বে সমবেত নীরব দর্শকদের মধ্য দিয়ে তৈমুর উরগঞ্জের বন্ধ সিংহদ্বারের দিকে ছুটে গেলেন। সিংহদ্বারের চূড়ায় সমবেত খিভার লোকদের ডাক দিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের প্রভু ইউসুফ সুফিকে বলো যে, তৈমুর তাঁর অপেক্ষা করছে।'

এ-কাজ কতকটা পাগলের দুঃসাহস ও একগুঁয়েমির মতো—কিন্তু তবুও প্রশংসার। তৈমুর—এখন আমির তৈমুর—এখনো সংগ্রাম তাঁর প্রিয় এবং নিজের মেজাজের চাইতে যুদ্ধের বিষয়বস্তুকে এখনো তিনি বড় মনে করেন না। শতাধিক ধনুকের মোকাবিলায়

ব্রাউনলেড নামক ঘোড়ায় চড়ে অসহিষ্ণুভাবে শত্রুর আগমনপ্রতীক্ষারত তৈমুরকে দেখে মনে হল, এই তো সত্যিকার তৈমুর—তাঁর মহত্ত্ব ও দুর্বলতার এই তো আসল রূপ!

ইউসুফ সুফি কিন্তু আর এলেনই না। তৈমুর অবশেষে হেঁকে বললেন, 'যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার মৃত্যু হবেই।'

তারপর তিনি ঘোড়া ফিরালেন এবং নিজ শিবিরে চলে এলেন। খুবই বিরক্ত হলেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনে তাঁর আমির এবং সেনানায়কগণ তাঁকে একেবারে ছেঁকে ধরল। সহস্রকণ্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি উঠল। ভীষণ আরাবে দামামা বাজল। তার ফলে করতাল ও দফের বাদ্য ডুবে গেল। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও গোরুর হাম্বারবে সকলের কান তালা লেগে গেল। তাঁর অনুগত বাহিনীর আনন্দের অভিব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

ক্রুদ্ধ তৈমুরের উক্তি দৈববাণীর মতো ফলে গেল। কারণ ইউসুফ সুফি সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর মৃত্যুর পরে নগরী আত্মসমর্পণ করল। স্থির হল, বালিকা খানজাদেকে জাহাঙ্গিরের বধূ হিসেবে বিজয়ীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং উরগঞ্জ শহরসহ খারেজম একটি প্রদেশে পরিণত হবে—আর সে-প্রদেশ শাসন করবেন তৈমুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। এমনিভাবে যে-উপনিবেশ একসময়ে রাজা-বানানেওয়ালা কাজগান কর্তৃক শাসিত হত, তা পশ্চিম এবং উত্তরদিকে সম্প্রসারিত হল। আর পশ্চিমদিকের জালাইয়েরগণ তাদের নদীর ওপারের জ্ঞাতিভাইদেব সাথে ঐক্যবদ্ধ হল।

এর কিছুকাল পরেই তৈমুর বিরাটতর সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে তাঁর দক্ষিণের প্রতিবেশীর সাথে মোলাকাত করতে এগিয়ে গেলেন। অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার লোক এবার লৌহতোরণ নামক প্রতিধ্বনিময় গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে জোড়কদমে ঘোড়া চালাল। পিছনে চলল লাল বেলেপাথরের দেয়াল ঘেঁষে তাদের মোটবাহী গোরুর গাড়িগুলো।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল সাধারণ কূটনীতিক চাল হিসেবে। হিরাতের মালিক ছিলেন তখন এক যুবক—নাম গিয়াসুদ্দিন। ইতঃপূর্বে কাজগানের দরবারে যে-মালিক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, ইনি তাঁরই পুত্র। যথাসময়ে তৈমুর তাঁকে তাঁর দরবারে হাজির হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এবং এই আমন্ত্রণের তাৎপর্য ছিল এই যে, আমির তৈমুর মালিককে তাঁর একজন বশংবদ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি আছেন।

তৈমুরের এ-আমন্ত্রণের উত্তরে হিরাতের মালিক আনন্দ প্রকাশ করে জানালেন, তিনি সানন্দেই সমরখন্দ যেতে রাজি, যদি মাননীয় সাইফুদ্দিনকে তাঁকে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে পাঠানো হয়। তৈমুর তাঁর এই প্রবীণতম আমিরকে হিরাতে পাঠালেন। কিন্তু সাইফুদ্দিন সেখান থেকে একাকী ফিরে এসে জানালেন, মালিক উপহার-সংগ্রহের ভান করল বটে, কিন্তু এখানে আসবার কোনো আগ্রহ তাতে ফুটে ওঠে নাই। বরং দেখা গেল, হিরাতের চারপাশে সে এক নতুন দেয়াল নির্মাণ করছে।

তৈমুর এরপর এক দূত পাঠালেন। কিন্তু বুদ্ধিমান গিয়াসুদ্দিন তাকে আটক করলেন। কাজেই তাতারি যুদ্ধনিশান আবার উত্তোলিত হল। শিরস্ত্রাণধারী এক বিরাট

বাহিনী নৌকার পুলের উপর দিয়ে আমুদরিয়া পার হয়ে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলল। নিজেদের এলাকার বাইরে যুদ্ধের এই সুযোগ পেয়ে তারা খুশি হল। তারা বসন্তকালের সবুজ তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমিতে ঘোড়া চালিয়ে, গিরিসঙ্কট পেরিয়ে ফুশাঞ্জের সামনে এসে আস্তানা গাড়ল। ফুশাঞ্জ হিরাতের একটি দুর্গ এবং গিয়াসুদ্দিনের সেনাদলের আস্তানা। তৈমুরের আর দেরি সইছিল না, তিনি তক্ষুনি হামলা শুরু করলেন। পরিখার উপর তক্তা বিছানো হল এবং অস্ত্রের স্তূপের নিচে সিঁড়ি লাগানো হল।

সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করার জন্য তৈমুর নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের মাঝে গেলেন এবং দুবার তীরের আঘাতে আহত হলেন। এই হামলাকারীদের অগ্রভাগে ছিল শেখ আলি মোবারক। এই মোবারকই উরগঞ্জে শেখ আলিকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এদের সাথে ছিল এল্‌চি বাহাদুরের পুত্র। এই তিনজনের মধ্যে ছিল আগে থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ড্রামের বাদ্যের তালে তালে তাতাররা দেয়ালের ধারে এসে ভিড়তে লাগল। তাদের কিছুসংখ্যক লোক এক নালার ভিতর দিয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পানি ভেঙে তরবারি-হাতে নগরে ঢুকে পড়ল। তখন আরো কয়েকজন ঐ নালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে কয়েকখানা ইট খুলে ফেলে প্রবেশপথ প্রশস্ত করে দিল। ফুশাঞ্জে ভীষণ লুটপাট শুরু হয়ে গেল। দুর্গের সৈন্যবাহিনী নিহত হল। স্থানীয় অধিবাসীরা পালিয়ে গেল।

হিরাতের উপর বিষাদের অন্ধকার নেমে এল। তৈমুরবাহিনী যখন অবরুদ্ধ শত্রু-সৈন্যের উপর হামলা চালান, হতভাগ্য গিয়াসুদ্দিন তখন শান্তির জন্য দরদস্তুর শুরু করলেন। তাঁকে সম্মানের সাথে সমরখন্দে পাঠিয়ে দেয়া হল। তাঁর নতুন দেয়াল ভূমিসাৎ করা হল, নগর অবরোধমুক্ত হল। মালিকদের ধন-দওলতসহ হিরাতের সিংহদ্বারটি সবুজ-নগরীতে নিয়ে যাওয়া হর। এইসব ধন-দওলতের মধ্যে ছিল রৌপ্যমুদ্রা, আনকোরা মূল্যবান পাথর, জরির কাপড় এবং বংশগত স্বর্ণ-সিংহাসন।

হিরাত দখলের ফলে তৈমুরের ক্রমবর্ধমান রাজ্যে একটা বড় শহর যুক্ত হল—একটা সত্যিকার রাজধানীর যোগ্য শহর। পরিধিতে নয় হাজার পদক্ষেপের মতো স্থান। সেখানে ছিল আড়াই লক্ষ লোকের বাসস্থান। বিজয়ীদের গণনায় দেখা গেল, শহরে রয়েছে কয়েকশত মাদ্রাসা, তিন হাজার হাম্বামখানা এবং প্রায় দশ হাজার দোকান। সে-সময়কার লন্ডন ও প্যারিস—এ-দুয়ের কোনো শহরেই ৬০ হাজারের বেশি অধিবাসী ছিল না। আর প্যারিসে স্কুল ছিল বটে, কিন্তু গরম পানির হাম্মামখানা থাকার কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাতাররা সবচাইতে বেশি আশ্চর্য হল পানির পরিবর্তে বায়ুচালিত কল দেখে।

ঐতিহাসিকের মতে, এই বিজয়ের পরে তৈমুরের রাজ্য এত নিরাপদ হল যে, বিলাসিতা ছাড়া এর আর-কোনো শত্রুই রইল না। সংক্ষেপ এসব যুদ্ধ জাটদের বিতাড়ন, ইউসুফ সুফি এবং গিয়াসুদ্দিনের পতন—ইত্যাদি ছিল ঘরোয়া ব্যাপার; যেখানে সমরকৌশল অপেক্ষা সাহস ও কূটনীতিই হয়েছিল বেশি সক্রিয়। এসবে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হল যে, তৈমুর একজন বিশিষ্ট নেতৃপুরুষ হতে পেরেছেন। আর প্রতিবেশীদের উপর প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠায় তাঁর দক্ষতা জন্মেছে প্রচুর। কারণ প্রথমদিকে

তিনি হিরাতের মালিকের মতো শক্তিশালী ছিলেন না। কয়েক বছর আগে হোসেনের নিকট থেকে পালিয়ে তিনি কার্সিতে ফিরে না গিয়ে, হিরাতের মালিকের আশ্রয়গ্রহণ করতেন পারতেন।

কিন্তু তৈমুরের মধ্যে এমন একজন নেতৃপুরুষের জন্ম হল, যাঁর ছিল দিগ্বিজয়ের প্রতিভা এবং যিনি এখন ক্ষমতার সুউচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়েছেন। ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে যখন বল্‌খের শাদা কম্বলের উপর তাঁর অভিষেক হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌত্রিশ। তাঁর সীমানার চারদিকেই তখন যুদ্ধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে এশিয়া থেকেই ইউরোপে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছিল—সর্বত্র জেগে উঠেছিল অসন্তোষ, বংশের পর বংশের হচ্ছিল পতন। ব্যবসায়ীদের কাফেলাগুলোও নয়া কার্যক্রমের সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। মানুষ খুঁজছিল সমর-শিবির। পরিত্যক্ত মাঠে দেখা দিল অশ্বারোহী দল, আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অগ্নিশিখা বিস্তারলাভ করছিল।

এই ব্যাপকতর যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া ছিল তৈমুরের পক্ষে অনিবার্য।

১৪
সমরখন্দ

তৈমুর এখন সমরখন্দে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। নদীর ওপারের দেশে (মা-অরা-উন্নাহারে) সবুজ-নগরীই ছিল সবচাইতে সুন্দর স্থান। কিন্তু তৈমুর এখন বিশাল ভূখণ্ডের মালিক হয়ে পড়েছেন এবং উত্তর-দুয়ারি সমরখন্দ হল তাঁর এ-রাজ্যের মধ্যভাগ। তাঁর রাজ্য এখন প্রত্যেক দিকে কমবেশি পাঁচশত মাইল দীর্ঘ। কিন্তু দরবার সেখান থেকে স্থানান্তরিত করার আগে তিনি তাঁর নিজ শহরকে উত্তমরূপে সজ্জিত করলেন। তাঁর পিতার কবরের উপর তিনি একটি ছোট সোনালি স্তম্ভ তৈরি করলেন। সুন্দরী আলজাই তাঁর যে-পুরনো কাদার প্রাসাদকে একসময়ে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন, সেটা তিনি ভেঙে ফেললেন। সে-জায়গায় তিনি প্রাঙ্গণ এবং উঁচু চক্রাকৃতি প্রবেশদ্বারসহ এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করালেন। অট্টালিকাটি শাদা ইট দিয়ে তৈরি করা হল। তাতাররা একে বলত 'এক-সরাই' বা শ্বেত-প্রাসাদ। আমির শীতকালে যখন সৈন্যসহ যুদ্ধাবস্থায় থাকতেন না, তখন এখানে এসে সে-সময়টা কাটাতেন। নিজদেশের রৌদ্রালোকিত এই তৃণাচ্ছাদিত ভূমি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। মহিমময় সুলায়মানের বরফাচ্ছাদিত চূড়ার দৃশ্য কুয়াশার ভিতর দিয়ে এখান থেকে দেখতে বড় মনোরম।

ঐতিহ্য তাঁকে বোখারার দিকে না নিয়ে, টেনে নিয়ে এল সমরখন্দে, তার অর্ধভগ্ন প্রাসাদগুলোতে। বোখারা সে-সময় তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরিগুলো নিয়েও আয়তনে ছিল ক্ষুদ্রতর। সেকালে সমরখন্দ আলেকজান্ডারকে আনন্দ দিয়েছিল। সেখানে তিনি ক্লাইটামকে হত্যা করেছিলেন। দেড়শত বছর আগে চেঙ্গিজ খান এখানে তাঁর যাযাবর বাহিনীর আড্ডা গেড়েছিলেন।

মার্কোপোলোর চাইতেও দুনিয়ার বেশি অংশে সফরকারী ইবনে বতুতা বলেছেন, 'দুনিয়ার সবচাইতে বড়, সুন্দর ও মহান নগরগুলোর অন্যতম হচ্ছে সমরখন্দ।' মৃৎশিল্পীদের নদীর পারে এ-নগর অবস্থিত। পানির কলে এ-নদী আচ্ছাদিত এবং এর খালের পানি বাগানে সিঞ্চিত হয়। আসরের নামাজের বাদে এ-নদীর তীরে বহুলোক বেড়াতে আসে। সেখানে বারান্দাওয়ালা ঘর ও বসবার জায়গা আছে। আর আছে ফলের দোকান। সেখানে অনেক বড় বড় প্রাসাদ ও স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, যা স্থানীয় অধিবাসীদের সজীব মনোভাবের পরিচয় দেয়। নগরীর বেশিরভাগ ধ্বংসস্তূপে পরিণত এবং কিছু অংশ বিধ্বস্ত—সেখানে দেওয়াল বা দরজা নাই। নগরীর বাইরে কোনো বাগানও নাই।

ফলের বাগানেও তুঁতগাছের প্রাচুর্য ছিল সমরখন্দে। পর্বতের রৌদ্রোত্তাপ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ উত্তরীবায়ুর প্রভাবে এর অধিবাসীরা পরম আনন্দেই বাস করত। এর পিঙ্গলবর্ণ মাটিতে বছরে চার ফসল ফলত। খালগুলোতে বয়ে চলত পরিষ্কার পানি—পয়ঃপ্রণালী ও সিসার নলের সাহায্যে সে-পানি প্রতি গৃহে নিয়ে যাওয়ার ছিল সহজ উপায়। সেখানকার তাঁতগুলোতে বোনা হত 'কিরিমজি' নামের একপ্রকার লাল কাপড়। ইউরোপে ছিল এই কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা। সমরখন্দের অধিবাসীরা তখনকার জগতে সর্বোৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি করত। দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলা চলত এ-শহরের ভিতর দিয়ে। এ-শহরে জ্যোতিষীরাও দোকান পেতে বসে মানুষের ভাগ্যগণনা করত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাগলের নৃত্য ছিল সেখানে একটা উপভোগের জিনিস। শহরের ধ্বংসস্তূপ নিয়ে কারুর মাথাব্যথা ছিল না। তারা বলত, 'খোদা যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।'

সমরখন্দের অধিবাসীরা নীতিগতভাবেই দল বেঁধে এল তৈমুরকে সংবর্ধনা জানাতে। তাঁকে তারা অভিহিত করল 'সিংহ' 'বিজয়ী' এবং 'সৌভাগ্যের প্রভু' বলে। তৈমুরের জাঁকজমক দেখে তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হল। কিন্তু তারা তাঁর সাজসজ্জার সাথে ছিল আগে থেকেই পরিচিত। দশ বছর আগে তিনি যেন ছায়ার মতোই তাদের মধ্যে এসে চলে গিয়েছিলেন—সে-ঘটনাও তাদের স্মরণ ছিল। আর স্মরণ ছিল, তিনি তাদের সাহায্যেই সীমান্তের মোঙ্গলদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই—রেশমের পোশাক-পরা আমির, ঘোড়ার বণিক, ক্রীতদাস-বিক্রেতা, জিন এবং চীনামাটির বাসন-বিক্রেতা প্রমুখ সবাই খুব খুশি হলেন, তখন তৈমুর তাঁদের ট্যাক্স মাফ করে দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাজ করতেও তাঁদের ডাকলেন।

তিনি নিজে উপস্থিত থেকে নগরীর দেয়াল মেরামত করালেন। দ্বারদেশ থেকে নগরের মধ্যভাগে অবস্থিত বাজার পর্যন্ত দুইপার্শ্বে বৃক্ষসমন্বিত রাজপথ তৈরি করালেন—পাথরখণ্ড বসিয়ে রাস্তাগুলো করা হল পাকা। তাঁর কঠোর আদেশে দক্ষিণের পাহাড় থেকে কুঁড়েঘরগুলো ভেঙে ফেলা হল। এক বিশাল রাজধানীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

নগরীর উপকণ্ঠে, শহর থেকে নদী পর্যন্ত তাঁর সৈন্যবাহিনীর যেসব শিবির স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে দেয়াল-ঘেরা রাস্তা ও বাগান তৈরি হল। ধূসর বর্ণের গ্র্যানাইট পাথর

গো-শকটে করে দূরবর্তী নীল পাহাড় থেকে নিয়ে আসা হল। উরগঞ্জ বা হিরাত থেকে তাতার অশ্বারোহীরা মিস্ত্রি ও কারিগরদের নিয়ে এল। বিভিন্ন দেশের রাজদূতগণ দুপাশের পপলার গাছের সারির ভিতর দিয়ে রাজপথ বেয়ে গম্ভীরভাবে রাজধানীতে প্রবেশ করতে লাগলেন। নগরীর অতিথিভবনগুলো ক্রমে জনপূর্ণ হয়ে উঠল।

এমনকি, শহরের রং বদলে গেল। কারণ তাতারদের প্রিয় রং ছিল নীল এইজন্য যে, সীমাহীন আকাশ, অতল সমুদ্রের পানি এবং উচ্চতম পর্বতশ্রেণীর রং নীল। তৈমুর হিরাতের চকচকে নীল রঙের টালি দেখেছেন। নিষ্প্রভ কাদার ইটের পরিবর্তে তিনি তাঁর নতুন ইমরাতগুলোর সমুখভাগ সুতার মতো করে সোনালি ও শাদা অক্ষরে এমনভাবে গাঁথিয়ে তুললেন যে, সেসব যেন জ্বলতে লাগল। কাজেই শহরকে লোকে বলতে লাগল 'গোকান্দ' বা নীল নগরী।

সমরখন্দের লোকেরা ভাবতে লাগল, তৈমুর অন্যসব আমিরদের মতো নন। তাঁর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে একটা প্রবাদ রচিত হয়ে গেল, 'লৌহ-হস্ত'। তাঁর সোনালি-রঙা 'ব্রাউন-ল্যাড' ঘোড়ায় চড়ে যখন তিনি রাজপথ দিয়ে চলতেন আর পিছনে ধুলার ভিতর দিয়ে লাল ও রুপালি আভা ছড়িয়ে চলত তাঁর সৈন্যদলের প্রধানেরা, তখন জনসাধারণ রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াত। যখন তিনি মসজিদের ভিতর-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে চক্রাকৃতি প্রবেশদ্বারের নিচে দাঁড়াতেন এবং লম্বা জোব্বাধারী মোল্লারা তাঁর প্রশংসা করত এবং ভিখারিরা খোদার নিকট প্রার্থনা জানাত, সে-সময় বিচারের জন্য কেউ তাঁর সামনে যেতে সাহস পেত না। কারণ যুদ্ধে যারা তাঁকে সাহায্য করত, কেবল তাদের কথাই তিনি ধৈর্যসহকারে শুনতেন। যদি তাঁর সামনে দুই ব্যক্তি একে অপরের প্রতি দোষারোপ করত, তখন বিচার করতে তাঁর একটুও দেরি হত না—হয়তো তাঁর দেহরক্ষীর তরবারির এক আঘাতে একজনের শির তখনই ভূলুণ্ঠিত হত।

আরলসাগরের তীরে অবস্থিত উরগঞ্জ থেকে সুফির মেয়ে খানজাদের আগমনের ব্যাপার সমরখন্দবাসীদের অনেকদিন মনে ছিল। সেদিন পশ্চিমদিকে সমগ্র রাজপথ গালিচা এবং তৈমুরের শিবিরের সবটুকু জমি কিংখাবে মণ্ডিত হয়েছিল। খানজাদে এসেছিলেন বোরখা পরে, শাদা উটের শিবিকায় আরোহণ করে। তাঁর শিবিকা বেষ্টন করে চলেছিল সঙ্গিনধারী দল। এর পিছনে আসছিল উপহারবাহী ঘোড়া ও উটের দল। নববধূকে সংবর্ধনা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন বায়ুভরে তরঙ্গায়িত চন্দ্রাতপ ও নিশানের নিচে দিয়ে 'তাবাচি' ও আমিরগণ।

সূর্যাস্তকালে যখন শুকনো বায়ুপ্রবাহে শামিয়ানা আন্দোলিত হতে শুরু করল, তখন ঝুলন্ত বাবলাগাছে হলদে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হল এবং তাঁবুর বিরাট খুঁটিগুলোর চারপাশে চন্দন ও মেশক্-আম্বরের সুগন্ধি ধোঁয়া পাক খেতে লাগল। ভোজে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে তৈমুর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আর তাঁর চাকরেরা অতিথিদের পাগড়ি-বাঁধা মাথায় সোনা ও হীরা ছড়িয়ে দিতে লাগল।

বিবরণ-লিখিয়ে বলেছেন, 'এসব ছিল সত্যি বিস্ময়কর এবং কোথায়ও এতটুকু বিষাদের স্থান সেখানে ছিল না। শামিয়ানার উপরিভাগ দেখাচ্ছিল যেন নীলাকাশ। সেখানে মূল্যবান পাথরগুলো জ্বলছিল তারার মতো। বধূর কক্ষটি সোনার কিংখাবের

পরদায় আলাদা করা হয়েছিল। এটা সত্য যে, বধূর শয়নকক্ষটির সাজসজ্জা হয়েছিল অত্যন্ত সুন্দর—আমাজনের রানী কেদেসার শয়নকক্ষের মতো সুন্দর।'

শাহজাদি খানজাদে স্বামী জাহাঙ্গিরের জন্য যেসব উপহার-দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, সেসব সকলকে দেখানো হল। তৈমুর আরেকটি শামিয়ানার কক্ষগুলো তাঁর ছেলেকে প্রদত্ত উপহার-দ্রব্যে পূর্ণ করেছিলেন—তাতে ছিল সোনার বন্ধনী, অর্থ, রুবি, কস্তুরি, আম্বার, রুপালি কিংখাব ও সাটিন, আর ক্যাথের সোনা ও রুপার কাজকরা পোশাক, সুন্দর ঘোড়া এবং ক্রীতদাসীর দল। প্রশংসার সাথে এসব বিবরণ দেবার পরে বিবরণ-লিখিয়েকে থেমে বলতে হয়েছে যে, ভোজের প্রতিদিন একটি করে কক্ষ খালি হয়ে যেত।

সে-রাত্রে নিজ ছেলে ও খারেজমের কৃষ্ণকেশী শাহজাদিকে দেখে তৈমুরের কি আরেক রাত্রির কথা মনে পড়েছিল, যখন দামামাধ্বনির ভিতর দিয়ে মালেকা আলজাই তাঁর যুদ্ধ-শিবিরে এসে হাজির হয়েছিলেন? মরুভূমির উপর দিয়ে তিনি যখন একমাত্র আলজাইয়ের সাথে পায়ে হেঁটে চলেছিলেন, সে-সময়ে আলজাই হেসে বলেছিলেন, 'এভাবে আমাদের কোনোদিন পায়ে হেঁটে চলতে হবে, এর চাইতে দুর্ভাগ্য আমাদের আর হতে পারে না।'

খানজাদের ভাগ্য অন্যরূপ। বিজয়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র জাহাঙ্গিরের প্রথম স্ত্রী তিনি। স্বয়ং বিজয়ী তাঁর পুত্রবধূর সৌন্দর্যে গর্বিত। তৈমুরের ক্রোধ উদ্রেক করতেও তিনি সাহসী। খানজাদে বললেন, 'শাহানশাহ। বিজয়ী তিনিই, যিনি রাজা-ভিখারি-নির্বিশেষে সবাইকে দয়া করতে পারেন। যারা দোষী তাদের ক্ষমা করতে যাঁর বাধে না; কারণ যখন কোনো শত্রু ক্ষমাভিক্ষা করে, তখন আর সে শত্রু থাকে না। বিজয়ী যখন দান করেন, তখন ফিরে পাবার প্রত্যাশা নিয়ে তিনি তা কখনো করেন না! তিনি কখনো কোনো-এক ব্যক্তির বন্ধুত্বের উপর ক্রোধ মনে জমিয়ে রাখেন না। কারণ এসবের বহু ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন এবং শক্তি একমাত্র তাঁরই করায়ত্ত।'

তৈমুর উত্তরে বললেন, 'না, কারণ দলপতিদের আনুগত্য আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু দরবেশের কথায় আমি বিপন্ন হই।'

খানজাদের বুদ্ধিমত্তা তিনি পছন্দ করতেন—যদিও তিনি জানতেন, খানজাদে তাঁর গোষ্ঠীর লোকদের জন্য ওকালতি করছেন। খানজাদের গর্ভে জাহাঙ্গিরের প্রথম সন্তান ছেলে হবে, এ-কল্পনায় তিনি আনন্দিত হতেন।

তৈমুর নিজেও আমির হোসেনের বিধবা স্ত্রী সারাই খানমকে বিয়ে করেছিলেন। প্রাচীন মোঙ্গলদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, রাজবংশের স্বামীহারা মেয়েদিগকে নতুন রাজার পরিবারে স্থান দিতে হবে। সারাই খানমের ধমনিতে চেঙ্গিজ খানের রক্ত প্রবাহিত ছিল। তাই তিনি তৈমুরের জীবনসঙ্গিনী হতে পেরেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, শিবিরের পরদার আড়ালে তিনি তাঁর গৃহকর্ত্রীও হয়েছিলেন। তৈমুর যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে দরবার তাঁর মর্যাদার সম্মান দিত। সেকালের বড়ঘরের তাতার-রমণীদের মতো তিনিও ছিলেন পুরুষের গুণসম্পন্না—কখনো কখনো তিনি অশ্বারোহণে শিকারেও যেতেন। তৈমুরের প্রতি তাঁর নীরব বিশ্বস্ততায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর

শিশু নাতি-নাতনিরাও তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে পড়েছিল।

সমরখন্দের লোকেরা তৈমুর সম্পর্কে খুব কমই জানতে পেরেছিল। কিন্তু প্রতিদিনই কাসেদ বা সীমান্তরক্ষী কোনো উষ্ট্রারোহী তাঁর কাছ থেকে একটা-না-একটা শুভ-সংবাদ বয়ে আনত কিংবা বিজিত কোনো শহরের মালমাত্তাবোঝাই গাড়ি নিয়ে আসত। মা-অরা-উন্নাহরে আগেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৈমুর প্রতিবছর পশ্চিমদিকে অভিযান চালাতেন—খোরাসানের রাস্তা বেয়ে, নিশাপুর ও মেশেদের মসজিদের গম্বুজ পিছনে রেখে আরেক সমুদ্র কাস্পিয়ান পর্যন্ত ধাওয়া করতেন। সমরখন্দের লোকেরা শুনতে পেল, সেখানকার সেবসেভার নামক যে-সন্ন্যাসীদল ডাকাতি করে বেড়াত, তৈমুর তাদের দফা শেষ করেছেন।

তাঁর উত্তরদিকের অভিযানের কথাও তেমন জানা যেত না। কিন্তু এবার তিনি জাট-মোঙ্গলদের রাজধানীর রক্ষাব্যূহ ভেদ করে আরো এগিয়ে গেলেন। সমরখন্দের কাফেলাদের সরাইখানাগুলোতে গোবি মরুভূমির এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল যে, সর্বশেষ মোঙ্গল কমরউদ্দিন তাঁর সাথে যুদ্ধে সাহসী হয়েছিল, কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়েছে এবং তার ঘোড়া ধরা পড়েছে।

পুত্র জাহাঙ্গির সেবার তাঁর সাথে উত্তরদিকের যুদ্ধে যান নাই। তৈমুর তাঁকে বলে পাঠালেন, 'আগে আমরা বিদ্রোহ দমন করেছিলাম, এবার বিদ্রোহের আগুন একেবারে নিভিয়ে ফেলেছি।'

উত্তরদিক থেকে হাজার মাইলের রাস্তা অতিক্রম করে যখন তিনি ফিরে এলেন, সমরখন্দের অধিবাসীরা তাঁর সংবর্ধনার জন্য বাইরের বাগানে দাঁড়িয়ে গেল। তারা কালো পোশাকে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রাচীনতম আমির সাইফুদ্দিন এক অফিসারদলসহ তৈমুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিজেদের কালো পোশাকের উপর তাঁরা ধুলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের দেখে তৈমুর ঘোড়া থামালেন। সাইফুদ্দিন নেমে পায়ে হেঁটে তাঁর ঘোড়ার কাছে গিয়ে তৈমুরের দিকে না চেয়ে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরলেন।

তৈমুর বললেন, 'ভয় করছেন? কথা বলছেন না কেন?'

সাইফুদ্দিন উত্তর দিলেন, 'আমার মনে কোনো ভয় নাই। কিন্তু যৌবনে, পূর্ণশক্তি বিকশিত হওয়ার আগেই আপনার ছেলে চলে গেছে। বাতাসের আঘাতে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো সে অকালে ঝরে গেছে।'

জাহাঙ্গিরের অসুখ হওয়ার খবর তাঁর পিতাকে জানানো হয় নাই।

তৈমুর ফিরে আসার কয়েকদিন আগেই জাহাঙ্গির মারা গেছেন। তাঁর উপদেষ্টা সাইফুদ্দিন তৈমুরকে এ-খবর জানাতে সাহস করেছেন।

তৈমুর তৎক্ষণাৎ বললেন, 'এ-ঘোড়ায় চড়ে আমার স্থানে বসুন।' বৃদ্ধ সাইফুদ্দিন ঘোড়ায় উঠে বসার পর আবার এগিয়ে চলার ইঙ্গিত দেওয়া হল। এ-দুঃসংবাদ সৈন্যদের মধ্যে ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ধীরগতিতে এগিয়ে সমরখন্দে প্রবেশ করল।

সে-রাত্রেই জাহাঙ্গিরের নাকাড়া ও দামামাগুলো তৈমুরের কাছে আনা হল। এইগুলোই তাঁর আগমন-ঘোষণায় সবসময়ে বেজে উঠত। যাতে এগুলো আর কারুর

হাত দিয়ে কখনো বেজে না ওঠে, সেজন্য তৈমুর একে-একে সবগুলো ভেঙে ফেললেন। মুহূর্তের জন্য তৈমুরের প্রশস্ত ওষ্ঠদ্বয় বেদনায় কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর যা-কিছু আছে, তার সবচাইতে বেশি ভালোবাসতেন তিনি জাহাঙ্গিরকে।

১৫
সোনালিবাহিনী

এরপর কী হল, তা বুঝতে হলে পাঠকদের প্রায় একশত বছর পিছিয়ে গিয়ে কুবলাই খানের সময়কার মোঙ্গল-সাম্রাজ্যের খবর নিতে হবে।

চেঙ্গিজ খানের রাজ্যবিস্তার এমন আকস্মিক এবং এতটা বিরাট যে, একজনের পক্ষে বেশিদিন ধরে তা শাসন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও তাঁর পৌত্র কুবলাই খান তখনো ছিলেন খাকান এবং সব ভাইয়ের উপর ছিল তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব, তবু বাস্তবক্ষেত্রে ক্যাথের মালিক ছাড়া তিনি আর কিছু ছিলেন না। কাম্বালু শহর থেকে তিনি গোবি মরুভূমি, খাস চীন এবং কোরিয়া শাসন করতেন। অন্যত্র তাঁর অন্যান্য পৌত্রগণ পরস্পর যুদ্ধরত ছিলেন।

এ ছিল নিছক গৃহযুদ্ধ—প্রচণ্ড, বিরামহীন, কিন্তু নিষ্ফল। মোঙ্গলদের বিভিন্ন রীতি-নীতি সবই বজায় ছিল—দূত-বিনিময়ে ঠিকই ছিল। কাফেলাদের পথ বেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমতোই চলত। রোম থেকে মস্কো পর্যন্ত প্রসারিত উত্তরদিকের যে সুদীর্ঘ রাস্তা আলমালিকের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির উপর দিয়ে মরুভূমি পেরিয়ে কাম্বালু পর্যন্ত গিয়েছে, তা তখনো খোলা ছিল, তেমনি খোলা ছিল বাগদাদ থেকে কাম্বালু পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথও। কুবলাই খানের মৃত্যুর এক-পুরুষ বাদে আরব-পর্যটক ইবনে বতুতা সফরের দিক দিয়ে মার্কোপোলোকেও অতিক্রম করেছিলেন। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ পোপ বিনইর একজন সন্ন্যাসিনী ক্যাথেতে খাকানের দরবারে গিয়েছিলেন। জাটখানদের রাজধানী আলমালিকে এক সমৃদ্ধিশালী খ্রিস্টান মিশন ছিল—যদিও তার কথা পরে সকলে ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু ইতঃপূর্বে মোঙ্গল-সাম্রাজ্য-শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইলখানরা জেরুজালেম থেকে ভারত পর্যন্ত ভূভাগ শাসন করতেন। ১৩০৫ খ্রি. পর্যন্ত আমরা দেখি, এই ইলখানদের দরবারে ইংলন্ডের প্রথম এডওয়ার্ড ও আরাগনের দ্বিতীয় জেমস আর কনস্টানটিনোপলের গ্রিক সম্রাট ও আর্মেনিয়ার রাজার দূতগণ তাঁদের আসন করে নিয়েছেন—উদ্দেশ্য, মহান এই খ্যাতিমান মোঙ্গল সম্রাটদের সাথে মৈত্রী-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা। এই সময়ে, বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসানোর ফলে আরব, মামলুক ও ইরানি সামন্তরাজাদের আক্রমণে ইলখানদের পতন হয়। ফলে অরাজকতায় এলাকা ছেয়ে যায়। ইতোমধ্যে ক্যাথের খাকান চীনাদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে ধীরে ধীরে মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি গোবির তৃণাঞ্চলের দিকে চলে যেতে বাধ্য হন। চীনা সভ্যতা তাদের শক্তি হরণ করেছিল। তাদের শক্তির গোপন উৎস

শুকিয়ে গিয়েছিল। চীনের প্রাচীরের বাইরে তাদের চলে যেতে হল। মাঝে মাঝে গা-ঝাড়া দেবার চেষ্টা তাঁরা করলেন বটে, কিন্তু রাজপথ দিয়ে বিজয়-অভিযান পরিচালনা করা আর কখনো তাঁদের দিয়ে সম্ভব হল না।

জাটরাই ছিলেন মোঙ্গল-শাসকদের সবচাইতে ছোট শাখা। তাঁরা ছিলেন চেঙ্গিজ খানের পুত্র চাগাতাইর বংশধর। রাজা-বানানেওয়ালা কাজগান সমরখন্দের চারপাশের দক্ষিণদিককার অর্ধাংশ বার করে নেন। তারপর ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমির তৈমুর আলমালিকের চারদিকের পাহাড়গুলো থেকেও তাদের উৎখাত করেন। তৈমুর তাঁর উত্তরী-অভিযানে শুধু পাহাড়ের বাধাই অতিক্রম করলেন না, এশিয়ার বিশাল রাজপথটির উপরও নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি হয়তো একথা জানতেও পারলেন না, কিংবা জানতে ইচ্ছাও করলেন না যে, তাঁর এ-কাজের ফলে উত্তর-এশিয়া থেকে বর্বরদের অভিযান চিররুদ্ধ হয়ে গেল। সিথির, এলান ও হুনরা তুর্কি ও মোঙ্গলরা সবাই বিশাল তৃণভূমির নরককুণ্ড থেকেই বেরিয়ে এসেছিল। এরাই ছিল তাঁর পূর্বপুরুষ। তিনি নিজের জাতভাইয়ের উপর টেক্কা মেরেছেন—তাদের মরুভূমির দিকে তাড়িয়ে দিলেন।

১৩৭০ খ্রি. থেকে ১৩৮০ খ্রি. পর্যন্ত এই দশ বছরের মধ্যে প্রাচীন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের চারভাগের তিনভাগই মানচিত্র থেকে মুছে গেল এবং রাজপথগুলো হল অবরুদ্ধ। তবে যে-একভাগ তখনো রয়ে গেল, তা-ই ছিল সবচাইতে প্রবল। ওটা ছিল তৈমুরের সাম্রাজ্যের উত্তর এবং পূর্বদিকে অবস্থিত। তারই নাম সোনালিবাহিনীর সাম্রাজ্য।

চেঙ্গিজ খানের জ্যেষ্ঠপুত্র জুচিকে ঘিরে এ-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। একে সোনালি-বাহিনীর সাম্রাজ্য বলা হত এ-কারণে যে, জুচির ছেলে 'প্রশংসিত' বাটু তাঁর তাঁবুর গম্বুজ সোনার পাত দিয়ে মুড়েছিলেন। এ-সাম্রাজ্য সত্যি খুব গৌরবের সাথেই এগিয়ে চলেছিল। কারণ মধ্য-এশিয়া ও রাশিয়ার তৃণভূমি এর যাযাবর অধিবাসীদের অভাবপূরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এর সম্পদ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, এর গৃহপালিত পশুর দল ও সংখ্যা বাড়ছিল। আর দেড়শত বছর ধরে এরা ইউরোপের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৈমুরের যখন জন্ম হয়, সোনালিবাহিনীর ক্ষমতা তখন গৌরবের উচ্চশিখরে। উন্মুক্ত সমতলভূমির সংঘাতময় জীবন এই যাযাবর-গোষ্ঠীর জীবনের সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিল এবং তাদের করে তুলেছিল অধিকতর উদ্যমশীল।

উত্তরের তুন্দ্রা-অঞ্চলের বায়ুতাড়িত বরফাচ্ছাদিত বিশাল এলাকায় এরা ঘুরে বেড়াত। এদের রমণী ও শিশুর দল থাকত বলদবাহিত ঘেরা গাড়ির উপরে। যোদ্ধারা থাকত গাড়িগুলির পাশে পাশে। সমগ্র নগরীই এইভাবে চলত। মালগাড়িগুলো থেকে চুল্লির ধোঁয়া উঠত, শাদা কম্বলের গম্বুজওয়ালা মসজিদগুলো পতাকাসহ শোভা পেত। কখনো কখনো আরো উত্তরদিকে তারা বহুচূড়াযুক্ত পাইনকাঠের দুর্গে আশ্রয় নিত। সেখানকার নীলাভ কাঠই জানিয়ে দিত যে, তৃণভূমির শেষ সেখানেই।

এরা ছিল আধা-প্যাগান। কোমরবন্ধনীতে লৌহমূর্তির রশি-বাঁধা দীর্ঘকেশ শামানেরা মোল্লাদের পাশে বসত। জাদুকরদের পোষা ভালুকগুলো ঘুমাত মসজিদের

মালগাড়িগুলোর নিচে। অসংখ্য ঘোড়ার পালে চারণভূমি ভরে যেত। যেসব কুকুর ভেড়ার দল তাড়িয়ে নিয়ে যেত, তাদের সংখ্যা দিয়েই ভেড়ার সংখ্যা ঠিক করা হত।

শাসক পরিবারমাত্রই ছিল মোঙ্গল-বংশীয়। বাকি সব লোক ছিল উত্তরদেশের—যাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলত অন্ধকারের দেশ। তাদের নামগুলোতে ধ্বনিত হত উত্তরদেশীয় উচ্চারণ—যেমন কিপ্‌চক্ (মরুভূমির লোক), কঙ্কালিস (উঁচুগাড়ি), এবং কাজাক, কিরগিজ, মোর্ডভাস, বুলগার, এলান। তাদের মধ্যে ছিল জিপ্‌সি, জেনোয়ার বণিক-ব্যবসায়ীর দল—যারা ইউরোপের বাইরেও ঘুরে বেড়াত। আর ছিল কিছুসংখ্যক আর্মেনিয়ান এবং প্রচুর সংখ্যায় রুশীয়। তারা বেশিসংখ্যায় ছিল তুর্কি ও তাতারি। তবে সোজা এককথায় এদের বলা হত সোনালিবাহিনীর সাম্রাজ্যের অধিবাসী।

এরা ছিল তৈমুরেরই তাতার-বংশীয় দূরসম্পর্কিত ভাই-গোষ্ঠীর লোক। এরা ছিল তেরছা-চোখা, স্বল্পদাড়ি, দুর্বলচেতা, লোভী। এরা সেবলের চামড়া এবং নরম গদিযুক্ত রেশমের পোশাক পরত এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকত। তারা সে-সময়কার রুশদের চাইতে কম বর্বর ছিল। রুশদের জন্য তারা একপ্রকার মুদ্রা চালু করেছিল—যা খাজানা হিসেবে রুশরা আবার তাদেরই ফিরিয়ে দিত। কত খাজানা প্রাপ্য হল, তা নির্ধারণের জন্য একপ্রকার গণনার কল তারা রুশদিগকে সরবরাহ করত। রুশ গ্র্যান্ড প্রিন্সদের সনদ দেওয়ার জন্য একপ্রকার কাগজও তারা আবিষ্কার করেছিল।

রুশিয়া তাঁরা শাসন করতেন অনেক দূরে থেকে—ভল্‌গা নদীর তীরে অবস্থিত সরাই শহর এবং অস্ত্রাখান থেকে। রুশ সামন্তরাজারা খাজানা ও উপহারসহ সেখানে যেতেন। সময়মতো খাজানা না এলেই শুধু তাঁরা খাস রুশিয়ায় প্রবেশ করতেন। তখন বাড়িঘর পোড়ানো ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যেত এবং লুটের মাল জিনের ব্যাগে পুরে নিয়ে আসতেন।

পূর্ব-ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য ছিল তাঁদের হাতে। আকস্মিকভাবে পোলান্ডের উপর হামলা চালাতে তাঁদের দেরি হল না। এ-হামলার সেনাপত্য গ্রহণ করলেন একজন খান। তিনি এক গ্রিক সম্রাটের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। সরাইয়ের রাজদরবারে ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকদের এজেন্ট ছিল। সাম্রাজ্যের সবখানেই এদের ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

একমাত্র মস্কোর গ্র্যান্ড প্রিন্সই মোঙ্গল-শক্তির অগ্রগতিকে একটুখানি ব্যাহত করতে চেষ্টা করেছিলেন। দেড়লাখ তরবারিধারী রাশিয়ানের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি ডননদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে এ-সাম্রাজ্যের মামাইর সৈন্যবাহিনীর সাথে তাঁর বাহিনীর যে-যুদ্ধ হয়, তাতে মামাইর বাহিনী পরাজিত হয়। এটা রুশদের এক পরম গৌরবের দিন। কিন্তু এ-দিনের অবসান হয়ে যায় শিগ্‌গিরই। তখন তাদের বলতে শোনা গেল, 'আমরা যারা তরবারি ধারণ করেছিলাম, তারাই ভুগেছিলাম বেশি—এমনকি, আমাদের যেসব পিতৃপুরুষ বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের চাইতেও।'

সে-সময়ে তোক্‌তামিশ নামে ক্রিমিয়ার এক মোঙ্গল-গোষ্ঠীর সামন্ত-রাজা সোনালিবাহিনীর আওতা থেকে পালিয়ে গিয়ে তৈমুরের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁকে

অনুসরণ করে শাদা ঘোড়ায় চড়ে একজন দলপতি সোনালিবাহিনীর দূত হয়ে এসে হাজির হলেন তৈমুরের দরবারে। তিনি বললেন : 'পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, সরাই ও অস্ত্রাখানের অধিপতি, নীল ও শাদা মোঙ্গলদলের এবং শিবিরের খানদের হর্তাকর্তা উরুস খান আপনাকে বলতে আমায় বলেছেন, "তৈমুর লঙ!* তোক্তামিশ আমার ছেলেকে হত্যা করে আপনার আশ্রয় নিয়েছে। তাকে ফিরিয়ে দিন, নয়তো আপনার সাথে আমার যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধক্ষেত্রও ঠিক করা হবে।" '

তৈমুরও এইটাই চেয়েছিলেন। ইতঃপূর্বে সোনালিবাহিনীর চাইতে তাঁর অধিকার বৃহত্তর হয়ে গেছে। কে সবার বড়, তা প্রমাণের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। চেঙ্গিজ খানের রাজবংশের একজন তাঁর দিকে, এটা তাঁর সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক বলে তাঁর মনে হল। তিনি উত্তরে বললেন, 'তোক্তামিশ আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাকে আমি রক্ষা করব। উরুস খানকে গিয়ে বলো, আমি তাঁর কথা শুনেছি এবং সেজন্য তৈরিও আছি।'

তিনি তোক্তামিশের সম্মানার্থে ভোজ দিলেন এবং তাঁকে 'পুত্র' বলে সম্বোধন করলেন। উত্তরসীমান্তের দুইটি দুর্গ এবং কয়েকজন অফিসার ও কিছু সৈন্য তাঁর সাহায্যের জন্য দেওয়া হল। এই দুর্গ দুটি মোঙ্গলদের থেকেই দখল করে নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও, অস্ত্রশস্ত্র, সোনা, আসবাবপত্র, উট, তাঁবু, ড্রাম, নিশান এসবও তাঁকে সরবরাহ করা হল।

এইভাবে যুদ্ধার্থে সজ্জিত হয়ে তোক্তামিশ হামলা চালালেন, কিন্তু ভীষণভাবে পরাজিত হলেন। তৈমুর আবার তাঁকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দিলেন। কিন্তু আবার পরাজিত হয়ে তাঁকে একাকী তৈমুরের ঘোড়ায় শিরদরিয়া সাঁতরিয়ে পার হতে হল। বারলাস-গোত্রের একজন অফিসার তাঁকে উদ্ধার করে তৈমুরের দরবারে নিয়ে গেল। এরপর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

উরস খান এ-সময়ে মারা গেলেন। তোক্তামিশ সোনালিবাহিনীর সিংহাসনের প্রধান দাবিদার হয়ে দাঁড়ালেন। উত্তরাঞ্চলের গোত্রগুলোর অর্ধেকের সমর্থন পেয়ে এবং তৈমুরবাহিনীর একটা অংশের সাহায্য লাভ করে তাঁর শক্তি বেড়ে গেল এবং তিনি যুদ্ধে জয়ী হতে লাগলেন। তিনি ছিলেন একগুঁয়ে ও নিষ্ঠুর, আর তাঁর নীতির কোনো বালাই ছিল না। তৃণভূমির উপর দিয়ে তিনি কালবৈশাখির বেগেই এগিয়ে চললেন। তিনি মামাইকে বিতাড়িত করে ভল্‌গা-তীরে অবস্থিত রাজধানী সরাই শহর দখল করলেন।

রুশীয় সামন্ত-রাজাদের নিকট থেকে তিনি খাজানা দাবি করলেন। কিন্তু তাঁরা তখনো দুবছর আগেকার ডননদীর তীরে যুদ্ধজয়ের আনন্দে মত্ত; আত্মসমর্পণের এ-দাবির প্রতি তাঁরা কর্ণপাতও করলেন না। তোক্তামিশকে তাই যুদ্ধের আগুন ও

---

* তাঁর রাজ্যসীমার বাইরে তৈমুরকে তৈমুর লঙ বা খোঁড়া তৈমুর বলে ডাকা হত। যে-দুজন রাজা তাঁকে এই নামে অভিহিত করতেন, তাঁদের একজন ছিলেন উরুস খান। তিনি তখন সোনালি-বাহিনীর পূর্বদিকে অবস্থিত শ্বেতবাহিনীর খান। মামাই তখন সোনালি-বাহিনীর শাসক। কিন্তু পরে উভয় বাহিনীই তোক্তামিশের অধীনে সম্মিলিত হয়েছিল।

রক্তপাতের ভিতর দিয়ে তাঁদের উপর নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হল। গৃহদাহের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি মস্কো অবরোধ করলেন। মস্কো অগ্নিদগ্ধ হল; মস্কোর গ্র্যান্ড প্রিন্সের দুর্দশার সীমা রইল না। এরপর রাশিয়ার সামন্ত-রাজাগণের পুত্রেরা সরাইয়ে তোক্তামিশের দরবারে জামিনস্বরূপ এল, আর এল ব্যবসায়ের সুবিধা আদায়ের জন্য জোনোয়া ও ভেনিসের বণিকদল।

আবার ঘটনার চাকা ঘুরল। সোনালিবাহিনীর প্রভু তোক্তামিশ আর পলাতক তোক্তামিশ এক নন। তিনি সমরখন্দের মহিমা এবং তাতার দরবারের ঐশ্বর্য দেখেছেন। কৃতজ্ঞতার বালাই না রেখে এবং কিছুমাত্র সতর্ক না করে তিনি তৈমুরকে আক্রমণ করে বসলেন।

মনে হয়, তাঁর ওমরাহদের কেউ-কেউ তাঁকে এ-কাজে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তৈমুরের বন্ধুত্ব আপনার সহায়ক হয়েছে। খোদাই জানেন, আবার ভাগ্যের চাকা ঘুরবে কি না এবং আবার তাঁরই সাহায্যের দরকার হয়ে পড়বে কি না।'

কিন্তু তোক্তামিশ যুদ্ধে তাঁর নিশ্চিত জয় হবে বলে ধারণা করলেন। আর তা ছাড়া, যে-উরগঞ্জ অতীতে তাঁদের ছিল, তৈমুর তা দখল করায় মনে তাঁর ক্ষোভও ছিল। তোক্তামিশ যথেষ্ট প্রস্তুতি ও সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করেই যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। একদল সৈন্য তৈমুরের তখনকার কর্মস্থল ক্যাস্পিয়ান সাগরের কাছে পাঠানো হল। কিন্তু সে-সময়ে একজন শ্রান্ত ক্লান্ত কাসেদ ঘোড়া ছুটিয়ে তৈমুরের শিবিরে এসে পড়ল। সে সমরখন্দ থেকে সাতদিনে নয়শত মাইল অতিক্রম করে এসেছে। সে জানাল, তোক্তামিশ তাঁর মূল সৈন্যবাহিনীসহ শিরদরিয়া পার হয়ে সমরখন্দের অদূরে তৈমুরের জন্মভূমি আক্রমণ করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

তৈমুর খোরাসানের রাজপথ ধরে এত দ্রুতবেগে ফিরে চললেন যে, তোক্তামিশের পৌঁছানোর আগেই তিনি সমরখন্দে গিয়ে পৌঁছলেন।

কয়েকটি সীমান্ত-দুর্গ থেকে আক্রমণকারীকে বাধা দেবার চেষ্টা হল। তৈমুরের জ্যেষ্ঠপুত্র তখন ওমর শেখ। তাঁর সাথে তোক্তামিশের যে-যুদ্ধ হল, তাতে ওমর যথেষ্ট বীরত্ব দেখালেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন—তাঁর বাহিনীও পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তৈমুরের আগমন-সংবাদ যখন পৌঁছল, তখন তোক্তামিশের কাজ অর্ধসমাপ্ত মাত্র হয়েছে এবং তাঁর সৈন্যেরা হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। তারা বোখারার উপকণ্ঠে এক প্রাসাদ পুড়িয়ে শিরদরিয়ার ওপারে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু তৈমুরের জন্মভূমি আক্রান্ত হল এবং কিছুটা বিধ্বস্তও হল। বহু শস্যক্ষেত নষ্ট হল, কিছু ঘোড়াও বন্দি করে শত্রুপক্ষ নিয়ে গেল। তা ছাড়া সোনালিবাহিনীর আগমনে উৎসাহিত হয়ে তৈমুরের কয়েকজন সামন্ত-রাজা বিদ্রোহধ্বজা উত্তোলন করল। বামদিকে খানজাদের আত্মীয় উরগঞ্জের সুফিরা তৈমুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল। ডানদিকে জাট-গোত্রের অশ্বারোহীরা লুণ্ঠনে মেতে উঠল।

চূড়ান্ত সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠল। চেঙ্গিজ খানের রক্তবীজ, যাসার সমর্থক, যাযাবরদের বীরপুরুষ তোক্তামিশ তাঁর পক্ষে সমগ্র মোঙ্গলশক্তি সমাবেশ করলেন।

পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র গোত্রের এক দলপতির ছেলে তৈমুর মাত্র বশ্যতার সূত্রে আবদ্ধ তাঁর অনুগামী গোষ্ঠীগুলোর লোকদেরই তাঁর পক্ষে সমবেত করলেন।

ইতোমধ্যে তোক্তামিশ শৃগালের মতো দ্রুতবেগে তাঁর তৃণাঞ্চল ভূমিতে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছিলেন। তাঁর আক্রমণ কোথায় চলবে, তা বলবার উপায় ছিল না।

তৈমুর মোঙ্গলদের সাথে এই যুদ্ধে পরাজিত তাঁর সেনাপতিগণকে ডেকে পাঠালেন। যাঁরা এই পরাজয়ের মধ্যেও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের তিনি পুরস্কৃত করলেন। কিন্তু যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিলেন, নিজের ইচ্ছামতো তিনি তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। অপরাধীদের চুলে মেয়েদের মতো সিঁথি কাটা হল, তাদের মুখ রঞ্জিত করা হল শাদা ও লাল রঙে এবং মেয়েদের পোশাক পরিয়ে খালিপায়ে তাঁদের সমরখন্দের রাস্তা দিয়ে ঘোরানো হল।

এর পরে, সেই ভীষণ শীতে তোক্তামিশ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে শিরদরিয়ার দিকে এলেন। তৈমুরের এই অবস্থায় কোনো ইউরোপীয় রাজা হলে তিনি সমরখন্দে ফিরে যেতেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার কী অবস্থা হবে, এ ভেবে তাঁর কোনোরূপ মাথাব্যথা হত না। কিন্তু তৈমুর সে-ধরনের মানুষ ছিলেন না—দেয়ালের আড়ালে লুকানো ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ—এমনকি, কার্সি রক্ষা করতে গিয়েও তিনি তা করেন নাই।

তাঁর সঙ্গে তখন সামান্যসংখ্যক সৈন্য ছিল। বাকি সৈন্য পাঠানো হয়েছিল পূর্বাঞ্চলের গিরিপথ থেকে জাটদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সমরখন্দে ফিরে যাওয়া এবং সোনালিবাহিনীকে মুক্ত প্রান্তরে শীতের কষ্টে ভুগতে দেওয়া—এটাই হত তাঁর পক্ষে নিরাপদ কার্যক্রম। কিন্তু তোক্তামিশের মতো সেনানায়ককে দেশ চষে ফেলার সুযোগ দেওয়া ছিল বিপজ্জনক। উত্তরাঞ্চলের লোকদের পক্ষে শীতকালীন অভিযান গৃহবাসের মতোই সুবিধাজনক। তা ছাড়া এই সুযোগে সুফিদল ও জাটখানরা তাঁর সাথে মিলিত হতে পারত। তৈমুরের ওমরাহগণ অবশ্য দক্ষিণদিকে চলে যেতেই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং যতদিন-না তাঁর সেনাবাহিনীর সকলে একত্র হতে পারছে, ততদিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

কিন্তু তৈমুর বলেছিলেন, 'অপেক্ষা করব? কিন্তু কিসের জন্য অপেক্ষা করব? এ কি অপেক্ষা করার সময়?'

তিনি নিজে সেনাপতি হয়ে সৈন্যদলকে ভাগ করলেন এবং শিরদরিয়া পর্যন্ত যেতে তাদের আদেশ দিলেন। বৃষ্টি ও বরফের ভেতর দিয়ে তারা ঘোড়া চালাল। তারা শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করল। তোক্তামিশের সৈন্যশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে তাদের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তৈমুরের পরিচালন-কৌশলে তাঁর সৈন্যদের আচরণে শত্রুপক্ষের ধারণা ছিল যে, এক বিরাট বাহিনী এদের পেছনে রয়েছে।

তাঁকে পিছনদিক থেকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে দেখে তোক্তামিশের নিশ্চিত ধারণা হল যে, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী এদের পেছনে আসছে। এই শীতঋতুতে উত্তরদিকের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিপজ্জনক ভেবে তোক্তামিশ দ্রুতগতিতে পিছু হটে গেলেন। তৈমুর তখন শত্রুদলের অনুসরণ করতে তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন।

বসন্তকালে রাস্তাগুলো শুকিয়ে গেলে তিনি স্বয়ং সৈন্যসহ অগ্রসর হলেন। কিন্তু অগ্রসর হলেন পশ্চিমদিকে। সুফিদের এলাকা আক্রমণ এবং উরগঞ্জ অবরোধ করলেন তিনি। শহরের অধিবাসীগণকে বেপরোয়াভাবে হত্যা করা হল। এবার আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ নয়! শহরের দেয়াল বিস্ফোরক মাইন দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হল। প্রাসাদ ও হাসপাতালগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হল। পোড়া মানুষের গন্ধে ও ধোঁয়ায় স্থান পূর্ণ হল। যারা বেঁচে রইল, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সমরখন্দে।

এরপর সে-স্থান ত্যাগ করে তিনি পূর্বদিকে চললেন। জাট-গোত্রের লোকদের তিনি তাড়িয়ে নিয়ে চললেন আলমালিকের দিকে। তাদের সেখানে এমন শিক্ষা দেওয়া হল যে, বহুবছর পর্যন্ত তারা আর তাঁর সীমারেখায় এসে গোলমাল সৃষ্টির সাহস করে নাই।

তাঁর রাজ্যের সীমানা থেকে যতদিন-না শত্রুর চিহ্ন মুছে গেল, ততদিন তিনি তোক্তামিশের সাথে ঝগড়া বাধালেন না। তাঁর রাজ্যে সোনালিবাহিনীর হামলার প্রতীক্ষা না করে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীর সংগঠনে মনোযোগী হলেন এবং সমরখন্দের পার্শ্ববর্তী মুক্ত-প্রান্তরে নিজ সৈন্য সমাবেশ করলেন। তিনি তাঁর মতলব তাদের কাছে খুলে বললেন। তিনি চান উত্তরে সোনালিবাহিনীর রাজ্যে অভিযান করতে এবং সেখানেই তোক্তামিশকে আক্রমণ করতে।

১৬
তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের পথে

এ-সিদ্ধান্ত একটা বিপদ ডেকে আনল। এর চারশত বছর পরে নেপোলিয়নের অনুরূপ সিদ্ধান্তের ফলে মস্কোজয় হয়েছিল বটে, কিন্তু ফ্রান্সের বিশাল বাহিনী রাশিয়ান ও পোল্যান্ডের বরফে মারা গিয়েছিল।

তৈমুরের সাথে তখনো পর্যন্ত সোনালিবাহিনীর মুখোমুখি মোকাবিলা হয় নাই। তোক্তামিশের সৈন্যসংখ্যা ছিল তাঁর চাইতে বেশি এবং অধিকদ্রুতগমনশীল। কারণ প্রচুরসংখ্যক সজীব ঘোড়ার সরবরাহে সেখানে কোনোরূপ অসুবিধা ছিল না। পানি ও খাদ্যের অভাব না হলে তৈমুরবাহিনীর পক্ষে দেশের বাইরে অবস্থান অসুবিধাজনক ছিল না বটে, কিন্তু সোনালিবাহিনী কয়েক পুরুষ ধরেই ছিল বিদেশবাসে অভ্যস্ত।

সেখানে প্রবেশ করতে গেলে তৈমুরকে মরুভূমি, পাহাড় ও কর্দমাক্ত তৃণভূমির উপর দিয়ে পথ করে যেতে হবে। এরূপ পথে দু-তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আর তখন যদি তোক্তামিশের সাথে তাঁকে যুদ্ধ চালাতে হয়, তা হলে তাঁকে অনুর্বর ভূমি পিছনে রেখেই তা করতে হবে। সেক্ষেত্রে পরাজয়ের পরিণাম হবে তাঁর অধিকাংশ সৈন্যের মৃত্যু—এমনকি, সম্ভবত তাঁর নিজের মৃত্যুও।

১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে পিটার দি গ্রেট দক্ষিণদিকে খিভা ও তুর্কম্যানদের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের উপর দিয়েই একদল রুশসৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তাতে রুশপক্ষের সেনাপতি

প্রিন্স বেকোভিচ চারকাশি মরুভূমিতে তাঁর অধিকাংশ সৈন্যসহ মৃত্যুবরণ করেন এবং বাকি সৈন্য ক্রীতদাসে পরিণত হয়। তার এক শতাব্দী পরে এক শীতকালে প্রিন্স পেট্রোভস্কির অধিনায়কতায় আর-একদল সৈন্য সে-চেষ্টা করে। তাদেরকে প্রচুর পানি সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। পরবছর স্বল্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল। দশ হাজার উট, প্রায় সমসংখ্যক গাভী এবং সৈন্যদলের একটি বিরাট অংশ পিছনে বরফাচ্ছাদিত প্রান্তরে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

এশিয়ার এইসব অঞ্চল এখনো সর্বপ্রকার আক্রমণ-বাহিনীর পক্ষে নিষিদ্ধ স্থান হয়ে রয়েছে। তৈমুরও সেখানে যেতে পারলেন না। সোজা পশ্চিমদিকে কাস্পিয়ান সাগরের চারপাশে গিয়ে তিনি সোনালিবাহিনীর কয়েকটি শহর আক্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই, মানে ককেশাস উপত্যকায় তৈমুরের প্রবেশের পূর্বেই যে তোক্তামিশ সমরখন্দ দখল করে ফেলবেন না, তার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। তা ছাড়া তৈমুরের পক্ষে এ-সম্পর্কে সঠিক ধারণা করাও কঠিন হল যে, তোক্তামিশের সাথে কোথায় তাঁর মোকাবিলা হতে পারে—মরুভূমিসীমান্তে, না, কৃষ্ণসাগর থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে কিংবা বালটিক সাগরের ধারে, অথবা সূর্যোদয়ের দেশ গোবি সাহারায়। সত্যি বলতে কি, তোক্তামিশের কার্যক্রম ছিল বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত। তৈমুরের কাসেদরা এ-ব্যাপারে সঠিক 'হদিশ' দিতে পারছিল না। ফলে সোনালিবাহিনীর সন্ধানলাভের আগে তৈমুর তাঁর বাহিনীসহ কেবল ভুলপথে দৌড়াদৌড়ি করলেন।

সবরকম সামরিক কৌশলের দিক দিয়েই তিনি ভুলপথে এগিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু তিনি সামলে নিলেন। মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তিনি অগ্রসর হলেন—বাহবালাভের সস্তা পথ ত্যাগ করলেন। তোক্তামিশ তাঁর দরবারে কিছুকাল বাস করেছিলেন এবং দু-দুবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন—এসব কথা তাঁর মনে পড়ল। কাজেই তাঁর মেজাজ ও কার্যক্রমের সবলতা ও দুর্বলতা কোথায়, তৈমুর তা ভালো করেই বুঝতে পারলেন।

একথাও তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন, খানের মতো অশ্বারোহী-বাহিনীর একজন কৌশলী সেনাপতির সাথে যুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত জয়লাভ অসম্ভব। আরো বুঝলেন, যতদিন তোক্তামিশ উত্তরাঞ্চলের মালিক হয়ে থাকবেন, ততদিন সমরখন্দের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নাই। কাজেই যেখানে তাঁর আক্রমণ একেবারে অপ্রত্যাশিত বলে তোক্তামিশের ধারণা, তেমন স্থানেই, মানে একেবারে সোনালিবাহিনীর এলাকার ভেতরে ঢুকেই যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ধারণকল্পে তৈমুর সবরকম ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এটা খুবই পরিষ্কার যে, তৈমুর তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে তিনটি নীতি অনুসরণ করে এসেছেন (১) তাঁর কোনো অভিযান-পরিকল্পনায়ই তিনি নিজ জন্মভূমিকে জড়িত হতে দেন নাই; (২) তাঁর কোনো যুদ্ধ-প্রচেষ্টাই আত্মরক্ষামূলক হয় নাই এবং (৩) যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে আক্রমণ পরিচালনা তিনি করেছেন।

তিনি বলতেন, 'দশ হাজার সৈন্যসহ যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকার

চাইতে মাত্র দশজন নিয়েও সেখানে উপস্থিত হওয়া ঢের লাভজনক।' আরো বলতেন, 'শত্রুপক্ষ সমগ্র সৈন্য সমাবেশ করার আগেই দ্রুতগতিতে তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া ভালো। রাস্তায় যে-পরিমাণ সৈন্যের ভরণপোষণ সম্ভবপর, তার চাইতে বেশিসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অভিযান করা উচিত নয়।'

অভিযানের প্রথম দিকে, যতদিন-না তারা কর্দমাক্ত শিরদরিয়া পার হয়ে গেল, ততদিন পরিচিত জায়গা দিয়ে তারা চলেছিল। তারা এক সীমান্ত-দুর্গ থেকে অন্য সীমান্ত-দুর্গের দিকে যেতে-যেতে ক্রমে কারাটাগ পার্বত্য উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল। তখন ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হয়ে এসেছে। তুষারঝঞ্ঝা ও বৃষ্টির জন্য তারা শিবির থেকে বের হতে পারছিল না। তেমন সময়ে তোক্তামিশের নিকট থেকে দূত এল তৈমুরের কাছে—নয়টি সুন্দর ঘোড়া এবং মুক্তার কণ্ঠ-কবচ-বাঁধা একটা বাজপাখি উপহার নিয়ে।

তৈমুর বাজপাখিটাকে হাতের কবজার উপর উঠিয়ে নিলেন এবং নীরবে দূতগণের বক্তব্য শুনলেন। মনে হল, তোক্তামিশ সমরখন্দের আমিরের কাছে তাঁর বাধ্যবাধকতার কথা এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার ভুল স্বীকার করেছেন। আর তৈমুরের সাথে একটা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। এ-যে একটা কূটনৈতিক চাল মাত্র এবং সেই হিসেবেই একে গ্রহণ করা উচিত, তাতে কারুর ভুল হবার কথা নয়।

তৈমুর দূতদের বললেন 'যখন তোমার প্রভু শত্রু কর্তৃক আহত ও নির্যাতিত হয়েছিল, সবাই জানে, তখন আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং 'পুত্র' বলে ডেকেছিলাম। উরুস খানের বিরুদ্ধে আমি তার হয়ে যুদ্ধ করেছি এবং তাতে আমার বহু অশ্বারোহী সৈন্য মারাও গেছে। কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করেই সে ভুলে গেল এসব কথা। আমি যখন ইরানে, সেই সুযোগে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার বহু নগর ধ্বংস করে। সেই থেকে সে আমার রাজ্যে আরো শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠিয়ে হামলা চালিয়ে আসছে। আর এখন আমাকে অভিযান করতে দেখে, শান্তির হাত এড়াবার ইচ্ছা তার মনে জেগেছে। বহুবার সে তার শপথ ভেঙেছে। এখন যদি সে সত্যি আন্তরিকভাবে শান্তি-অভিলাষী হয়ে থাকে, তবে আমার ওমরাহদের সাথে সে-সম্পর্কে আলোচনা চালানোর জন্য আলিকে ডেকে পাঠাতে হবে।'

সোনালিবাহিনীর প্রধান উজির আলি বে কিন্তু এলেন না। আর উত্তরদিকে তৈমুরের অভিযানও বন্ধ রইল না। রাজপরিবারের বেগমদের কিছুসংখ্যক অফিসারের সাথে সমরখন্দে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অফিসারগণ রাজধানী রক্ষাকল্পে নিয়োজিত থাকবে বলে স্থির হল। আর তৈমুরবাহিনী পাহাড়ের আশ্রয়স্থল থেকে শাদা বালুর দেশের দিকে রওনা হয়ে গেল।

তিন সপ্তাহ ধরে সৈন্যবাহিনী বায়ু-সঞ্চালিত বালির পাহাড়ের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। শীতঋতুর অবসান হলেও এখনো সে-স্থানের নীরসতা ও নির্জীবতা দূর হয় নাই। ভোর হওয়ার আগে প্রচণ্ড শীতে সাত ফুট লম্বা তুরি 'কাউরুনে'র আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠত আর সৈন্যদল জিন কষে ঘোড়ায় চেপে বসত। তাঁবুগুলোকে মানুষের চাইতেও উঁচু চাকাওয়ালা ভারী গাড়িগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হত।

গাড়িগুলোর পাশে পাশে চলত বোঝার ভারে নানারূপ শব্দ করতে করতে উটের সারি। গাড়িগুলোকে চাপানো হত সৈন্যদলের নানাশ্রেণীর সাজ-সরঞ্জাম—দশজনের বাসোপযোগী তাঁবুর যাবতীয় আসবাবপত্র—বর্শা, কুঠার, শিকল, ভারী দড়ির বান্ডিল, রান্নার পাত্র এসব সহ। খাদ্যসম্ভারের মধ্যে ছিল ময়দা, বার্লি, শুকনো ফল এই শ্রেণীর জিনিস। শাদা বালুকার রাজ্যে প্রবেশের পর প্রতি সৈনিকের জন্য বরাদ্দ হল মাসে ষোলো পাউন্ড করে ময়দা। প্রত্যেককে একটা করে অতিরিক্ত ঘোড়া সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হল। সবাই ছিল অশ্বারোহণে এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত—তাদের বর্মের সাথে বাঁধা ছিল উরুস্ত্রাণ, ছিল শিরস্ত্রাণ, ঢাল এবং দুটো করে ধনুক। একটা ধনুক দূরে তীরনিক্ষেপের জন্য, অন্যটা দ্রুত তীরচালনার জন্য। প্রত্যেক সৈন্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ত্রিশটা তীর, খঞ্জর বা দুধারী তলোয়ার, আর তাদের নিজস্ব পছন্দের অতিরিক্ত অস্ত্রাদি। বাহিনীর অনেকেরই ছিল কাঁধে-গুঁজে-রাখা লম্বা বল্লম। কেউ-কেউ আবার ভারী খাটো বর্শাও পছন্দ করত।

সৈন্যবাহিনী একটা নির্দিষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ আকারে গঠিত হয়ে চলত। এবং সে-গঠন ঠিক রেখেই তারা শিবির স্থাপন করত। বিচ্ছিন্ন আকারে অবস্থান হত আত্মহত্যাতুল্য। প্রত্যেক অফিসারের অবস্থান ছিল আমির তৈমুরের থেকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ও দূরত্বে। কাজেই অন্ধকারেও একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কার কারণ ছিল না। যদিও তারা সহজভাবেই অশ্বারোহণে চলেছিল, তবু বিভিন্ন দলের পরিচালক 'তুমান'গণ তাদের সৈন্যগণকে মোটামুটিভাবে একটা যুদ্ধের অবস্থায় প্রস্তুত রেখেছিলেন। এই বহুদূরবিস্তৃত বাহিনী তাদের ঘোড়াগুলোকে বালির উপর কোথাও সামান্য ঘাসের দেখা পেলে, তা খেতে দেওয়ার সুযোগ দিত।

দুপুরের ঘণ্টাখানেক আগে আবার 'কাউরুন' বেজে উঠত এবং ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বাহিনী থেমে যেত। পানির অভাবে ইতঃপূর্বেই দুর্বল পশুগুলো মরণাপন্ন হয়ে উঠত। বিকেলশেষে অগ্রবর্তী স্কাউটদের নির্বাচিত স্থানে ছাউনি ফেলা হত। তৈমুরের সোনালি রঙের অর্ধচন্দ্র আঁকা ঘোড়ার লেজমার্কা নিশান শামিয়ানার সম্মুখভাগের দলের সাথে বাঁধা হত। আর চারপাশে তাঁর পরদা-ঘেরা তাঁবুর প্রাসাদ গড়ে তোলা হত।

তারপর শুরু হত একটা বিরাট আলোড়ন—তাতারসৈন্যদের আশ্রয়স্থান গ্রহণের দৃশ্য। প্রতি সৈন্যবাহিনী যখন তাদের দলপতিদের পরিচালনায় এসে তাদের নির্দিষ্ট শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকত, তখন প্রতিবার বাদ্য বেজে উঠত। তারপর বাহিনীর এইসব দলপতিরা ঘোড়া থেকে নেমে নির্দিষ্ট অফিসারদের সাথে দেখা করে হাজির হত গিয়ে তৈমুরের কেন্দ্রীয় শিবিরে—সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি, পাইপ এবং শিঙা প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়ে যেত তাদের বাদকদল। পাইপের তীক্ষ্ণ ও মধুর সুরে ঘোড়াগুলো আনন্দে লাফাত। করতালের তালে তালে একদল নির্বাচিত গায়ক পিছনদিকে মাথা হেলিয়ে ও চক্ষু বুজে যুদ্ধে সাহস ও আনন্দ-উদ্দীপক গান গাইত। সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় ঘোড়সওয়ার ওমরাহগণ মাথা দোলাতে দোলাতে তৈমুরের তাঁবুর দিকে চলে যেত। রৌপ্যখচিত লাগাম আন্দোলিত করে গম্ভীরকণ্ঠে তারা সম্ভাষণ জানাত, : 'হোর-রা'!

সর্বশেষ বাহিনীর সেনাপতি এসে পৌছলে তৈমুর ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেন এবং তাঁর দলবলসহ আহার করতে যেতেন। মরুভূমিতেও তৈমুর সবচাইতে মূল্যবান রেশম ও সাটিনের কাপড়ে সজ্জিত থাকতেন।

অন্ধকার হয়ে এলে অভিযানের পরিদর্শকগণ লণ্ঠনের আলোতে তাঁদের রিপোর্ট নিয়ে আসতেন তৈমুরের কাছে। এই রিপোর্ট সংগ্রহ করা হত স্কাউটদের থেকে। তারা চারদিকে এগিয়ে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করত। ঘোড়াগুলোর অবস্থা এবং অসুস্থদের খবরও সে-সময়ে তৈমুরকে জানানো হত।

বালির উপর দিয়ে দ্রুতবেগে তাঁর বাহিনী চলেছিল। গতি শ্লথ করা কিংবা কোথায়ও দেরি করা তৈমুর বরদাশ্‌ত করতেন না। যে পিছনে পড়ে যেত, তাকে তার জুতা বালিতে পূর্ণ করে তা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হত এবং খালিপায়ে হেঁটে চলতে হত। আবার পিছিয়ে পড়লে সে মারা যেত। তিন সপ্তাহের শেষে তারা কুয়াশাচ্ছন্ন তৃণভূমিতে প্রবেশ করল। সেখানে এক বন্যাস্ফীত নদীর পাড়ে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেবার জন্য তারা ছাউনি ফেলল। দল বেঁধে তারা নদীতে সাঁতার কাটল। এই নদীর নাম 'সারি-সু'—যার মানে হচ্ছে হলদে পানি।*

এই প্রান্তরের বিশালতা দেখে তারা তাজ্জব হয়ে গেল। এ যেন সাগরের তরঙ্গায়িত একঘেয়েমি। ক্রমে তারা দুটি পাহাড়ের সন্নিহিত হল—তার মধ্যে একটি বড়; আর অন্যটি ছোট। বড় পাহাড়টিতে উঠে তৈমুর ও তাঁর অফিসারগণ দূরে দৃষ্টি-সঞ্চালন করলেন। দেখলেন, পাহাড়ের ছায়ার ওপাশে সবুজ তৃণভূমি প্রসারিত হয়ে আকাশের সাথে মিশেছে। তখন এপ্রিল মাসের শুরু। তৃণভূমির সবুজের সাথে একজাতীয় ফুলের নীল মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। বুনো গমগাছের ভিতর দিয়ে তিতির পাখি লুকোচুরি খেলছে, ঈগল পাখি মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। কুয়াশার নেকাবের ভিতর দিয়ে দূরবর্তী বন্যাস্ফীত হ্রদের স্বর্ণাভা জ্বলছে। ইতিহাসকার বলছেন, 'সুদীর্ঘকালের মধ্যে একটি মানুষ কিংবা একটি চষা ক্ষেতও তাদের নজরে পড়ে নাই।'

তবে কিছু-কিছু চিহ্ন দেখা গেল, আর্দ্র মাটিতে উট চলার পথ, আগুনের ভস্মাবশেষ, কিংবা ঘোড়ার বিষ্ঠা। এখানে-সেখানে তারা মানুষের হাড় মাড়িয়েও গেল। এসব হাড় শীতকালীন ঝড়ে অগভীর কবর থেকে ভেসে এসেছে বলে মনে হল।

এখন প্রতিদিনই বাহিনী থেকে এগিয়ে গিয়ে একদল তাতার শিকার করতে লাগল। তারা ভালুক, নেকড়ে, এন্টিলোপ এসব শিকার করে আনত। মাংসের অভাব তখন প্রচণ্ড—একটা ভেড়ার দাম একশত দিনার। তৈমুর আদেশ দিলেন, রুটি তৈরি করা বা মাংস রান্না করা আর চলবে না। মাংসের একপ্রকার স্টু দিয়ে ময়দা খেতে হবে। ও থেকেই আবার সবজি দিয়ে একটা ঘন সুরুয়া তৈরি করা সম্ভব হল।

সৈন্যদের একটুখানি উৎসাহিত করার জন্য তৈমুর নিজে তাদের সঙ্গে একত্র বসে

---

* তখন কোনো মানচিত্র ছিল না। ইউরোপের বর্তমান মানচিত্রে এই তৃণভূমির উল্লেখ অস্পষ্ট। তৈমুরের গতিপথ গবেষণার বিষয় হয়ে পড়েছে। মনে হয়, 'সারি-সু' নদী পার হয়ে তিনি কিছুটা পশ্চিমদিকে উরল পর্বতের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আহার করতে লাগলেন। ক্রমে দৈনিক আহার মাত্র একবারে সীমাবদ্ধ হল। মওজুদ ময়দা শেষ হয়ে এল।

তবে প্রচুর ঘাসের জন্য ঘোড়াগুলো তাজা হয়ে উঠল। কিন্তু খাদ্যের জন্য ঘোড়া হারানো চলে না। অবস্থা যখনই ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠল, অফিসারগণ ভবিষ্যতের ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই সঙ্কটে তৈমুর তাঁর তাবাচিগণকে আদেশ দিলেন, দুই পাশের সৈন্যদলগুলোর সেনাপতিদের জানিয়ে দাও, তারা যেন তাদের লোকদের শিকারের এক বিরাট চক্র হিসেবে নিজেদের আরো বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে দেয়।

এ-পর্যন্ত অগ্রগামী অশ্বারোহীরা যা-কিছু শিকার পেত নিয়ে আসত। এখন প্রায় একলাখ লোক লাইনবন্দিভাবে ত্রিশ মাইল জায়গা জুড়ে নিজেদের ছড়িয়ে দিল। এখন বাহিনীর কেন্দ্রস্থল নিশ্চল রইল বটে, কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত সারিবদ্ধ সৈন্যদল অর্ধচক্রাকারে এগিয়ে চলল মাঝখানে দুই কোণ একত্র হওয়ার জন্য এবং অন্য দলগুলো চারদিকে পরিক্রমণ করে উত্তরদিকের ফাঁক পূরণ করতে লাগল।

এরপর একটি খরগোশও এই অর্ধাহারক্লিষ্ট তাতারদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে পারল না। পশুগুলো যেই বুঝতে পারল যে, তাদের জন্য বেড় দেওয়ার আয়োজন হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার এক ভীষণ দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এমন কতগুলো পশু তাদের বেড়াজালে ধরা পড়ল, যা দেখে তারা তাজ্জব হল। ইতিহাসকার বলছেন, 'মহিষের চাইতেও বড় একপ্রকার হরিণ ধরা পড়ল। এ-প্রাণী এর আগে আর কখনো তারা দেখে নাই। যাহোক, তৈমুরই চক্রের ভিতরে ঢুকলেন এবং তীর ছুড়ে হরিণ ও এন্টিলোপ শিকার করলেন।

এর পর থেকে খাবার কষ্ট তাদের ঘুচল। তাতারগণ কেবল মোটা মোটা পশুগুলোই শিকার করত এবং পেট পুরে খেত। কিন্তু তৈমুর তাদের অলস হয়ে বসে থাকার সময় দিলেন না। পরদিন তাবাচিরা ঘোড়ায় চড়ে সকলকে তৈমুরের আদেশ জানাল। সব দলের সৈন্যগণকে একত্র সমবেত হতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। একঘণ্টা পরে সৈন্যসমাবেশে এসে পৌঁছলেন তৈমুর—মাথায় ছিল তাঁর রুবি-খচিত পাগড়ি, হাতে ছিল আইভরি কাঠের দণ্ড। দণ্ডটির শীর্ষদেশে সংযুক্ত ছিল সোনায় মোড়ানো বলদের মাথার খুলি। আর পিছনে ছিল তাঁর অফিসারদল। তিনি এলে সৈনিক-সরদারগণ নেমে দাঁড়িয়ে মাথা নত করলেন। তৈমুরের পিছনে পিছনে তাঁরা পায়ে হেঁটে চললেন তাঁদের অধীন সৈন্যদের কাছে। সুদীর্ঘ সারির শেষ পর্যন্ত তাঁরা সৈন্যদের অবস্থার বিবরণ তৈমুরকে শুনাতে শুনাতে গেলেন। তৈমুর চেয়ে দেখলেন। অনেক মুখই তাঁর পরিচিত—তামাটে বারলাস, শীর্ণ সেলজুক তুর্কি, সৈনিকোচিত জালাইর এবং বদখশানের পার্বত্যদল—যাদের সাথে 'দুনিয়ার ছাদের উপর' তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল।

সৈন্যদের দেখে কিন্তু তিনি তেমন খুশি হতে পারলেন না। দিনের শেষভাগে নিশান-সংলগ্ন ভেরি বজ্ররবে বেজে উঠল। শিবিরের অন্যসব ড্রামও এর উত্তরে বাজল। তখনই অশ্বারোহী-বাহিনী সমাবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে আবার যুদ্ধোন্মুখ দলের গঠনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সম্ভবত ইতঃপূর্বে আর কখনো সাইবেরিয়ার এই তৃণভূমিতে বিরাট সৈন্যসমাবেশের এ-ধরনের পরিদর্শন হয় নাই। অফিসারগণ

নিজের নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেলেন। কয়েক মাইলব্যাপী সারিবদ্ধ সৈন্যদলের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত এক সমবেত ধ্বনি উত্থিত হল : 'হোর-রা!'

সৈন্যবাহিনীর অবস্থা খুবই ভালো সন্দেহ নাই। পরদিন আবার অগ্রগমন শুরু হয়ে গেল।

১৭
ছায়ার রাজ্য

ঘন কুয়াশা যেন স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল। সবুজধূসর এলডারগুচ্ছ সেই স্রোতে জমে গিয়ে শ্যাওলায় পরিণত হচ্ছিল। তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া হয়ে পড়েছিল কঠিন। সর্বত্র বিরাজ করছিল নিঃশব্দতা। বাজপাখি চারাগাছের উপর উড়ছিল বটে, কিন্তু সূর্যকে অভিনন্দন জানানোর জন্য কোনো গায়কপাখি সেখানে দেখা যায়নি। আকাশও সেখানে সমরখন্দের রাজকীয় নীল আকাশের মতো ছিল না। কখনো কখনো কুয়াশার ভিতর দিয়ে ছোট ছোট মাটির ঢিপি দেখা যাচ্ছিল—হয়তো এগুলো ছিল কোনো হতভাগ্যের কবর বা কারু ঠেলাগাড়ির ভগ্নাবশেষ।

এ-স্থান সম্পর্কে ইবনে বতুতা বলেছেন, 'একে ছায়ার রাজ্য বলা হয়। যেসব বণিক এখানে তাদের জিনিস ফেলে অন্যত্র চলে যায়, ফিরে এসে তারা আর সেসব জিনিস পায় না—পায় ফার-পশুর লোম ও চামড়া। এখানকার অধিবাসীদের কেউ দেখতে পায় না। এখানে গ্রীষ্মকালে দিন এবং শীতকালে রাত্রি দীর্ঘ।'

এখানে অতি উত্তরে তিমিরাবৃত মানুষেরা বাস করে। তারা সম্ভবত তৈমুরবাহিনীর আগমনের আভাস পেয়েই সেখান থেকে সরে পড়েছে। দক্ষিণদিকে তোক্‌তামিশ তাঁর পথ থেকে পশু ও লোকজন সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তৈমুরবাহিনী এখন যেখানে প্রবেশ করল, মনে হয়, জনবসতি সেখানে কখনো ছিল না।*

ইতিহাসকার বলেন, 'যেসব স্কাউটকে সংবাদসংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছিল, তারা এই বিরাট মরুভূমিতে ভবঘুরের মতো শুধু ঘুরে বেড়াল। এটা অবশ্য ঠিক মরুভূমি ছিল না; তবে যারা কুয়া ও নদীর দেশে আগুনে আলোতে কাদার ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত, সেই তাতারদের কাছে মানুষের বসতিহীন এই বিশাল ধূসর কুয়াশাসিক্ত প্রান্তর ভয়াবহ বলে মনে হল। বিশেষ করে, দৈনিক নামাজ আদায়ের অসুবিধায় পড়ে মোল্লারা একেবারে ঘাবড়ে গেল। সকালের দিকে কয়েকঘণ্টা ধরে সূর্যের আলো দেখা যেত না বলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফজরের নামাজের আজান দেওয়া হত। রাত্রিকাল ছোট ছিল বলে ঘুমাবার সময় পাওয়া যেত খুবই কম।

---

* তাঁরা এখন অক্ষরেখার ৫৫ ডিগ্রির দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। এ-স্থান উইনিপেগ হ্রদের তীরে অবস্থিত। এর ফোয়ারার উত্তরদিকে তবল নদী তাঁরা অতিক্রম করেছিলেন। এর পরেই সম্ভবত ছিল উরাল নদী। উরাল থেকে তাঁরা পশ্চিমদিকে ঘুরেছিলেন। এইখানেই তাঁরা ইউরোপের সীমান্ত পার হয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে ইমামগণ এক বৈঠক ডেকে ঠিক করলেন, নামাজের সময়ের পরিবর্তন করা চলবে। ইতোমধ্যে তৈমুর কুড়ি হাজারের এক ডিভিশন সৈন্যকে সোনালিবাহিনীর সন্ধানে নিযুক্ত করলেন। বাহিনীর প্রায় সব বড় অফিসারই এই অগ্রবর্তী ডিভিশনের সাথে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তৈমুর তাঁর তরুণ যোদ্ধা পুত্র ওমর শেখকে এ-দলের ভার দিলেন। কুড়ি হাজারের এই অগ্রবর্তীদল প্রান্তরের উপর দিয়ে সকলের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। কয়েকদিন পরে একজন বার্তাবহ ঘোড়সওয়ার খবর নিয়ে এল যে, অগ্রবর্তী দল এক বিশাল নদীর উপকূলে পৌঁছে গেছে। পরেপরেই আরেকজন বার্তাবহের খবরে জানা গেল, পাঁচ-ছয়টি স্থানে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে—সে-আগুন তখনো নেভেনি।

শত্রুদলের অবস্থানের এ-ই প্রথম সুস্পষ্ট সূত্র পাওয়া গেল। তৈমুর এর সদ্ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না। তিনি অভিজ্ঞ স্কাউটদের ডাকলেন। তাদের পাঠিয়ে দিলেন তিনি তাঁর পুত্রের অনুসরণে—তৃণভূমি তন্নতন্ন করে অনুসন্ধানের জন্য। ক্ষুদ্র একদল সঙ্গী নিয়ে তিনি নিজেও তাদের পিছনে পিছনে চলে গেলেন। দেখা গেল, সে-নদীটা হচ্ছে তবল নদী—উত্তর মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। আর পশ্চিমদিকের দূরবর্তী তীরে সেই আগুনটা জ্বলছে। তৈমুর সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে অগ্রবর্তী সৈন্যদলে পৌঁছলেন এবং স্বয়ং তার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করলেন।

স্কাউটরা খবর নিয়ে এল যে, গত একদিনের মধ্যে কাছেই প্রায় সত্তরটি আগুন জ্বলতে দেখা গেছে এবং সেখান দিয়ে ঘোড়াও চলে গেছে। তৈমুর তখন শেখ দাউদ নামে একজন হামলা চালানোয় ওস্তাদ ও নানা অদ্ভুত কাজে দক্ষ তুর্কম্যানকে ডেকে পশ্চিমদিকে অনুসন্ধান চালাতে আদেশ দিলেন। শেখ ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। দুদিন দুরাত্রির চেষ্টায় তার অভীষ্ট সিদ্ধ হল। সে কতকগুলো কুঁড়েঘরের সন্ধান পেল। জায়গাটার চারপাশে সে ঘুরে দেখল। সারারাত সে লুকিয়ে রইল। সকালের দিকে সে একজন অশ্বারোহীকে তার দিকে আসতে দেখল। সে তাকে সহজেই কাবু করে বেঁধে ফেলল। তাকে নিয়ে সে তার অগ্রবর্তীদলের দিকে চলল। সে-দল তখন আরো নিকটে এসে পড়েছিল। বন্দি কিন্তু তোক্তামিশ সম্পর্কে কিছুই জানত না। সে শুধু তার বাড়ির ধারে বুনো ঝোপে দশজন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে থাকতে দেখেছে।

ওই দশজন অশ্বারোহীকে ঘিরে ফেলবার জন্য ষাটজন তাতার অশ্বারোহীকে আদেশ দেওয়া হল। তারা ধরা পড়ল এবং তৈমুর তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করলেন। বন্দিরা জানাল, সেখান থেকে পশ্চিমদিকে ঘোড়ায় চড়ে সাতদিন ধরে পথ চললে যে-স্থান পাওয়া যায়, সেখানে শিবির স্থাপন করে রয়েছে তোক্তামিশের সোনালিবাহিনী।

উত্তরদিকে তৈমুরের এই সুদীর্ঘ অভিযানের কথা শুনে আধুনিক সমরবিদগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়বেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৈমুরের এ-যুদ্ধ ছিল নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এক্ষেত্রে কোনোরূপ দুর্বলতা দেখানো বা সোনালিবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের মোকাবিলা করা হত তাঁর পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। তৈমুর জানতেন যে, অদৃশ্য চক্ষু তাঁর অগ্রগতি লক্ষ করছে এবং খান তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে

ওয়াকিবহাল। তৈমুরের কাছে সময়ের মূল্যই ছিল সবচাইতে বেশি। হয় মোঙ্গলবাহিনীকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে হবে, কিংবা গ্রীষ্মকাল শেষ হওয়ার আগেই তাঁর নিজের বাহিনীকে একটা জনপদের মাঝে নিয়ে যেতে হবে। দেরি করাতেই তোক্‌তামিশের লাভ এবং সে-লাভ সে পুরামাত্রায়ই চায়।

উত্তরদিকে তৈমুরের দ্রুত অভিযানের ফলে মোঙ্গলবাহিনী বেশকিছুটা বেকায়দায় পড়ে গেল। তারা তৈমুরের বিপরীত দিকে গতি পরিবর্তন করতে এবং তৈমুর ও তাদের দেশের মধ্যবর্তী স্থানে নিজেদের অবস্থিত করতে বাধ্য হল। ইতোমধ্যে সুদূর পশ্চিমের ভল্‌গা থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সমগ্র তৃণাঞ্চল থেকে উপজাতীয়দের সমবেত করা হল। পূর্ণশক্তি সমাবেশ করা সম্ভব হলে তৈমুরের সৈন্যসংখ্যার চাইতে দ্বিগুণ-সংখ্যক সৈন্য তোক্‌তামিশ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করতে পারতেন।

এর পরে শুরু হল তৃণাঞ্চলের যোদ্ধাসুলভ যুদ্ধের পাঁয়তারা। যে-শত্রু একদিনে একশত মাইল পাড়ি দিতে পারে, আক্রমণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যে-শত্রু অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে, তার মোকাবিলা করতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন খুবই প্রয়োজন। তৈমুরের কার্যকলাপে প্রমাণিত হল যে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালো করেই বুঝেছেন। দীর্ঘ ছয়দিন পশ্চিমদিকে দ্রুতবেগে চলে তিনি উরাল নদীর তীরে পৌঁছলেন। বন্দিদের নিকট থেকে তিনি জানতে পারলেন, আর কিছুদূরেই তিনটি স্থানে নদী অগভীর। কিন্তু তার একটা জায়গা ভালো করে লক্ষ করে তিনি অন্য স্থান দিয়ে সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়ার আদেশ দিলেন। সেখানেই তাঁর সৈন্যরা থেমেছিল। তাদের সাথে যোগ দিয়ে তিনিও তৎক্ষণাৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বনভূমির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সেখানে তিনি আরো কিছু লোককে বন্দি করলেন। তারা জানাল যে, তোক্‌তামিশের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য তাদেরকে এই নদীতীরে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তোক্‌তামিশের দেখা তারা পায় নাই। সমগ্র তাতারবাহিনীর নদী পার হতে দুদিন লাগল। সে-কাজ শেষ হওয়ার পর তৈমুর তদন্ত করে জানতে পারলেন, নদীর উপরোক্ত অগভীর স্থান তিনটির আশেপাশে তোক্‌তামিশের অনেক সৈন্য গোপনে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু তৈমুর তাঁর বাহিনী নিয়ে অন্য স্থান দিয়ে নদী পার হওয়ায় তারা পালিয়েছে।

কিন্তু পালাবার সময়েই মোঙ্গলবাহিনীর ভয়াবহতা বেশি। তৈমুর তাঁর সৈন্যদলকে লাইন ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হতে নিষেধ করলেন। রাত্রিকালে আলো জ্বালতেও নিষেধ করা হল। যেই অন্ধকার হল, তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে শিবির ঘেরাও করে রাখতে পাঠালেন। কয়েকদিন ধরে উরাল নদীর অগভীর জলাভূমির মধ্য দিয়ে পশ্চিমদিকে তাঁর বাহিনী এগিয়ে গেল। মুক্ত-প্রান্তরে এসে আবার সৈন্যদলের গতিবেগ বাড়ানো হল। অবশেষে তারা এসে এমন স্থানে পৌঁছল, যেখানে সৈন্যদলের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

তোক্‌তামিশের পশ্চাৎরক্ষীদলের সাথে স্কাউটরা এসেছিল, কিন্তু স্বয়ং তোক্‌তামিশকে সে-দলে দেখা গেল না। সোনালিবাহিনীর সেনাপতির সাথে ছিল সজীব তাজা ঘোড়া, উৎকৃষ্টতর খাদ্যসম্ভার এবং অফুরন্ত তীরবাহী তূণীর।

প্রতিদিনই তোক্‌তামিশের পশ্চাৎরক্ষীদলের সাথে তৈমুরের স্কাউটদলের সংঘর্ষ

হতে লাগল। সোনালিবাহিনী আবার উত্তরদিকে চলতে লাগল। কিন্তু এবার আর তারা তাতারবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারল না। তবে তারা আগে-আগেই চলতে লাগল। ক্রমে শিকারের দেশ ছেড়ে, সভ্যতার রাজ্য পেরিয়ে, ছায়ার রাজ্যের গভীরে তারা প্রবেশ করল। বিচ এবং ওকগাছও ক্রমে বিরল হয়ে পড়তে লাগল—গাঢ় চিরসবুজের মেলার ভিতর দিয়ে তারা ক্রমে স্যাঁতসেঁতে তুন্দ্রা-অঞ্চলে ঢুকল।

তৈমুরবাহিনী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল। তার উপর তাদের তিনজন দলপতি এবং বহু সৈন্য শত্রুদল কর্তৃক নিহত হওয়ায় তারা কিছুটা দমে গেল। তারা বুঝল, এখন উভয়দিকে নিহত হওয়ার পালা শুরু হয়েছে। তবে তৈমুরের উপর তাদের ছিল অখণ্ড বিশ্বাস।

তারপর যদিও তখন মাত্র জুন মাসের মধ্যভাগ, তেমনি সময়েও বৃষ্টি এল, এল তুষারপ্রবাহ। দীর্ঘ ছয়দিন ধরে তারা তাঁবুর ভিতর আবদ্ধ রয়ে গেল। তৈমুরই সর্বপ্রথম তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। ওমর শেখের অগ্রবর্তী কুড়ি হাজার সৈন্য মোঙ্গলবাহিনীর ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে এগিয়ে চলেছিল। তৈমুরও দ্রুতবেগে এগিয়ে চললেন। সপ্তম দিবসে মোঙ্গলবাহিনীর নিশান সর্বপ্রথম তাঁর চোখে পড়ল। আর চোখে পড়ল বিরাট সৈন্যসমাবেশ—তাদের গম্বুজওয়ালা শিবির। তাঁর সৈন্যবাহিনী আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য যুদ্ধাবস্থায়ই ছিল—দরকার ছিল মাত্র তখন একটি আদেশের। কিন্তু তৈমুর সকলকে ঘোড়া থেকে নেমে শিবিরস্থাপন এবং আহারের ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁর দীর্ঘ আঠারো সপ্তাহব্যাপী আঠারোশত মাইল অতিক্রমের অভিযান এতদিনে শেষ হল। আধমাইল দূরেই ছিল সোনালিবাহিনীর যুদ্ধশিবির। তাদের মালগাড়িগুলো পশ্চাৎরক্ষী-বাহিনীর উদ্দেশে ছোটাছুটি করছিল। দুই দলের কারো পক্ষেই এখন আর যুদ্ধ-অবস্থা থেকে বিযুক্ত হওয়ার উপায় ছিল না। তরবারি-যুদ্ধরত দুজনের একজন আর দলে ফিরে যেতে পারল না। তোক্‌তামিশের লোকদের বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন তারা দেখল যে, তৈমুরের লোকেরা এমন সহজভাবে চলাফেরা করতে লাগল, যেন তুন্দ্রা-অঞ্চল একান্তভাবে তাদেরই। তৈমুর তাঁর ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিচ্ছিলেন আর তাঁর দলের শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন।

তাঁর শিবিরগুলোতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হল। অন্ধকার নেমে আসার পর শিবিরে আলো জ্বালা নিষিদ্ধ হল। শেষমুহূর্তের কোনো বৈঠকও তিনি ডাকলেন না। তাঁর অনুগত সেনাপতিরা তাঁর চারপাশে গালিচার উপর নিদ্রা গেলেন। তাঁর বার্তাবহদল প্রবেশদ্বাররক্ষীর সাথে ঘোড়াগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সশস্ত্র অবস্থায় তৈমুর একটা বাতির ধারে বসে রইলেন। কখনো কখনো ঝিমুলেন বটে, কিন্তু তাঁর দাবার ছকের ক্ষুদ্রকায় যোদ্ধাদের নিয়েই তিনি সময় কাটালেন।

সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছিল। সৈন্যবাহিনীকে সাত ডিভিশনে ভাগ করা হল। অভিযানের সময়েও তা-ই ছিল। বাহিনীর বামপার্শ্বে ছিল প্রধান অগ্রবর্তীদল—মধ্যভাগের মতোই। মধ্যভাগের পেছনে ছিলেন তৈমুর তাঁর নিজস্ব রক্ষীদল এবং বাছাই-করা প্রধান যোদ্ধাদের নিয়ে। সৈন্যদলের দুর্বল অংশই ছিল মধ্যভাগে। কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে সৈন্যদলের নামমাত্র ভার দেওয়া হয়েছিল তৈমুরের ছোটছেলে মিরন শার

উপর। কিন্তু সে-দলে ছিলেন নামকরা ওমরাহগণ এবং ভারী অশ্বারোহীদলের সেনাপতিগণ। মৃত্যুবরণে দ্বিধাহীন ব্যক্তিরাও সে-দলে ছিল—শেখ আলি বাহাদুরের মতো মৃত্যুভয়হীন বাহাদুর সৈন্যরা এই দলই অলঙ্কৃত করেছিলেন।

এই দক্ষিণ পার্শ্বের বীর সৈন্যগণকেই সকালে প্রথম আক্রমণ পরিচালনার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ধূসরকেশ সাইফুদ্দিন তাঁর পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে সর্বপ্রথম সোজা আক্রমণ চালালেন—'দার-উ গর' 'ধরো এবং মারো' এই হাঁক হেঁকে।

তোক্‌তামিশের বাহিনী অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো হয়েছিল। তার দুই বাহু তৈমুরের বাহুদ্বয়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সোনালিবাহিনীর সর্বশেষ বামবাহু সাইফুদ্দিনের অশ্বারোহীদলের মোকাবিলায় এগিয়ে গেল। দুই দলের চিৎকারে ও কোলাহলে তৈমুর-শিবিরের নাকাড়াধ্বনি ডুবে গেল। যুদ্ধস্থলের যেখানে স্বয়ং তৈমুর ভার নিতে পারেননি, সেসব স্থানে তাঁর ওমরাহদের উপরই ছিল যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব।*

সাইফুদ্দিনকে সাহায্য করার জন্য আর-একদল সৈন্য পাঠানো হল। সমগ্র ডানপার্শ্ব-বাহিনী তীরবর্ষণ করতে করতে দ্রুতবেগে সামনে এগিয়ে গেল। ভারী অশ্বারোহী-বাহিনীর চাপে সোনালিবাহিনী হটে যেতে লাগল। তৈমুর মিরন শাহের সাহায্যকল্পে তাঁর মধ্যভাগের সৈন্যদলকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন।

মধ্যভাগের অগ্রগতির পরিণাম কী হল, তা অনিশ্চিত। সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রই তখন ঘোড়সওয়ারের সমুদ্র! অস্ত্রের ঝনঝনা, তীরবৃষ্টির বিকট শব্দ, আহতের আর্তচিৎকারে তখন যুদ্ধক্ষেত্র মুখরিত। কোথাও আবার মৃত্যুপথযাত্রী শেষ অস্ত্রচালনা করছে। দয়া নাই, ক্ষমা নাই। রক্তপিপাসায় মানুষ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আহতগণ ঘোড়ার জিন থেকে মাটিতে পড়ে গেলে সেখানেই তারা অগণ্য ঘোড়ার চাপে মৃত্যুবরণ করছে।

বামপার্শ্বস্থ তাতারবাহিনী সংখ্যায় কম বলে পরপর শত্রুদলের আক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণ করল। সেলজুক-বাহিনী বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ওমর শেখ তখনো পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে চলেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তোক্‌তামিশের একদল সৈন্য তাতারবাহিনীর মধ্যভাগে সোজা ঢুকে পড়ল।

তাঁর অগ্রবর্তী মধ্যভাগের পেছন থেকে তৈমুর দেখলেন, শত্রুদল তাঁর এবং বামপার্শ্বের যুদ্ধক্ষেত্রের একেবার মধ্যভাগে এসে পড়েছে। তিনি তাঁর রিজার্ভবাহিনী নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন এবং তোক্‌তামিশের এই সেনাদের একেবারে খতম করে ফেললেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় এবং রক্ষীদলের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণের ঊর্ধ্বভাগে

---

* তৈমুরবাহিনীর ডানবাহুতেও ছিল তাঁর দুর্ধর্ষ প্রবীণ যোদ্ধাদল। প্রতিবাহুরই ছিল অগ্রবর্তী এবং রিজার্ভ-ফোর্স। যতক্ষণ পর্যন্ত ডানবাহুর অগ্রগতি সম্পূর্ণ না হত ততক্ষণ বামবাহুকে এগিয়ে যেতে আদেশ দেয়া হত না। নিজস্ব রিজার্ভবাহিনীকে তিনি প্রয়োজন হলে ডানবাহু বা বামবাহুর সমর্থনে পাঠাতেন। তবে যুদ্ধ চরম অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বক্ষণেই মাত্র তিনি তা করতেন। বাহিনীর মধ্যভাগ থাকত স্থির; তাঁর অশ্বারোহীদলের ধ্বংসকার্য শেষ হলেই মাত্র তা ব্যবহার করা হত। নিজস্ব রিজার্ভ-ফোর্সকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তিনি তাঁর সমগ্র বাহিনী যদৃচ্ছাভাবে পরিচালনা করতে পারতেন। তিনি তাঁর বাহিনীর একটা স্থায়ী গঠন দিয়েছিলেন। প্রতিটি দলই ছিল তার অবস্থান ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

অবস্থিত তৈমুরের ঘোড়ার লেজমার্কা নিশান তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে তোক্‌তামিশ বুঝতে পারলেন, আর রক্ষা নাই, সব শেষ হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গের ওমরাহদের নিয়ে তিনি ফিরলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চিমদিকে পালিয়ে গেলেন। তাঁর হাজার হাজার লোক যে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রইল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মৃত্যুর ছায়া তাঁকে দৌড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

তাঁর পলায়নে সোনালিবাহিনীর পতন হল।

১৮
মস্কো

এরপর তাতারবাহিনী ধীরেসুস্থে এগুতে লাগল। তোক্‌তামিশের শিবির দখল করার ফলে তাদের আর ঘোড়া বা খাদ্যের ভাবনা রইল না। দশ পল্টনের মধ্যে সাত পল্টনের সৈন্যগণকেই পলাতকদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। নিশান পড়ে যাওয়ার পর তোক্‌তামিশের অন্যান্য সেনাপতিরাও তাঁদের লোকজনসহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন। তার পরে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা পূর্বদিকে ভল্‌গার জলাভূমির দিকে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু অনুসরণকারী তাতারদের দ্বারা তাদের অধিকাংশ নিহত হল। ইতিহাসে আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং পলায়নরত অবস্থায় প্রায় এক লক্ষ লোক মারা যায়। সে যা-ই হোক, নিহতদের সংখ্যা যে ছিল বিরাট—তাতে সন্দেহ নাই।

আবার সেই আগের মতো সৈন্যবাহিনীর লাইন প্রসারিত করা হল। তবে এবার শিকারের জন্য নয়, ভল্‌গার দুই পার্শ্বের সমগ্র এলাকায় বেপরোয়া লুট চালাবার জন্য। অপেক্ষাকৃত গরম দক্ষিণদিকে তাতারবাহিনী এগিয়ে চলল এবং তাদের গোরু, ভেড়া, উট, ঘোড়ার ভাঁড়ার ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠতে লাগল। মাঠ থেকে পাকা গম সংগৃহীত হতে লাগল এবং সুন্দরী মেয়ে ও অল্পবয়সের ছেলেদের জন্য বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলো চষে ফেলা হল। রাশিয়ার বিভিন্নস্থানে ছড়ানো সম্পদরাশি তাদের বিস্মিত করে তুলল। সোনা-রুপা, শাদা নকুলের চামড়া, কালো স্যাবল এত সংগৃহীত হল যা তাদের প্রতিটি সৈনিক ও তার সন্তানদের সারাজীবনের অভাব মিটাতে পারে।

এতদিনে সেনাবাহিনীর প্রত্যেকেরই একটি খচ্চর কাপড়ে, রুপায়, বিভিন্ন জন্তুর চামড়ায় বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। আসলে এত জিনিস সংগৃহীত হল যে, তার বেশকিছু অংশ ফেলে দিতে হল। নিম্ন তৃণভূমিতে এসে বিভিন্ন বাহিনীগুলো আবার একত্র হল। তৈমুর সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আদেশ দিলেন।

জায়গাটা সত্যই মনোরম—উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে গরম বাতাসের হুহু শব্দ এবং নদীর কুলুকুলু ধ্বনি ভেসে আসছিল। কুয়াশা ছিল এখন অতীতের ব্যাপার। প্রতি ঘাসের পাতায় জ্যোৎস্নার আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল। মেঘমালা ছায়া বিস্তার করে চলেছিল ঘাসের সমুদ্রের উপর।

রাত্রে ছারপোকার কামড়, উড়ন্ত পাখির পাখার শব্দ, মাটির সোঁদা গন্ধ একটা

আলস্যের আমেজ এনে দিচ্ছিল। তৈমুরের তাতে বিরক্তি ছিল না। তোক্তামিশের শিবির থেকে পাওয়া স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডের উপর খাটানো রেশমের বিরাট শামিয়ানার নিচে তৈমুর বসেছিলেন তাঁর ওমরাহদের সাথে। পায়ের নিচে রেশমের বিছানায় গোলাপ-পানি ছিটানো হচ্ছিল আর বন্দিরা যোদ্ধাদের সামনে গোশ্তের পেয়ালা রেখে যাচ্ছিল।

অবশেষে বাদকরা তাদের বাঁশি ও গিটার যন্ত্র নিয়ে এল। যোদ্ধাদের বীরত্বকাহিনী নিয়ে সংগীত রচনা করা হয়েছিল—নাম দেওয়া হয়েছিল, 'মরুভূমিজয়ের সংবাদ'। বাদকদের যন্ত্রগুলোতে এ-সংগীত বেজে উঠল। খাবার পাত্র সরাবার পর যখন সুরা পরিবেশন করা হল, তখন আবার সংগীতের পরিবর্তন হল। তখন 'বালালায়কা'র মৃদু নিক্কণ ও বাঁশির সুমধুর ধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

তারপর সোনার পাত্রে করে বিজয়ী যোদ্ধাদের কাছে আনা হল সুরা—মধুর শরবত, খেজুরের মদ ইত্যাদি। এসব পাত্র বহন করে নিয়ে এল শত শত বন্দিনী মেয়েরা—সুন্দর মুখ ও গঠন দেখে তাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল। তখনকার প্রথামতো তাদের পোশাক খুলে নেওয়া হল, কালো চুলের গুচ্ছ তাদের কাঁধে ছড়িয়ে দেওয়া হল। প্রেমের গান গাইতে তাদের বাধ্য করা হল। তারপর তাতার ওমরাহগণ তাদের নিয়ে যদৃচ্ছা ব্যবহার করল।

ভল্গা-তীরের এই উৎসব শেষ হলে তৈমুর সৈন্যবাহিনীকে সেখানে রেখে সমরখন্দের দিকে চলে গেলেন। পরে তাঁর অনুসরণ করে সাইফুদ্দিনের অধিনায়কতায় সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিতে সমরখন্দে ফিরে এল। রাজধানীতে দীর্ঘ আটমাস অনুপস্থিতির পর প্রত্যাবর্তনকারী বিজয়ীদলকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য সমরখন্দের লোক ভিড় করে এল। বহিরাক্রমণের আশঙ্কা দূর হওয়ায় সমরখন্দের লোক এ-বছর থেকে রাজধানীকে সুরক্ষিত বলে ভাবতে লাগল।

তৈমুর তোক্তামিশকে তাঁর নিজের কর্মশক্তির উপর ফেলে দিয়ে চলে এলেন। সোনালিবাহিনীর বিরাট উত্তরভাগের ভবিষ্যৎও ভবিতব্যের উপর পড়ল। একথা সত্য যে, তৈমুর অধিকৃত অংশের শাসনভার খানের স্থলাভিষিক্ত একজন মোঙ্গল অফিসারের উপর দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা নিজ কর্তৃত্বরক্ষার একটা নমুনা হিসেবেই মাত্র করা হয়েছিল। এর পরিণতি হল এই যে, তোক্তামিশ আবার ফিরে এলেন।

তিন বৎসর পরে দেখা গেল, তোক্তামিশ আবার কাস্পিয়ানের উত্তরদিকে তৈমুরের রাজ্যসীমায় এসে হানা দিয়েছেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তৈমুর তোক্তামিশকে লিখলেন, 'তোমার উপর নিশ্চয়ই শয়তান ভর করেছে; নয়তো নিজ সীমায় থাকতে পারছ না কেন? গত যুদ্ধের কথা এর মধ্যেই ভুলে গেলে? আমার বিজয়বার্তা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। আর এটাও জানো নিশ্চয়ই যে, যুদ্ধ এবং শান্তি আমার কাছে এক-বরাবর। আমার বন্ধুত্ব ও শত্রুতার স্বরূপ কী, তার প্রমাণও তুমি পেয়েছ। এখন বেছে নাও। কোন্‌টা তোমার কাম্য, আমায় জানাও।'

আবার নাছোড়বান্দা তোক্তামিশ যুদ্ধে মেতে উঠলেন। এ-যুদ্ধে তৈমুর প্রায় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এমনটি ইতঃপূর্বে আর কখনো হয় নাই। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ বাহিনী থেকে তিনি মাত্র কয়েকজন অনুচরসহ পৃথক হয়ে পড়েছিলেন,

তাঁর তরবারি গিয়েছিল ভেঙে, তাঁর উপর শত্রুপক্ষের এমন চাপ পড়েছিল যে, তাঁর অনুচরেরা নিচে নেমে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। পরে নূরুদ্দিন নামে একজন তাতার-সৈন্য শত্রুপক্ষের তিনটি গাড়ি তাঁকে আড়াল করার জন্য এমনভাবে স্থাপন করে, যাতে তৈমুর আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। পরে সাহায্য এসে পৌঁছে। তাঁর পুত্র মিরন শাহ্ এবং ওমরাহ্ সাইফুদ্দিন এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

কিন্তু এই যুদ্ধেই সোনালিবাহিনী খতম হয়ে গেল। তোক্তামিশ উত্তরাঞ্চলের জঙ্গলে পলায়ন করেন—তাঁর গোত্রীয় লোকেরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোরূপে প্রাণ বাঁচায়। তাদের কিছুসংখ্যক গেল ক্রিমিয়ায়, আর কিছু আদ্রিয়ানোপলে, কেউবা গেল এমনকি হাঙ্গারিতে। বেশিসংখ্যক লোক তৈমুরের দলে যোগদান করল।

ভল্গাতীরের বিশাল সরাই নগরীর ভাগ্যে যা ঘটল, তা ভয়াবহ। এবার তৈমুর নগরীগুলোকে অক্ষত রেখে গেলেন না। সরাই নগরীর অধিবাসীরা রাজধানী থেকে তাড়িত হয়ে ভরা শীতের ঠাণ্ডায় মারা গেল। কাঠের প্রাসাদগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। ভল্গার মোহনায় অস্ত্রাখানের উপর আক্রমণ চালানো হল। বিরাট বরফের দেয়ালের ভিতরে থেকে এর অধিবাসীরা আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করল। দুর্গের লোকদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, তাদের উপর দিয়ে বোখারা প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ করার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। তা-ই করা হল। সব লোককে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হল। দুর্গের গভর্নরকে নদীর বরফের নিচে ঠেসে ধরে মারা হল।

তৈমুরবাহিনী যখন ডননদীর তীর বেয়ে এগিয়ে চলল, মস্কো আক্রমণের আশঙ্কায় তখন তার অধিবাসীদের ভীত হওয়ার কারণ ছিল বইকি। নিতান্ত নৈরাশ্যভরে রুশ গ্রান্ড প্রিন্স তাঁর সৈন্যদল নিয়ে তৈমুরের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ভার্জিন মেরির প্রতিমূর্তি নিয়ে আসার জন্য বিশাইগোরোডে গাড়ি পাঠানো হল। মিছিল-সহকারে প্রতিমূর্তি মস্কোয় নিয়ে আসা হল। রাস্তায় দুধারে হাঁটু গেড়ে বসা জনতার মুখ থেকে আর্তধ্বনি বেরিয়ে আসছিল : 'মা মেরি, রাশিয়াকে রক্ষা করো।'

এই ব্যাপারকেই রুশরা এই ভয়াবহ বিপদত্রাণের কারণ বলে মনে করেছিল। কারণ তৈমুর ফিরে গিয়েছিলেন।* কিন্তু কেন, তা কেউ জানে না। মস্কো ছেড়ে তিনি এরপর আজবসাগরের তীরবর্তী ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো দখল করলেন। ভেনিস, জেনোয়া, কাটানা ও বাস্ট অধিকৃত হল। এসব বন্দরের প্রাসাদসমূহ অগ্নিদগ্ধ হল।

ধূসর আবহাওয়া ও শীতকালের ম্লান সূর্যালোকে মোঙ্গলসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের

---

* স্মরণ রাখা দরকার যে, সাত বৎসর আগে তোক্তামিশ-বাহিনী মস্কো বিধ্বস্ত করেছিল। তৈমুর এই সোনালি-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, পঞ্চাশ হাজার অধিবাসী-অধ্যুষিত মস্কো একটা রাস্তার ধারের সাধারণ শহর ছাড়া আর-কিছু নয়। অধিকাংশ ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, তৈমুর মস্কো বিধ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু রুশ ইতিহাসগুলোতে তার উল্লেখ নাই। আসল কথা এই যে, চার বছর পরে লিথুয়ানিয়ার ডিউক উইটল্ড দক্ষিণ রুশিয়ায় অবস্থিত তাতারদের বিরুদ্ধে একটা ক্রুসেড চালিয়েছিলেন। কিন্তু তৈমুরের দরবারের দুজন খানের হাতে তাঁর ভীষণ পরাজয় ঘটে। তবে তৈমুর কর্তৃক সোনালি-বাহিনী বিধ্বস্ত হওয়ার ফলেই যে রুশগণ মোঙ্গল পরাধীনতা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিল, তাতে সন্দেহ নাই।

উপর দিয়ে তৈমুর এগিয়ে চললেন। জুচির বংশধর সোনালিবাহিনীর রাজত্বের উপর যবনিকাপাত হল; চেঙ্গিজ খান-প্রবর্তিত আইনের শাসনের হল নিঃশেষ। এরপর গোবি মরুভূমি ও উত্তর তুন্দ্রা অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও মোঙ্গল খানদের আধিপত্য বিদ্যমান রইল না।

সুদূর উত্তরাঞ্চল শেষবারের মতো ছেড়ে এসে ককেশাসের বাধার ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা খোলার জন্য তৈমুর কাস্পিয়ানের চারধার ঘুরে তাঁর অভিযানের সমাপ্তিরেখা টানলেন। ইতোমধ্যে তৈমুরবাহিনীতে বহু নতুন লোকের আমদানি হয়েছিল—মরুচারী কিপ্‌চক এবং বরফাঞ্চলের বাসিন্দা কারলুচরাও তাদের মধ্যে ছিল। তিনি এরপর দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটে ও আরণ্যদেয়ালের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এ-যাবৎ কোনো সৈন্যবাহিনীই একে জয় করতে পারেনি। রাস্তা তৈরি করে করে তাঁকে অগ্রসর হতে হল। সাহসী জর্জিয়ান যোদ্ধাদের পাথুরে আবাসস্থলের বাধা অতিক্রম করতেও তাঁকে কম বেগ পেতে হল না।

সারা গ্রীষ্মকালটাই এজন্য তৈমুরকে ব্যয় করতে হয়েছিল। কারণ মানুষের অসাধ্য বলে যা লোকে মনে করত, তা-ই সফল করতে তিনি তাঁর লোকদের আদেশ দিয়েছিলেন। একস্থানে জঙ্গল এত ঘন ছিল যে, তার ভিতর দিয়ে বায়ু প্রবেশ করাও ছিল কঠিন—এমনকি, দুএকটি ছিদ্র ছাড়া যেখানে সূর্যালোকেরও প্রবেশপথ বড় ছিল না। অগণ্য ঘন ছোটগাছের ঊর্ধ্বে মাথা-জাগানো বিশালকায় ফারগাছ, ভূপাতিত তাদের অসংখ্য কাণ্ড ও গুঁড়ি এবং এদের জড়িয়ে নানাশ্রেণীর লতার বুননির ফলে সে-স্থান হয়ে পড়েছিল প্রায় অভেদ্য। এখানেও বহুকষ্টে তাঁকে একটা রাস্তা কাটতে হল।

কাছেই থাকত এক পাহাড়ি জাতি। তারা এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যা সত্যি ছিল দুর্ভেদ্য। স্থানটি ছিল খুব উঁচুতে এবং তার চারদিক ঘিরে যেসব পাহাড় উঠেছিল, তার মাথার দিকে চাইতে গিয়ে তাতারদের মাথা ঘুরে গেল। তা ছিল এত উঁচু যে, সেখান পর্যন্ত তীর পৌঁছানো কোনো মানুষের সাধ্য ছিল না। তৈমুর এটাকে এড়িয়ে যেতে রাজি হলেন না—কারণ তাতে তাঁর নতুন রাস্তার পেছনে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ অক্ষত অবস্থায় রেখে যাওয়া হবে।

তিনি তাঁর বদখ্‌শানের লোকদের ডেকে এ-সম্বন্ধে পরীক্ষা করে একটা সম্ভাব্য পন্থা আবিষ্কার করতে আদেশ করলেন। এরা ছিল জন্মবাধি পাহাড়ে লালিত-পালিত মানুষ। এই শ্রেণীর পাহাড়ের উপর থেকে শিংওয়ালা ভেড়া-শিকারে ছিল এরা অভ্যস্ত। তারা পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করল এবং পরে এসে তৈমুরকে তাদের ব্যর্থতার কথা জানাল। কিন্তু তবু তৈমুর এটা ফেলে রেখে যাবেন না। তিনি একটা উঁচুস্থান থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। পরে অনেকগুলো সিঁড়ি তৈরি করে সেসব রজ্জুবদ্ধ করতে আদেশ দিলেন।

বড় বড় গাছ থেকে দড়িসহযোগে তিনশত ফিট উঁচু পাহাড়ে উপরদিকে সিঁড়িগুলো উত্তোলন করা হল। সিঁড়িগুলোর মাথাসমূহ পাথরের কোনো খাঁজ পর্বত পৌঁছুলে পরে সেখান থেকে তাতারগণ আরো উপরের আর-একটি খাঁজে সিঁড়িগুলো নিয়ে গেল। এইভাবে দড়ির সাহায্যে সিঁড়িগুলোকে ক্রমে আরো উপরের দিকে তারা পরস্পরে

ধরাধরি করে নিয়ে চলল। অবশেষে কয়েকজন পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে আরোহণ করতে সমর্থ হল। সেখান থেকে তারা তীর নিয়ে একেবারে সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে উঠল। যখন এই উপায়ে বহু তাতারসৈন্য সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে গেল, জর্জিয়ানরা তখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

এইভাবে সৈন্যদল সাগর পর্যন্ত প্রসারিত সুদীর্ঘ উপত্যকাভূমি অতিক্রম করল। এখন তাদের সামনে পড়ল আলবুর্জ পর্বত। উত্তর পারস্যকে এ-পর্যন্ত আড়াল করে রেখেছে। জর্জিয়ার মতো সেখানেও ছিল কয়েকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। তৈমুর দুর্গের লোকদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেন। যারা আত্মসমর্পণ করল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হল।

এখানকার দুইটি অবরোধ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে—কালাত এবং তাক্রিত দুর্গ দুটির অবরোধ। প্রথমটা ছিল মালভূমি—তার সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল পানির ফোয়ারা এবং চারণভূমি। এটা বেরিয়েছিল পাহাড় থেকে এমনভাবে যে, তার নিচে সৈন্যশিবির স্থাপন করা ছিল অসম্ভব। পাহাড় ও গিরিসঙ্কটগুলো ছিল অনতিক্রম্য এবং এই কারণে তাদের শীর্ষদেশে আরোহণ ছিল অসম্ভব। পরবর্তীকালে নাদিরশাহ এখানেই তাঁর ঐশ্বর্য সংরক্ষিত করেন।

হামলা ব্যর্থ হওয়ায় তৈমুর সেখানকার সবগুলো গিরিসঙ্কটেই এক-একদল সৈন্য রেখে আবার এগিয়ে চললেন। সে-সময়ে হঠাৎ সংক্রামক ব্যাধি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ায় কালাতের অধিবাসীরা নিচে নেমে আসতে বাধ্য হল। ফলে কালাত অধিকৃত হল এবং তার দরজা ও রাস্তা খুলে দেওয়া হল।

তাক্রিত ছিল তাইগ্রিস নদীমুখী শক্ত পাহাড়ের উপর স্থাপিত। এটা ছিল এক স্বাধীন উপজাতির লোকদের অধিকারে। এরা রাজপথে বেপরোয়াভাবে লুটতরাজ করে বেড়াত। হামলা চালিয়ে কেউ এ-যাবৎ তাক্রিত জয় করতে পারেনি। তৈমুরের আগমনে দুর্গাধিপতি আত্মসমর্পণে রাজি হল না। পাহাড়ে আরোহণের সমস্ত পথ সিমেন্ট-সহযোগে পাথর বসিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল।

সঙ্গে সঙ্গে তাতারদের ভেরিনিনাদে আক্রমণ সূচিত হল। বাইরে সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে দুর্গবাসিগণ উপর উঠে গেল। তৈমুরের ইঞ্জিনিয়ারগণ তখন পাথর ছুড়ে দেওয়ার জন্য নিক্ষেপণ-যন্ত্র তৈরি করতে লাগল। লম্বা লম্বা কাঠ জড়ো করে যন্ত্র তৈরির আয়োজন হল। দেখা গেল, এসব যন্ত্রের সাহায্যে দেয়ালের উপর দিয়ে পাথরের বড় বড় টুকরো নিক্ষেপ করা সম্ভব। একে-একে দুর্গের ছাদের পাথর ভেঙে ফেলা হতে লাগল। কিন্তু এতে আত্মরক্ষাকারীদল খুব ঘাবড়াল বলে মনে হল না। কারণ নিক্ষিপ্ত পাথরখণ্ডগুলো অত উঁচুতে অবস্থিত বিশাল দেয়ালের তেমন কিছু ক্ষতি করতে পারল না। তৃতীয় রাত্রে সাইদ খোজা নামীয় এক তাতার ওমরাহের লোকজন দুর্গের বহির্ভাগের একটা উঁচু স্থানে আরোহণ করল, কিন্তু তাতেও দেয়ালে আরোহণের কোনো সুরাহা হল না।

সাময়িকভাবে তৈরি এক উঁচু ছাদের আড়ালে থেকে তাতার ইঞ্জিনিয়ার ও খনকের দল এমন এক মাচা খাড়া করে তুলল, যা পাহাড়ের মুখ-বরাবর দেয়ালের ভিত্তিভূমির

একেবারে সোজা নিচে গিয়ে পৌঁছতে লাগল। পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা সৈন্যদলকে দিয়ে কাজ শুরু করা হল। একযোগে বাহাত্তর হাজার লোক লোহার পাত ও টুকরো নিয়ে কাজ করতে লেগে গেল। রাতদিন তারা খোদাইয়ের কাজ করে চলল। একদল পাহাড়ের ভিতর দিকে কুড়ি ফিট পর্যন্ত খোদাই করে ফেলল। উপরের লোকেরা একথা জানতেও পারল না।

কিন্তু যখন জানতে পারল, আত্মরক্ষাকারী দল ভীষণ ভীত হয়ে উঠল। তারা তৈমুরের কাছে উপহার পাঠাল। কিন্তু তৈমুর বললেন, 'তাক্রিত দলপতি হাসানকে এসে আত্মসমর্পণ করতে হবে।' হাসান কিন্তু এল না।

কাজেই যুদ্ধের নাকাড়া বেজে উঠল। দেয়ালের এক অংশের নিচেকার খুঁটি তৈল-নিষিক্ত করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। ভারী কাঠের টুকরোগুলো পুড়তে লাগল; ফলে দেয়ালের সেই অংশ ধসে পড়ল। তার সাথে উপরের বহু লোক নিচে পড়ে গেল। এরপর তাতার সৈন্যদল বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করল। আক্রান্তের দল মরিয়া হয়ে বাধা দিতে লাগল। অপর দুই অংশের কাঠের টুকরাগুলোতেও অগ্নিসংযোগের আদেশ দিলেন তৈমুর। অভিশপ্ত দুর্গের চারদিক কালো ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে উঠল।

দেয়ালের অন্যান্য অংশ ধসে পড়ার ফলে সমস্ত বাধা অপসারিত হল। সশস্ত্রবাহিনী ভীষণ বেগে শত্রুদলের উপর আপতিত হল। তাক্রিতের লোকেরা অর্ধভগ্ন দুর্গের পেছনকার উঁচু জায়গায় পালিয়ে গেল। সেখানেও অনুসরণ করে তাতারসৈন্যরা হাসানকে হাতে-পায়ে বেঁধে টেনে নিয়ে এল। বেসামরিক অধিবাসিগণকে সৈন্যদল থেকে আলাদা করে রেহাই দেওয়া হল। কিন্তু তাক্রিতের সৈন্যগণকে ভাগ করে তাতারদের হাতে দেওয়া হল এবং তারা তাদের হত্যা করল।

এদের দেহ থেকে মাথা কেটে আলাদা করা হল। নদীর কাদায় সিমেন্ট করে এইসব মাথা দিয়ে দুইটা পিরামিডের কেল্লা তৈরি করা হল। এইসব কেল্লার ভিত্তিপ্রস্তরে খোদাই করে লিখিত হল, 'আইনবিরোধী ও দুষ্ট লোকদের পরিণাম দ্যাখো।' তবে যদি সত্যকথা লিখা হত, তা হলে কিন্তু লিখিত হত, 'যারা তৈমুরের বিরোধিতা করেছিল, তাদের পরিণাম দ্যাখো।' ভাঙা দেয়াল তেমনই রেখে দেয়া হল। ভ্রমণকারীরা দিবসে সেখানে গিয়ে তৈমুরের এই কীর্তি দেখত এবং তাঁর শক্তির পরিমাপ করত। রাত্রে কিন্তু কেউ সেখানে যেত না, কারণ লোকে মনে করত, এই মাথার কেল্লার শীর্ষদেশে তখন ভূতুড়ে আগুন দেখা দেয়। শুধু বুনো শূকররাই রাত্রির অন্ধকার নেমে এসে তাক্রিতের এই অভিশপ্ত স্থানে খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়।

দুর্ভেদ্য তাক্রিত দুর্গ দখল করতে তৈমুরের সতেরো দিন লেগেছিল। তিনি এখন উত্তরাঞ্চল, আরল ও কাস্পিয়ান সাগর এবং পারস্য ও ককেশাসের পার্বত্যভূমির অধিপতি হলেন। তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছে সুদীর্ঘ খোরাসান রোডের বাইশশত মাইল। নিশাপুর থেকে আলমালিক পর্যন্ত চোদ্দটি শহর তাঁকে খেরাজ যোগাত।

কিন্তু এর জন্য প্রাণক্ষয়ও বড় কম হয়নি। সামন্তরাজাদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল, বাহাদুরশ্রেণীতে ভীষণ ভাঙন ধরেছিল। খিতাই বাহাদুর আগেই শিরদরিয়ার তুষারে

মারা গিয়েছিল। যে-শেখ আলি বাহাদুর সোনালিবাহিনীর উদ্দেশে নিজের শিরস্ত্রাণ ছুড়ে ফেলেছিল, তাকে এক তুর্কম্যান গুপ্তচর ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। আর তৈমুরের দ্বিতীয় পুত্র ওমর শেখ ককেশাসে তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দিগ্বিজয়ী তৈমুর নিজে বিস্ময়করভাবে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেলেও, তাঁর আর-এক পুত্র তাঁর বদলা মৃত্যুবরণে বাধ্য হল।

পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া হলে এবার কিন্তু তৈমুরের আচরণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল না। শুধু বললেন, 'খোদা দিয়েছিলেন, আবার খোদাই নিয়ে গেলেন।' এই বলে তিনি সমরখন্দে ফিরে যাওয়ার ফরমান জারি করলেন।

যাবার পথে আক সরাইয়ে তিনি থামলেন। ততদিনে সবুজ-নগরীর নিকটে তৃণভূমির উপর শ্বেতপ্রাসাদের নির্মাণকার্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখানে কিছুদিন তিনি বিশ্রাম করলেন। দরবারে কোনো কাজই তখন তিনি করতেন না। প্রথম পুত্র জাহাঙ্গিরের কবর তিনি দেখতে গেলেন। ওমর শেখের দেহ রাখবার জন্য তিনি এ-কবরগাহকে আরো প্রসারিত করতে আদেশ দিলেন। শেষ ক'বছর তৈমুর নীরবে কাল কাটাতেন। দাবা খেলায়ই তখন তিনি বেশি মশগুল থাকতেন। সমরখন্দে খুব কম সময়ই তিনি থাকতেন। তখন কাউকেই তিনি নিজ খেয়াল-কল্পনার কথা বলতেন না। কিন্তু ওমর শেখের মৃত্যুর পর তিনি দূরবর্তী দেশগুলোতে প্রথম অভিযান চালাবার আয়োজন করতে লাগলেন।

১৯
সাকি

এতদিন তাতার দিগ্বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চলের দিকে নজর দেননি। হিন্দুকুশের ওধারে ভারত সম্পর্কে এক ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাঁর কোনোরূপ কৌতূহল ছিল না। লবণ-মরুভূমিশ্রেণী তাঁর থেকে ইরান রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছিল। যদিও বেশিরভাগ ধ্বংসাবশেষে পরিণত, তবু ইরান ছিল মহিমায় ভরপুর। যাঁরা ছিলেন এক-একজন ইসলামের বিরাট পুরুষ, তাঁদেরই মর্মরাসনে বসেছিলেন ভাঁড় ও সুরাপায়ী রাজপুরুষগণ—সিংহের গুহায় শৃগালের মতো। উলঙ্গ পর্যটকদল রৌদ্রদগ্ধ হচ্ছিল। দরবেশরা বাদ্যের তালে তালে নেচে বেড়াচ্ছিল—যদিও তাদের থালে সঞ্চিত ভিক্ষালব্ধ অর্থের দিকে তাদের খেয়াল ছিল পুরোমাত্রায়। ক্রীতদাসবাহিত চাঁদোয়ার নিচে আমিরগণ উষ্ট্রারোহণে যাচ্ছিলেন। রেশমের জায়নামাজ প্রায়ই সুরাসিক্ত হচ্ছিল, আর শাদা দাড়ি রঞ্জিত হচ্ছিল আঙুরের রসে।

এ ছিল ধুলোয় ভরা ভঙ্গুর দেশ। এর দেয়ালঘেরা বাগানের উপর যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হত, তখন এ ছিল সৌন্দর্যের লীলাভূমি; আর যখন এর ছত্রধারী বৃক্ষশ্রেণীকে বিপর্যস্ত করে মুরুভূমির 'লু' হাওয়া বয়ে চলত, তখন এ হয়ে উঠত অভিশপ্ত দেশ। এর ভিতরদিকে দাঁড়িয়ে ছিল কতকগুলো থাম, তাদের বলা হত পার্সিফোলিস। আর ছিল কয়েকটি মর্মরমণ্ডিত মেঝে,—সেখানে সেমিরোমিদের ক্রীতদাসীরা নৃত্য করত।

শিরাজের কবি হাফিজ তাঁর দেশ সম্পর্কে বলেছিলেন, তাঁর দেশে যন্ত্রশিল্পীদের দেখা যায় ক্বচিৎ-কদাচিৎ; কারণ একই সঙ্গে মাতালদের এবং সুস্থ অমাতালদের নাচের সাথে তাল রেখে বাদ্য বাজানো যে-সে যন্ত্রীশিল্পীর কাজ ছিল না।

ইরান—আজকের পারস্য—দীর্ঘদিন ঐশ্বর্যসম্পদ ভোগ করেছে। এর ধনীরা হয়ে পড়েছিল সন্দিগ্ধমনা এবং গরিবরা একগুঁয়ে। বাদশাহ তাঁর ছেলেদের অন্ধ করে দিয়েছেন, আর ভাইয়ের মৃত্যুতে হেসে বলেছেন : হ্যাঁ, এবার আমাদের ভাগ-বাটোয়ারা ঠিক হয়েছে—উপরে আমি এবং নিচে আমার ভাই নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতে পারবে। জনৈক ব্যঙ্গ-রসিক বলেছিলেন, নির্বোধরাই ভাগ্যের প্রিয়পাত্র, বিদ্বান ব্যক্তি তিনিই, নিজ জীবিকাঅর্জনের দিকে যাঁর কোনো খেয়াল নাই। যাঁর অগণ্য প্রেমপাত্র, তিনিই ভদ্রমহিলা। গৃহিণী তিনিই, যাঁকে ভালোবাসার কেউ নাই।

এখানে পশমবস্ত্রপরিহিত সুফিরা কবিদের সাথে মরমিপন্থা নিয়ে বিতর্ক চালাতেন এবং সুরার সোরাহিবাহী সাকিও মিলত এখানে। ভাঁড় আলঙ্কারিক, শব্দের জাদুকর, চাটুকার আর ঐশ্বর্যভিখারিরাই ছিল বাদশাহদের সুরাসহচর। তাদের মধ্যে অবশ্য প্রতিভাশালী কবিদেরও স্থান ছিল। এই আমোদলোভী ইরানিরা নিষিদ্ধ সুরাদেবীর পায়ে একেবারে লুটিয়ে পড়েছিল। তারা অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার চাইতে বীরত্বের গান বেশি পছন্দ করত।

'আর কিছু নই, আমরা যে হই চলন্ত কোলাহল,
সদা যাই আসি মোরা ভৌতিক ছায়ামূর্তির দল,
সূর্য উজ্জ্বল লণ্ঠন হাতে মাঝরাতে জাদুকর
তারি চারপাশে ঘুরে মরি মোরা ছায়ামূর্তির দল।'

তাদের বিশ্বাসকে নিয়ে যারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত, তাদের তারা পাথর ছুড়ে মারত, তবু সুরাপান করতে করতে তাদের বিশ্বাসের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করতেও বাধত না। তারা ছিল এশিয়ার গ্রিক। স্ত্রৈণ এবং অন্য সময়ে ভীষণ গোঁড়া। তাতারদের তারা ঘৃণা করত—বলত তাদের বিধর্মী।

পরলোকগত শাহ কবি হাফিজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিরাজের সুরার প্রতি তাঁর ছিল অতিরিক্ত পক্ষপাত। খেলা, সৌন্দর্য ও আলোর জীবন তিনি পছন্দ করতেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, বহুদিন আগে তৈমুরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মহাপ্রয়াণের আয়োজন করছিলেন—তাঁর কাফনের কাপড় এবং শবাধার তৈরি হল তাঁর চোখের উপর। তারপর যে-তৈমুরকে তখনো পর্যন্ত তিনি দেখেননি, তাঁকে উদ্দেশ করে চিঠি লিখালেন। চিঠিতে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বার্তা জানিয়ে লেখা হল, 'মহামানুষ মাত্রই জালেম, পৃথিবী হচ্ছে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ মাত্র। শিক্ষিত লোকেরা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না—অস্থায়ী আনন্দ ও সৌন্দর্য তাদের কাম্য নয়। কারণ তাঁরা জানেন, এসব থাকবে না। কখনো ভঙ্গ করা হবে না, এই শর্ত করে আমাদের মধ্যে যে-সন্ধি হয়, তাকে আমি আমাদের বন্ধুত্বের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করি। সাহস করে আমি বলতে পারি, আমার শ্রেষ্ঠ কামনা হচ্ছে যে, এই সন্ধিপত্র বিচার-দিনে আমার হাতে

থাকবে—যাতে আপনি আমাকে এ-অপবাদ দিতে না পারেন যে, আমি সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করেছি।...এখন আমি দিন-দুনিয়ার মালিকের বিচারালয়ে যাচ্ছি। খোদাকে ধন্যবাদ যে, আমি এমন কিছু করিনি, যার জন্য বিবেকের কাছে আমি দোষী। অবশ্য গোনা-খাতা আমার জীবনে প্রচুর জমা হয়েছে। আমার সুদীর্ঘ তিপ্পান্ন বছরের জীবনে সুখ-সম্ভোগ আমি কম করিনি। সংক্ষেপে বলতে চাই যে, আমি, যেভাবে জীবন-যাপন করেছি, তেমনিভাবে মরছিও। দুনিয়ার অহঙ্কার আমার চলে গেছে। আমি খোদার কাছে এই দোয়া চাইছি, সুলায়মানের মতো বুদ্ধিমান এবং সেকান্দরের মতো মহান তৈমুরের উপর যেন তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। আমার প্রিয় পুত্র জয়নুল আবেদিনের জন্য আপনার কাছে কোনোরূপ সুপারিশ করা আমি বাহুল্য বলেই মনে করি। আপনার আশ্রয়ের পক্ষপুটে খোদা তাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি তাকে খোদার হেফাজতে ও আপনার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি। আমার একথা আপনি রাখবেন, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আপনার কাছে আমার আরো প্রার্থনা, আপনার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে আপনার যে-অনুগত বন্ধুটি আজ সুখে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার জন্য খোদার কাছে শেষ দোয়া চাইবেন—যেন আপনার মতো মহান ও ভাগ্যবানের দোয়ার বরকতে খোদা আমার প্রতি সদয় হন এবং সাধু ব্যক্তিদের মাঝে আমাকে পুনর্জীবিত করেন। আমার এ-অন্তিম অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন, এই আমার প্রার্থনা—আখেরাতে আপনি এর জন্য দায়ী থাকবেন।'

মনে হয়, অনুরূপ পত্র একই ধরনের উপহারসহ বাগদাদের সুলতানের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। যথাসময়ে ইরানের শাহ ইন্তেকাল করলেন। শাহজাদা দশজন রাজ্যের টুকরোগুলো নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করে দিল। একজন পেল ইস্পাহান, অন্য একজন ফারেস, আরেকজন শিরাজ—এইভাবে সকলেই রাজ্যের কিছু-কিছু লাভ করল। বাদশাহ হিসেবে তাদের কেউ-কেউ দোকান খুলল। কেউ-কেউ মুদ্রা তৈরি করল। কিন্তু সকলে পুরাদমে ট্যাক্স আদায় করতে লাগল এবং নতুন নতুন দাবি উল্লেখ করে সকলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করল। এই শাহজাদারা ছিলেন মোজাফফর-বংশীয়।

তারপর ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে শীতকালের ম্লান সূর্যালোকে যখন অগ্নিক্ষরা মরুপ্রান্তর কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল, উত্তর থেকে তৈমুর নিম্নভূমিতে নেমে এলেন। সত্তর ডিভিশন রণপটু সৈন্যদল নিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দগতিতে এসে প্রথমে ইস্পাহানে প্রবেশ করলেন। শহরের ঐশ্বর্য দেখে তাদের সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হল। ইস্পাহানে কিছু গম্বুজের মেলা, ছায়াঘেরা রাস্তার বাহার আর লোকভরতি সেতুর বাজার। ইবনে বতুতা তাঁর সফরকালে ইস্পাহানেও এসেছিলেন। তিনি এই রাজকীয় শহর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'আমরা ফলের বাগানে, নদী আর সুন্দর গ্রামগুলির ভিতর দিয়ে সফর করেছি। সেখানকার রাস্তাগুলোর দুপাশে রয়েছে ছোট ছোট প্রাসাদ। শহরটি খুবই বড় এবং ভারি সুন্দর। অবশ্যি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মারামারির নিদর্শন রয়েছে প্রচুর। এখানে সুস্বাদু খুবানি, তরমুজ প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়—এগুলি আমাদের আফ্রিকার ডুমুর ফলের মতোই এখানকার লোকেরা সযত্নে রক্ষা করে। ইস্পাহানের লোকদের

গঠন চমৎকার। তারা তাদের পাতলা আকৃতির মুখে রুজ মাখে। প্রকৃতি তাদের মোলায়েম। ভোজ দেওয়ার ব্যাপারে তারা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। আসলে, তারা দুধ-রুটির নিমন্ত্রণ জানায় বটে, কিন্তু তাদের রেশমাবৃত ডিশে বহুমূল্য মিষ্টান্ন দেখা যায়।'

যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েই তৈমুর ইস্পাহানে গেলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। শাহের অনুরোধও তাঁর মনে ছিল। তাঁর একমাত্র অভিযোগ ছিল, মোজাফফররা তাঁর দূতকে বিনা-কারণে আটক করেছে। কয়েক বছর ধরে তিনি এদের ঝগড়াঝাঁটি লক্ষ করেছেন; এবার নিজে তিনি তা সরেজমিনে দেখতে এসেছেন।

ইস্পাহানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে এগিয়ে গেলেন। জয়নুল আবেদিনের চাচা গেলেন সকলের মুখপাত্র হয়ে। তাদের খেলাত দিয়ে তৈমুরের গালিচার উপর বসানো হল। পরে ইস্পাহানের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

সৌজন্যের পরদা ঠেলে তৈমুরই প্রথম বললেন, 'এখানকার অধিবাসী কারুর জীবনের ক্ষতি করা হবে না। আর আপনাদের শহরও লুটের কবল থেকে রক্ষা পাবে যদি উপযুক্ত রকম মূল্য দেওয়া হয়।'

মোজাফফররা বুঝতে পারলেন, এতবড় সৈন্যবাহিনী এক হাজার মাইল অতিক্রম করে এসেছে নিশ্চয়ই খালিহাতে ফিরে যাবার জন্য নয়। কাজেই মুক্তিমূল্য দেওয়া ঠিক হয়ে গেল। তাঁরা মূল্য গ্রহণের জন্য দূত পাঠাতে বললেন। ফলে প্রত্যেক তাতার ডিভিশন থেকে এক-একজন ওমরাহকে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে বলা হল। তাদের সঙ্গে বড়দলের একজন আমিরও গেলেন এই আদান-প্রদানের ভারগ্রহণ করে।

পরদিন তৈমুর আনুষ্ঠানিকভাবে শহরে প্রবেশ করলেন। রাজকীয় জাঁকজমক-সহকারে তিনি শহরের রাস্তাগুলো পরিক্রম করে আবার শিবিরে ফিরে এলেন। নগরদ্বারে একদল সৈন্য পাহারায় রাখা হল।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবার পূর্ব পর্যন্ত কোনো গোলমাল হল না। সত্তর হাজার সৈন্য দীর্ঘ দুই মাস বা ততোধিক কাল ধরে কোনোদিকে মন না দিয়ে সোজা চলে এসেছে। ইস্পাহানের আলোর দিকে তারা লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিল। যে-দলকে কাজে পাঠানো হয়েছিল, তারা বাজারে বাজারে দেরি করছিল। শিবিরে যারা রয়ে গিয়েছিল, তারা শহর দেখার একটা কারণ আবিষ্কার করল। ক্রমে অনেকেই গিয়ে মদের দোকানগুলোতে ভিড় জমাল।

তারপর কী হল, সে-সম্পর্কে নানাজনের নানা মত। মনে হয়, ইরানিদের কতকগুলো অবাধ্য দুর্দান্ত লোক এক কর্মকারের নেতৃত্বে একত্র হয়েছিল। একটা ভেরি বেজে উঠল এবং ইসলামের আহ্বানধ্বনিও শোনা গেল : 'হে মুসলেমিন!'

এই আহ্বানে বহুলোক তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এক বিরাট জনতা গড়ে উঠল। এই দলের সাথে তখন-পর্যন্ত-শান্ত তাতারসৈন্যদের যুদ্ধ বেধে গেল। শহরের কোনো-কোনো স্থানে দায়িত্বশীল শহরবাসীরা তৈমুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের রক্ষা করল। আবার কয়েক স্থানে তাদের কেটে ফেলা হল।

রাস্তায় রক্তস্রোত প্রবাহিত করে জনতা আরো কিছু করার জন্য এগিয়ে চলল। রাস্তা সাফ করে জনতা দ্বাররক্ষীদের উপর হামলা চালাল এবং তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল।

পরদিন সকালে যখন এ-সংবাদ তৈমুরকে জানানো হল, তখন তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। স্পষ্টত প্রায় তিন হাজার তাতারসৈন্য মারা গিয়েছিল। মৃতদের মধ্যে ছিল তৈমুরের এক প্রিয় ওমরাহ এবং শেখ আলি বাহাদুরের পুত্র। তিনি তৎক্ষণাৎ দেয়াল ডিঙিয়ে ভিতরে হামলা চালাতে আদেশ দিলেন। তাঁর শিবিরে উপস্থিত ইরানি সম্ভ্রান্ত লোকেরা এ-ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে চাইলেন, কিন্তু তৈমুর তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। যুদ্ধ করে জনতা এখন আত্মরক্ষায় আত্মনিয়োগ করল।

কিন্তু তাতারদল দ্বারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের আদেশ দিলেন তৈমুর। প্রতি সৈন্যকে এক-একজন ইরানির মাথা আনতে হুকুম দিলেন। শহরের যে-অংশ দাঙ্গায় যোগ দেয় নাই, সেখানে কোনোরূপ অত্যাচার চালানো হল না। শরিফ এবং গণ্যমান্য লোকদের রক্ষার চেষ্টা করা হল। অন্যত্র লোকদের বেধড়ক গুলি করে হত্যা করা হল। সমস্ত দিন ধরে এই হত্যা-উৎসব চলল। যেসব হতভাগা অন্ধকারে লুকিয়ে দেয়ালের বাইরে চলে গিয়েছিল, পরদিন সকালে বরফের উপর দিয়ে তাদের অনুসরণ করা হল এবং ধরে ধরে হত্যা করা হল।

বহু তাতার এই হত্যাকাণ্ডে হাত কলুষিত করতে যায় নাই। তারা সৈন্যদের নিকট থেকে মাথা কিনে নিয়ে এল। ইতিহাসকারের মতে, প্রতি মাথার জন্য প্রথমদিকে তাদের দিতে হয়েছিল কুড়ি দিনারের মতো, কিন্তু পরে যখন নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেল, তখন আধা দিনারেও একটা মাথা কিনতে পারা যেত। এবং অবশেষে এজন্য কিছুই খরচ করতে হত না। মাথাগুলো প্রথমে দেয়ালের উপর স্তূপীকৃত করা হয়েছিল। পরে এগুলো দিয়ে সদর রাস্তা বরাবর উঁচু কেল্লা তৈরি করা হল।

এভাবে ইস্পাহানের সত্তর হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ দিল। আগে থেকেই এ-হত্যাকাণ্ডের কোনোরূপ পরিকল্পনা করা হয় নাই। তৈমুরকে বাধ্য হয়ে তাঁর লোকদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হয়েছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরতায় হয়েছিল এ-প্রতিশোধগ্রহণ সীমাহীন। মোজাফফর-বংশীয় বাকি শাহজাদাগণ এতে ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। একমাত্র মনসুরই আত্মসমর্পণ না করে পাহাড়ে পালিয়ে গেল।

শিরাজ ও অন্যান্য ইরানি রাজ্যগুলো নীরবে মুক্তিপণ পরিশোধ করল। খোৎবায় তৈমুরের নাম পড়া হতে লাগল। প্রতি মোজাফফরকেই তঘ্‌মাচিহ্নিত সনদে শাসনক্ষমতার অধিকারী করা হল। এরা এখন তৈমুরেরই অধীনে শাসকশ্রেণীতে অধিষ্ঠিত হল। ইরানভূমি তাদেরই রইল বটে, কিন্তু তৈমুরের সম্মতিসাপেক্ষে। তিনি দেখতে পেলেন, ইরানিরা খুব বেশিরকম করভারপীড়িত। তিনি তার প্রতিকার করলেন।

ইতিহাসে আছে, শিরাজে অবস্থানকালে তিনি বিখ্যাত ফারসিকবি হাফিজকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ফারসিকবি নিতান্ত শাদাসিধে পোশাকে, দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে, তাঁর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। তৈমুর কঠোরস্বরে কবিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি লিখেছেন,

আমার শিরাজ-বঁধুয়া যদি গো
দিল্ 'পরে মোর হাত বুলায়,
পা'র তলে তার লুটিয়ে দেব গো
সমরখন্দ আর বুখারায়।'

হাফিজ উত্তরে বললেন, 'শাহানশাহ, এটা আমার কবিতা মাত্র।'

তৈমুর চিন্তা করতে করতে বললেন, 'বহু বছর সংগ্রাম করে এই তলোয়ারের বলে আমি সমরখন্দ দখল করেছি। এখন এই সমরখন্দের জন্যই আমি অন্যান্য শহর থেকে মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করছি। আর আপনি কিনা শিরাজের একটা মেয়ের জন্য এ বিলিয়ে দিতে চান?'

কবি একটুখানি ইতস্তত করে মৃদু হেসে বললেন, 'জাঁহাপনা, দেখতেই পাচ্ছেন, এই অমিতব্যয়িতার জন্যই তো আমার আজ এই দুর্দশা!'

এই ত্বরিত উত্তরে তৈমুর খুশি হলেন এবং কবিকে অনেক ধনরত্ন উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন।

একাধিক ইরানি গায়ক-কবি তৈমুরের সাথে সমরখন্দ গিয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের এইসব সাকিদের নিয়ে তাঁর দুঃখের কারণও ঘটেছিল। তাঁর তৃতীয় পুত্র মিরন শাহ্ ছিল বেশ একটুখানি বেহেড ধরনের সন্দিগ্ধ প্রকৃতির ও পাঁড়মাতাল। সময়ে সময়ে খুবই সাহসী, কিন্তু ভারি নিষ্ঠুর। তৈমুরের অধীনে সৈন্যদের সাথে যখন থাকত, তখনই মাত্র তাকে সুস্থ দেখা যেত।

কয়েক বছর পরে তৈমুর তাকে কাস্পিয়ান এলাকার শাসনভার দিলেন। কিন্তু তার একবছর পর ভারত থেকে ফিরবার পথে তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর ছেলে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। তাতার কর্মচারীরা তাঁকে বড় বড় শহরগুলোতে তার পাগলামির কাণ্ডকারখানার বিবরণ শোনাল। জানালা দিয়ে জনতার মধ্যে মুদ্রা ছড়ানো, মসজিদের ভেতর মদ্যপানের উৎসব করা—এইসব। তারা বোঝাল যে, একবার ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার ফলেই তার এরূপ মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। এজন্য এ-ধরনের কথাও সে বলতে পেরেছে, 'দুনিয়া-জাহানের শাসকের পুত্র আমি; এমন কাজ কি নেই, যাতে আমিও স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারি?' এই বলে সে তাব্রিজ ও সুলতানিয়ার হাসপাতাল ও প্রাসাদের দেয়াল ভাঙতে আদেশ দিয়েছিল। তাতারদের কাছে তৈমুরের পুত্রের আদেশই হচ্ছে আইন, তাই ভাঙন শুরু করা হল। কিন্তু তারপর তার আরো পাগলামি শুরু হয়। তার আদেশে এক বিখ্যাত ইরানি দার্শনিকের কবর খুঁড়ে তাঁর লাশ তুলে তা এক ইহুদি কবরখানায় সমাহিত করা হয়। মিরন শাহের মন মদ ও ঔষধের বিষে বিষাক্ত হয়ে গেছে।

অফিসারগণ বলল, 'না, এ আল্লাহ এশ্‌কের যন্ত্রণা। ঘোড়া থেকে পড়ে তার মাথা কি মাটি স্পর্শ করেনি?'

তারা চলে গেলে তৈমুরের সিংহদরজায় একজন মহিলার আবির্ভাব হল। তিনি ছিলেন বোরখাবৃতা ও তাঁর পরনে ছিল কালোবরনের পরিচ্ছদ। তাঁর সাথে কোনো অনুচর ছিল না। দ্বারীর কানে-কানে একটা কথা বলাতেই দ্বার খুলে গেল এবং তার

মাথাও নত হয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি তৈমুরকে খবর দেবার জন্য রাজসরকারকে পাঠিয়ে দিল। সে জানাল, 'আপনার মেয়ে আপনাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করছে—একাকী।'

এভাবে তৈমুরের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন খানজাদে—তৈমুরের প্রথম সন্তান জাহাঙ্গিরের বিধবা স্ত্রী। খানজাদে দ্রুতপায়ে তৈমুরের সম্মুখে হাজির হলেন। সরকার চলে না-যাওয়া পর্যন্ত অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নতুন শোকচিহ্নস্বরূপ কালোপোশাকে আবৃত সুন্দর মুখের সুবিধা পুরাপুরি গ্রহণকল্পে তিনি বোরখা অপসারিত করলেন এবং তৈমুরের পায়ে পড়ে বললেন, 'শাহানশাহ, আমি আপনার পুত্র মিরন শাহের শহর থেকে এসেছি।'

নির্ভয়ে তিনি কথা বলতে লাগলেন। তাতারবাহিনী কর্তৃক পর্যুদস্ত তাঁর আপন গোষ্ঠীর লোকদের নিরাপত্তার জন্য ইতঃপূর্বে তিনি যেভাবে ওকালতি করেছিলেন, তেমনিভাবেই তিনি বলতে লাগলেন। কথায় যা প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তাঁর স্বরে তা-ই ফুটে উঠছিল। তিনি তাঁর অনুচর ও সখীদের নিয়ে মিরন শাহের আশ্রয়ে এক নগরে বাস করছিলেন। তৈমুর-পুত্র যখন পাগলামিপূর্ণ কাণ্ডকারখানা শুরু করল, তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তার অনুচরদের বাধাদান সত্ত্বেও, তৈমুর-পুত্র জোর করে তাকে (খানজাদেকে) ধরে তার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর উপর সে তার সৌন্দর্যক্ষুধা মিটাল—তাঁর বেইজ্জতির আর বাকি রাখল না।

বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন, 'শাহানশাহ, আমি আপনার আশ্রয় এবং বিচার চাই।'

খানজাদের স্বামী এখন আর বেঁচে নাই। তাকে তৈমুর ভালোবাসতেন এবং নিজের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। তাতারদের নিয়ম অনুসারে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এখন জীবিত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মিরন শাহ। মরুভূমির খানদের আমল থেকে এ-নিয়মই চলে আসছে যে, শাসকদের প্রথম চারপুত্রের উপরই তাঁর উত্তরাধিকার বর্তাবে। জাহাঙ্গির এবং ওমর শেখ এখন পরপারে; মিরন শাহ এবং রাজপ্রাসাদের কর্ত্রী বেগম সারাই খানমের পুত্র সর্বকনিষ্ঠ শাহরোখ—তৈমুরের এই দুই পুত্র তখন বর্তমান। কিন্তু শাহরোখ জাহাঙ্গিরের ঔরসজাত খানজাদের সন্তানদের চাইতে সামান্য বড় ছিল মাত্র। তা ছাড়া শাহরোখ ছিল নিতান্তই শান্তপ্রকৃতির ছেলে। রাজকীয় ঝগড়া-ফ্যাসাদের চাইতে বই ছিল তার বেশি প্রিয়।

কাজেই উত্তরাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল মিরন শাহ এবং খানজাদের ছেলেদের মধ্যে। তৈমুর তাঁর বড়ছেলেকে এক বিরাট অঞ্চলের শাসনভার দিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপক ব্যভিচারিতায় সে তার অধিকারের অবমাননা করল। হয়তো খানজাদের অনুরূপ ফলের পরিকল্পনা নিয়েই মিরন শাহের কাছে গিয়েছিলেন—কিংবা হয়তো খানজাদের সৌন্দর্যই এই গোলমাল পাকিয়ে তুলল। এরও কয়েক বছর পরে খানজাদের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে খলিলকে ঘিরে যে-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, স্বয়ং খানজাদেরও তা কল্পনার বাইরে ছিল।

আপাতত খানজাদের সাহস ছিল প্রশংসনীয়। রাজার কাছে তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েও তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তৈমুর বিচারে বিলম্ব করলেন

না। নষ্টসম্পত্তি তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন, আর দিলেন তাঁকে নতুন দাসদাসীর দল। জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর যোগ্য মর্যাদায়ও তিনি তাঁকে অধিষ্ঠিত করলেন। তিনি নিজে এক অভিযান থেকে সবেমাত্র ফিরে এলেও আবার সুলতানিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে অফিসারদের আদেশ দিলেন।

সেখানে গিয়ে যথাযোগ্য তদন্তে তিনি মিরন শাহের কুকীর্তির কথা জানতে পারলেন। ছেলেকে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বড় বড় ওমরাহরা বাধা দিলেন—এমনকি, যারা মিরন শাহের হাতে নির্যাতিত হয়েছিল, তাদের অনেকেও। মিরন শাহকে তার গলার চারিদিকে দড়ি বেঁধে পিতার সামনে হাজির করা হল।

যাই হোক, তৈমুর তাকে বাঁচতে দিতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু তার সমস্ত শাসনক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। ভগ্নমনা ও ক্ষমতাচ্যুত হয়ে মিরন শাহ অন্যলোকের শাসনাধীনে সে-প্রদেশেই বাস করতে লাগল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই রু দ্য গঞ্জালিস ক্লাভিজো ক্যাস্টাইলের দরবার থেকে দূত হয়ে সমরখন্দে যাওয়ার পথে সুলতানিয়ায় থেমেছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'মিরন শাহ যখন এসব কাজ করে, তখন তার সাথে 'গানসাদা' নাম্নী একজন স্ত্রীলোক ছিল। সে ছদ্মবেশে তাকে ছেড়ে দিবারাত্রি চলে তৈমুরের দরবারে পৌঁছে এবং তাঁকে তাঁর পুত্রের কীর্তির কথা জানায়। তৈমুর পুত্রের শাসনক্ষমতা কেড়ে নেন। এই 'গানসাদা' তৈমুরের সাথে রয়ে গেল। তৈমুর তাকে ফিরে যেতে দিলেন না এবং তার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করলেন। মিরনকে দিয়ে তার এক ছেলে হল—নাম খলিল সুলতান।'

এইবার তৈমুরের সব রাগ গিয়ে পড়ল মিরন শাহের সঙ্গীসাথিদের উপর। আলঙ্কারিক, ভাঁড়, বিখ্যাত কবি প্রভৃতি মিরন শাহের মদের পিয়ালার সাথিগণকে একে একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল।

২০
সাম্রাজ্য

১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে তৈমুর বিপ্লবের সূতিকাগার মধ্য-এশিয়া এবং ইরানের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্বলাভ করলেন। একমাত্র উপাধি গ্রহণ ছাড়া সর্ববিষয়ে তিনিই ছিলেন সম্রাট। তাঁর একমাত্র উপাধি ছিল, আমির তৈমুর গুরিগান। তখনো পর্যন্ত তাঁর নামমাত্র উপরওয়ালা ছিলেন চেঙ্গিজ খানের বংশধর 'তুরা' খান। এই পুতুল-প্রভু খানের অবশ্যি কাজ কিছুই ছিল না। তাঁর অধীনে মাত্র এক ডিভিশন সৈন্য রাখা হয়েছিল এবং সমরখন্দে তাঁর বাসের জন্য একটা প্রাসাদও দেওয়া হয়েছিল। অবশ্যি কোনো-কোনো উৎসবে তিনি যোগ দিতেন—যেমন, যখন কোনো সন্ধিশর্ত অবশ্যপালনীয় করার উদ্দেশ্যে শাদা ঘোড়া জবাই করা হত, কিংবা ঘোড়ার লেজমার্কা নিশানের সমুখ দিয়ে যখন দুলাখ সৈন্যের বাহিনী বার্ষিক মহড়া দিত। কিন্তু শাসন-

বিবরণীতে তাঁর নামের উল্লেখ খুব কমই দেখা যায়। তাঁর মর্যাদা খঞ্জ দিগ্বিজয়ীর উজ্জ্বলতায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তবে খেয়েদেয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল তাঁর পরম আনন্দেই; সামরিক মহড়ার জাঁকজমকও তিনি উপভোগ করছিলেন বইকি! কিন্তু তাতেও তাঁর অংশগ্রহণ প্রতিবছর ক্রমে কমে আসছিল।

তৈমুরের এই ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যেরও বিশেষ কোনো নাম ছিল না। তাঁকে তখনো মা-অরা-উন্নাহারের আমির বলেই সম্বোধন করা হত—যদিও তাঁর অধিকৃত এলাকার সর্বত্র তাঁর নামে খোৎবা পড়া হত।

তাঁর এই প্রভুত্বের মূলে ছিল সামান্য ব্যাপার। মধ্য-এশিয়ার লোকেরা তাদের গোষ্ঠীর দলপতিদের দ্বারা শাসিত হত। যদি এই 'শাদাদাড়ির' দলপতি তাদের না-পছন্দ হত, তবে অন্য মুলুকে তারা হিজরত করত এবং সেখানকার দলপতির হাতে নিজেদের জীবনভার তুলে দিত। কোনো কারণে সে-ব্যবস্থায়ও সন্তুষ্ট হতে না পারলে, তারা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে দলপতি নির্বাচন করে সকলে তাঁর 'নিমক' গ্রহণ করত। নবনির্বাচিত নেতার পক্ষ নিয়ে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

এরা ছিল নিজেদের নাম ও গোষ্ঠী সম্পর্কে খুবই গর্বিত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং প্রচলিত আচার-ব্যবহার রক্ষণে তারা ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। এ-কারণে স্বেচ্ছাচার ছিল তাদের রক্তের সাথে মিশে এবং সবকিছুতেই তারা ছিল অসহিষ্ণু। এরা ছিল যাযাবর-সন্তান—রাজরাজড়াদের একান্ত বশংবদ। এদের মধ্যে যারা লুট করার আশায় পাহাড়ি রাস্তায় শকুনির মতো বসে থাকত, তারা পর্যন্ত কতকগুলো নাম আওড়াতে পারত। বাদশাহ সুলেমানের গৌরব, সেকান্দরের দিগ্বিজয়ী-কাহিনী—যে-সেকান্দরকে তারা বলত 'জুল-কার-নায়েন' বা দু-জাহানের প্রভু বলে—আর স্বর্ণসিংহাসনের অধিকারী মাহমুদ গজনভি। এঁদের গৌরবগাথা তারা অনর্গল বলে যেতে পারত। তারা তাদের বংশতালিকা সগর্বে নুহ পয়গম্বর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত। তিনিই তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বলে দাবি জানাত।

হজযাত্রীদের সুদীর্ঘ রাস্তার দুপাশের সবগুলো কবরের পরিচয় ও তাদের ইতিহাস তাদের জানা ছিল, আর 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা তওরিতজব্বুরের কাহিনী ছিল তাদের কণ্ঠস্থ। এসব কাহিনী মুখস্থ বলতে গিয়ে তাদের মধ্যে যে-প্রতিযোগিতা হত, তাতে গালাগালির বহর বড় কম থাকত না। তাতে অবশ্য বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ নুহের তুফান পর্যন্ত সুদীর্ঘকালব্যাপী তাদের বংশতালিকার পুনরাবৃত্তিতে ভুলত্রুটির সম্ভাবনা তো ছিলই! লিখিত আইন তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অস্পষ্ট কিংবদন্তির সমর্থনে খুনখারাবিতেও তাদের দ্বিধা ছিল না। সুদের ব্যবসাকে তারা বিদ্রূপ করত, আর অত্যাচারী ট্যাক্স-আদায়কারী তাদের হাতের ছুরি খেয়ে মরত।

যতদিন তৈমুরের শক্তিমত্তায় তাদের সন্দেহ ছিল, ততদিন তাঁর সাথে তারা যুঝেছে। পরে তৈমুরের 'নিমক' খেয়ে তারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। ওদের শাসন করবার জন্যে দরকার ছিল লৌহহস্তের।

আগে কখনো এরা সংঘবদ্ধ হতে পারে নাই। এদের অনেককে মাহমুদ একবার সংঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। চেঙ্গিজ খানও এদের একত্র করেছিলেন, কিন্তু তাঁর

মৃত্যুর পর আবার তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নতুন নতুন দলপতির অধীনে গিয়ে জমায়েত হয়।

তাদের বর্তমান সংঘবদ্ধতার মূলে ছিল একটা জিনিস—তা হল তৈমুরকে মেনে চলার ইচ্ছা। তাদের ঐক্যবদ্ধ রাখা ছিল কতকটা নেকড়ের দলকে চামড়ার রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখার মতো। কাশগড়ের ঘোড়াশিকারি, হিন্দুকুশের লুটেরা পাহাড়িজাতি, জাট ও সোনালি মোঙ্গল যাযাবরদের যুদ্ধপ্রিয় বাকি অংশ, সূর্যের দেশের ইরানি আমির আর অসমসাহসিক আরব—এদের কোনো আইন দিয়েই বাঁধা যায় না।

এদের সামলে রাখতে গিয়ে তৈমুরকে আইনের প্রয়োগ নিজহাতে রাখতে হল। এদের প্রতি আদেশ-নির্দেশ তিনি নিজে দিতেন। সাহসীরা তাঁর কাছে ভিড়তে পারত। কিন্তু তাঁর হয়ে শাসন করার ক্ষমতা তিনি কাউকে দেননি। যখন কোনো রাজ্য জয় হত, বা কোনো রাজ্য আপন ইচ্ছায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করত, তা তাঁর কোনো পুত্রকে বা সৈন্যদলের কোনো উচ্চপদস্থ আমিরকে সামন্ততান্ত্রিক ইজারা হিসেবে দেওয়া হত। সেটা তাঁর নতুন সাম্রাজ্যেরই একটা প্রদেশ হিসেবে গণ্য হত এবং তা তৈমুরের কাছে দায়ী একজন দারোগা বা শাসনকর্তা কর্তৃক শাসিত হত। দারোগার সাথে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও নিযুক্ত হত। যেসব যোদ্ধা সৈন্যদলে যোগ দিত, তারা আপন ইচ্ছায় চলেও যেতে পারত। কিন্তু শিল্পী ও শ্রমিকগণকে প্রয়োজনের সময়ে দলে ঢোকানো হত। আগেকার শাসকগণকে দরবারে স্থান দেওয়া হত এবং স্বাধীন পদবি ও কাজ দেওয়া হত। যদি তারা গোলমাল করত, তবে তাদের বন্দি করা হত কিংবা মেরে ফেলা হত।

তৈমুরের অমিত শক্তি ব্যর্থতার আশঙ্কায় ছিল অসহিষ্ণু। যেখানেই তাঁকে কোনো ভাঙা সেতু পার হতে হত, তিনি সেখানকার শাসনকর্তাকে তা মেরামত করার আদেশ দিতেন। পুরনো সরাইখানাগুলো মেরামত করা হল। রাস্তার ধারে অনেক নতুন ঘর তৈরি হল। শীতকালে রাস্তা খোলা রাখার ব্যবস্থা হল এবং রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে পাহারাদারদের ঘর নির্মিত হল। রাস্তারক্ষী-বাহিনীর অফিসারগণকে ডাকের ঘোড়াগুলোর ভার দেওয়া হল। কাফেলাগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বও তাদের উপর পড়ল। নিরাপত্তার বিনিময়ে কাফেলাগুলোকে একটা কর দিতে হত।

স্পেনীয় দূত ক্লাভিজো খোরাসান-রাস্তা সম্পর্কে যে-বিবরণ রেখে গেছেন, তার সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

'রাস্তার পার্শ্বে নির্মিত বড় বড় ঘরগুলোতে সফরকারীরা ঘুমায়,—তাতে অন্য কেউ থাকে না। মাটির নিচের পাইপসহযোগে অনেক দূর থেকে এইসব ঘরে পানি সরবরাহ করা হয়। রাস্তা খুবই সমতল—একটা পাথরও তাতে পড়ে নাই। সফরকারীরা কোনো বিরামস্থানে পৌঁছা মাত্র তাদের খেতে দেওয়া হয় প্রচুর গোশ্‌ত্‌ এবং সরবরাহ করা হয় তাজা ঘোড়া। প্রতিদিনের সফর যেখানে শেষ হয়, সেখানে ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা করেছেন তৈমুর—কোনো স্থানে একশো, আবার কোনো স্থানে দুশো পর্যন্ত। সমরখন্দ পর্যন্ত সমগ্র রাস্তায় এইভাবে ডাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি যেদিকে যাকেই পাঠান কিংবা তাঁর কাছে যে-কেউ যেদিক থেকেই আসুক, তারা এইসব ঘোড়ায় চড়ে

রাতদিন দ্রুতবেগে চলতে পারে। মরুভূমিতেও তাঁর ঘোড়া রয়েছে। বসতিহীন স্থানে তিনি বড় বড় বাড়ি তৈরি করেছেন—সেখানে গ্রামবাসীরা যাতে ঘোড়া ও খাদ্য সরবরাহ করে, তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। যারা এসব ঘোড়ার খবরদারি করে, তাদের বলা হয় 'এনচক'। কোনো রাজদূত এসব স্থানে পৌঁছলে এই লোকেরা তাঁর ঘোড়া নিয়ে জিন বদল করে অন্য তাজা ঘোড়া তাঁকে সরবরাহ করে। এ-ঘোড়াগুলোর যত্ন নেবার জন্য দুএক জন এনচক তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেও যায়। পরবর্তী বিরামস্থানে পৌঁছে সেখান থেকে তারা নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসে। যদি কোনো ঘোড়া রাস্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানে অন্য কোনো ঘোড়সওয়ার লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তবে ক্লান্ত ঘোড়া বদলিয়ে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির ঘোড়ায় চড়ে পথ চলবে—নিয়ম হচ্ছে এই যে, বণিক, আমির বা রাজদূত যে-কেউ হোক-না কেন, তাদের ঘোড়া তৈমুরের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতেই হবে। যদি কেউ গররাজি হয়, তবে তার শাস্তি মৃত্যু। কারণ এটাই তৈমুরের আইন। এমনকি, সৈন্যদের কিংবা স্বয়ং তৈমুরের পুত্র বা স্ত্রীদের ঘোড়াও তারা নিতে পারে। রাস্তায় ডাকের ঘোড়াই শুধু সরবরাহ করা হয় না, সমস্ত রাস্তায়ই বার্তাবহগণ নিযুক্ত রয়েছে। এ-কারণে প্রতি প্রদেশ থেকেই বার্তাবহগণ কয়েক দিনের মধ্যে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিতে পারে। তৈমুর তেমন লোকের প্রতিই সন্তুষ্ট হন, যে রাতদিন চলে পঞ্চাশ লিগ অতিক্রম করতে গিয়ে দুটো ঘোড়া মেরে ফেলে। আর যারা এইটুকু রাস্তা যেতে তিনদিন সময় নেয়, তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট নন। সমরখন্দ সাম্রাজ্যে লিগগুলো খুব লম্বা বলে তৈমুর প্রতি লিগকে দুভাগে ভাগ করে খুঁটা পুঁতে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিদিন এর বারো কিংবা অন্ততপক্ষে দশ লিগ রাস্তা অতিক্রম করতে তিনি তাঁর সব জাগাতাইকে আদেশ দিয়েছেন।

এর* প্রতি লিগ ক্যাস্টাইলের দুই লিগের সমান। সত্যি বলতে কি, না-দেখলে এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, এসব লোক রাত্রি-দিনে কখনো কখনো পনেরো থেকে কুড়ি লিগ পর্যন্ত অতিক্রম করে থাকে। ঘোড়াগুলো হোঁচট খেয়ে পড়লে তারা সেগুলো মেরে ফেলে কিংবা বিক্রি করে দেয়। আমরা রাস্তার ধারে এমন বহু নিহত বা মৃত ঘোড়া দেখেছি।'

ক্লাভিজো আরো বলেছেন, ডাকের বিরামস্থানগুলোতে গরমকালে ফোয়ারাগুলো বরফভরতি করে রেখে দেওয়া হত। এর সাথে পানি খাওয়ার জন্য পিতলের জগও থাকত।

ডাকের রাস্তা দিয়ে দূতেরা তৈমুরের নিকট নিয়ে আসত নানা ধরনের খবর—সীমান্ত-অঞ্চল থেকে 'উষ্ট্রবাহিনীর' বার্তা, সীমান্তের ওপার থেকে সেনাপতিদের দলিলপত্র এবং নগর-দারোগাদের সংবাদ। প্রতি প্রদেশ এবং সাম্রাজ্যের বাইরের প্রতি নগর থেকে তৈমুরের গুপ্তচরবাহিনী গোপন খবরে তাঁকে জানাত—কোথায় কী হচ্ছে,

---

* এক লিগ পঞ্চাশ থেকে বাহাত্তর মাইল। ক্লাভিজো যাদের 'জাগাতাই' বলে উল্লেখ করেছেন, তারাই হচ্ছে চাগাতাই বা জাট। সম্ভবত ক্লাভিজোর এই বিবরণের ফলেই বিভিন্ন ইতিহাসে তৈমুর সম্পর্কে এই অদ্ভুত গল্প লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, তিনি তাঁর আমিরদের দৈনিক ৬০ মাইল ঘোটকারোহণে ভ্রমণের আদেশ দিয়েছেন।

কোন্ কাফেলা কোন্ রাস্তায় যাচ্ছে এবং তাদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে। তাঁর অফিসারদের আচরণ সম্পর্কে সঠিক খবর সরবরাহ করতে হত। যদি কোনো খবর মিথ্যা প্রমাণিত হত, তবে সংবাদদাতার আর রেহাই ছিল না। তৈমুরের সংবাদ-সরবরাহ-ব্যবস্থা ছিল রেলরাস্তা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা দ্রুততম।

ভূমি ও সম্পত্তি-সমস্যারও তিনি সুমীমাংসা করলেন। তাঁর সৈন্যেরা সৈনিক-অর্থভাণ্ডার থেকে বেতন পেত। এজন্য জনসাধারণের উপর কর ধার্য করা হত না। বিনাকারণে কোনো বেসামরিক অধিবাসীর গৃহে প্রবেশ সৈনিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। উত্তরাধিকারীবিহীন সম্পত্তি বা পতিত জমির উপর অধিকার বর্তাত রাষ্ট্রের। কোনো কৃষক বা বিত্তবান লোক যদি সেচের ব্যবস্থা করত, তবে প্রথম বছরে বিনা-খাজনাতেই উক্ত জমি সে দখল করতে পারত। দ্বিতীয় বছরে নিজের বিবেচনা অনুসারেই সে খাজনা পরিশোধ করতে পারত। কিন্তু তৃতীয় বছরে সরকারিভাবে তার খাজনা নির্ধারণ করা হত।

ফসল মাড়ানো শেষ হলে পরে কর আদায় করা হত। সাধারণ নিয়ম ছিল—কর হিসেবে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়ার—রৌপ্যমুদ্রায় এর দাম ধরেও কর দেওয়া চলত। সেচের জমির কর ছিল বৃষ্টির জমির করের চাইতে বেশি। কৃষকেরা ধর্মগোলায়ও ফসল দিত।

মালসামগ্রী নিয়ে সাম্রাজ্যে আগত বণিকদের শুল্ক এবং রোডসেস দিতে হত। এটা ছিল সাম্রাজ্যের বড় একটা আয়। কারণ সুদূর প্রাচ্য থেকে ইউরোপযাত্রী বণিকদল মিশরের রাস্তা বর্জন করে চলত এইজন্য যে, সেখানকার মামলুকরা ছিল ভীষণ খ্রিস্টানবিরোধী। পশ্চিমদিকের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত সাধারণত গোবি মরুভূমির ভেতর দিয়ে প্রসারিত বিরাট উত্তর-রাস্তা দিয়ে, আলমালিক অতিক্রম করে, সমরখন্দ হয়ে এবং সেখান থেকে সুলতানিয়া ও তাব্রিজের ভেতর দিয়ে কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে কনস্টান্টিনোপল হয়ে। এই বিশাল সুদীর্ঘ পথই হচ্ছে খোরাসান রোড। এর থেকে এক শাখা বেরিয়ে উত্তরদিকে উরগঞ্জ পর্যন্ত গেছে। আর-এক শাখা কাস্পিয়ান পার হয়ে জেনোয়া পর্যন্ত গিয়ে রুশসীমান্ত বরাবর চলে গেছে। তৃতীয় শাখা গেছে দক্ষিণদিকে ইরান হয়ে ভারত-সন্নিহিত বন্দরের দিকে।

সাগরপথে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ কিছু ছিল না। ক্বচিৎ-কদাচিৎ আরব বণিকেরা জাহাজে ভারত প্রদক্ষিণ করে চীন হয়ে ক্যাথে পর্যন্ত, আবার চীনা বণিকেরা সাগর-উপকূল ধরে বাঙলার তটভূমি পর্যন্ত আসত। কিন্তু এটা জাহাজের মালিক ও ধনী ব্যবসায়ী ছাড়া আর কারুর পক্ষে বড় সম্ভব হত না। নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য কিন্তু খুব চালু ছিল। আমুদরিয়া দিয়ে উরগঞ্জ পর্যন্ত, সিন্ধুনদ দিয়ে আরবসাগর পর্যন্ত এবং দজলা ও ফোরাত নদী দুইটি দিয়ে বিপুল বাণিজ্যসম্ভার পরিচালিত হত।

সে-সময়ে তৈমুর ভারতে যাওয়ার দুইটা রাস্তা খুলেছিলেন। কাবুল থেকে খাইবার পাস হয়ে, আর কান্দাহার থেকে গিরিসঙ্কট বেয়ে সিন্ধুনদ পর্যন্ত। তিনি এক আক্রমণেই সিজিস্তানের রাজাকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করেছিলেন এবং সেখানে থাকার সময়েই তিনি জন্মের মতো খোঁড়া হয়েছিলেন। আরেক অভিযানে তিনি শিরাজ

থেকে মরুভূমি পার হয়ে পারস্য উপসাগরের তীরস্থ বন্দরগুলোতে পৌঁছেছিলেন। সেসব বন্দর থেকে জাহাজ উত্তরদিকে বাগদাদ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সিন্ধুনদের মোহনা পর্যন্ত গিয়েছিল। পশ্চিমদিকে 'কালো ভেড়া' তুর্কম্যানদের দুর্গ এবং মার্বেল-নগরী মসুলের উপর তিনি হামলা চালিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমরখন্দ থেকে পনেরোশত মাইল দূরবর্তী উত্তর-দজলার দুর্গগুলো অধিকার করেছিলেন। এইখান থেকে তিনি তাব্রিজের বিরাট বাণিজ্যসম্ভার তাঁর সাম্রাজ্যের কাজে লাগাতে পারতেন। তাব্রিজে তখন ছিল দশলক্ষাধিক লোকের বাস। উত্তর ও দক্ষিণের বাণিজ্যসম্ভার খোরাসান রোড দিয়ে এখানে এসে কেন্দ্রীভূত হত। এক তাব্রিজ থেকে তৈমুর যে-রাজস্ব পেতেন, ফ্রান্সের রাজার বার্ষিক রাজস্ব তার চেয়ে ছিল কম।*

এরূপ শহরে এর নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো ট্যাক্স দিত না বটে, কিন্তু নগর-পরিষদ তৈমুরের দারোগাকে একটা অর্থ যোগাত। এটাও কর। যতদিন এটা দেওয়া হয়েছিল, ততদিন শহরের উপর অত্যাচার হয় নাই।

কাফেলার বণিকদের কাছে তৈমুরের শাসন ছিল একটা বরস্বরূপ। কারণ তারা মাত্র একটা শুল্ক দিয়েই পাঁচমাস ধরে রক্ষী-পরিবৃত হয়ে তৈমুরের রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে পারত। ক্ষুদ্র জমিদার ও কৃষকদের কাছেও তৈমুরের শাসন লাভজনক হয়েছিল; কারণ এর ফলে তারা সামন্তরাজাদের অত্যাচার থেকে থেকে রক্ষা পেল। তৈমুরের শাসননীতি ছিল এইদিক দিয়ে পরিষ্কার : ভাগ্যহত মানুষ কারুর কোনো কাজে লাগে না; বিধ্বস্ত রাজ্য থেকে আর্থিক লাভ অসম্ভব। অর্থের সাহায্যে সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করা যায়। আর সৈন্যবাহিনীই হচ্ছে নয়া সাম্রাজ্যের ইমারত। যে-কোনো স্থান থেকে সে সুপেয় পানি সংগ্রহ করতে পারে, প্রয়োজনের সময়ে শস্য যোগাড় করতে পারে। কিন্তু তার ফলে কৃষকদের হয় অপরিমেয় ক্ষতি।

তৈমুর মানুষের দুর্বলতা সহ্য করতে পারতেন না। প্রতি নগরীতে ভিখারিদের ভিড় দেখে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। তাদের তিনি ভিক্ষা করতে নিষেধ করলেন এবং তাদের জন্য কিছুটা রুটি-গোশ্‌তেরও বরাদ্দ করলেন। ভিখারিরা তাঁর রুটি-গোশ্‌ত্ গ্রহণ করল বটে, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আবার তারা তাদের স্বভাবসুলভ নাকীসুরে কান্না শুরু করল, 'ইয়া হক, ইয়া হক! আল্লাহ্ করিম!' দরবেশ ও প্রতারক, অন্ধ-খঞ্জ ও বদমাশ—এরা ভিক্ষা করা ত্যাগ করল না। কারণ এটা হচ্ছে ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিধান! তৈমুরের সৈন্যরা নিরর্থক ওদের হত্যা করল।

চোরদের ব্যাপারে কিন্তু তৈমুর বেশ সফল হলেন। শহরের ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং রাস্তার রক্ষিবাহিনীর কাপ্তানগণ জেলার ভিতরে চুরি হলে তার জন্য দায়ী থাকবে বলে তিনি নির্দেশ জারি করলেন। নির্দেশে বলে দেওয়া হল যে, কোনো জিনিস চুরি গেলে তা তাদেরই পূরণ করতে হবে।

---

* এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তখন তাব্রিজই ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নগরী—অবশ্য চীন বাদ দিয়ে। সমরখন্দ, দামেস্ক ও বাদগাদ ছিল তার চাইতে ছোট। তবে শেষোক্ত শহরগুলিতে যেসব বড় বড় প্রাসাদ ছিল, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে রোমেও তেমন জাঁকজমকপূর্ণ ও ঐশ্বর্যময় প্রাসাদাবলি ছিল না।

কিন্তু তৈমুরের বিধান তাঁর ইচ্ছার বেশি আর কিছু ছিল না। তাঁর নিজরাজ্যের বাইরে তাঁর বিধান ছিল নতুন এবং সেখানে তা জারি করাও সম্ভব ছিল না। এখানে-ওখানে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠল এবং তা দমন করতে তাঁকে কয়েকবার অভিযানও করতে হল। তাঁর পরিচালনাগুণে তাঁর সৈন্যবাহিনী এক সুশৃঙ্খল মেশিনে পরিণত হল—যা জয় ছাড়া পরাজয় জানত না।

এই ছিল তাঁর গর্ব এবং এতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সারা এশিয়া জয় করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

২১
ঘোড়সওয়ার

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে খঞ্জ দিগ্বিজয়ীর কাছে এ-প্রবাদের সত্যতা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট হয়েছিল, যে একবার রেকাবে পা দিয়েছে, তাকে ঘোড়ায় চড়তে হবে।

এখন তাঁকে সমরখন্দে বা শিকাররত অবস্থায় পাহাড়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা যেত। তাঁর পাটরানী সরাই খানুম রাজোচিত মর্যাদাসহকারে এখানে-ওখানে যেতেন—কাফ্রি ক্রীতদাসরা তাঁর বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করত, দুপাশ থেকে সেহেলিরা তাঁর মস্তকাবরণের মণিমুক্তাখচিত পালক বয়ে চলত। তাঁর পায়ের নিচে নীল পাথরের বিশাল চত্বর নির্মিত হল। তৈমুর এসবের পরিকল্পনা করিয়েছিলেন ইরানি শিল্পীদের দিয়ে। কিন্তু শিল্পীদের কাজ তদারক করা, বা চীন, ভারত ও বাগদাদের রাজদূতদের সাথে দেখা করা বা তাঁর নাতিদের সালাম গ্রহণ করা অথবা বিরাট ভোজের আয়োজনের ব্যবস্থা করা—এসব নিয়ে আর বেশি সময় ব্যয় তিনি এখন করতে পারেন না—আবার তাঁকে বেরিয়ে পড়তেই হয়।

অভিযানে বেরিয়ে তৈমুর দুই সেট শামিয়ানা ব্যবহার করতেন। প্রথম শামিয়ানায় পরদাঘেরা প্রাসাদে তিনি যখন ঘুমুতেন, অন্যটাকে তখন পশুবাহিনীর পিঠে করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হত—পরবর্তী বিরামস্থানে পাঠাবার জন্য। কাজেই সবসময়েই শামিয়ানার প্রাসাদ তিনি তৈরিই পেতেন। গালিচা বিছিয়ে, পরদাঘেরা করে তা সজ্জিত রাখা হত। তাঁরই শামিয়ানার চারদিকে তাঁবু খাটানো হত কুলচিদের—মানে বারো হাজার রক্ষিবাহিনীর।

বাহাদুরদের থেকে রক্ষীদলের অফিসার নির্বাচিত করা হত। সবরকম কঠিন কাজে তাদের নিযুক্ত করা হত এবং সবসময়ে পুরস্কৃত করা হত। তৈমুর একবার বলেছিলেন, 'বহুদিনের পুরনো সৈন্যদের কখনো যথোপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। কারণ এসব লোক নশ্বর মর্যাদার জন্য স্থায়ী সুখ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এ-কারণে এরা এনামের যোগ্য।' এ-নীতিই তিনি মেনে চলতেন। আগে একবার তিনি এইশ্রেণীর হাজার লোকের নাম টুকে রেখেছিলেন, এবার তাঁর রক্ষীদলের সৈন্যদের নাম—এমনকি, তাদের ছেলেদের নামও লিখিয়ে রাখলেন। তাঁর

সেক্রেটারিরা তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের বিবরণও টুকে রাখল।

ব্যক্তিগত বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ এইশ্রেণীর সৈন্যদের দশজনের সরদার করে দেওয়া হত। দলের সরদারগণকে একটি কোম্পানির কাপ্তান করা হত। এদের পদের পরিচায়ক-চিহ্ন হিসেবে কাউকে দেওয়া হত কোমরবন্ধ, কাউকে-বা কারুকার্যখচিত কলারওয়ালা কোট। কোনো-কোনো সময়ে ঘোড়া এবং তলোয়ারও উপহার দেওয়া হত। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিদিগকে দেওয়া হত নিশান এবং রণভেরি। এই আমিরগণ নিজেদের সঙ্গে নিতে পারতেন একশত ঘোড়া।

যুদ্ধজয়ী আমিরগণকে আরো মূল্যবান এনাম দেওয়া হত—রাজস্বসহ একটা শহর। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একটা প্রদেশ পর্যন্ত তাদের ইজারা দেওয়া হত। পদোন্নতি ছিল গুণানুসারে—যদিও আমিররা ছিলেন রাজবংশের লোক। পুরনো লোকের মধ্যে যে-কয়জন তখনো বেঁচে, জকু বারলাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমির-শ্রেষ্ঠ এবং এনামস্বরূপ পেয়েছিলেন বল্‌খের শাসনভার।

যারা ব্যর্থতার জন্য কৈফিয়ত দিত, কিংবা বিপদের সময়ে পিছিয়ে যেত, কিংবা যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আগে পলায়নের রাস্তা ঠিক করে রাখত—এসব লোককে তৈমুর পছন্দ করতেন না। নির্বোধদের বেলায় তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু। একাধিকবার তিনি বলেছেন, 'বুদ্ধিমান শত্রু নির্বোধ বন্ধুর চাইতে কম বিপজ্জনক।'

আরব শাহ্ নামক জনৈক ঐতিহাসিক এ-সময়কার তৈমুরের যে-চিত্র এঁকেছেন, তা এইরূপ : 'এই দিগ্বিজয়ী ছিলেন দীর্ঘ, মাথা বড়, কপাল প্রশস্ত। যেমনি ছিল তাঁর শারীরিক শক্তি, তেমনি সাহস। প্রকৃতি তাঁর চেহারায় কোনো খুঁত রাখেন নাই। তাঁর চামড়া ছিল শাদা, বর্ণ উজ্জ্বল। হাত-পাগুলো সবল, কাঁধ প্রশস্ত এবং আঙুলগুলো লৌহকঠিন। তাঁর দাড়ি ছিল লম্বা, হাত শুকনো। ডানপায়ে তিনি খুঁড়িয়ে চলতেন। কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর গভীর। মধ্যবয়সেও যৌবনোচিত দৈহিক শক্তি ও মনোবল তাঁর এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় নাই—তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতোই দৃঢ়। মিথ্যাবলা ও ঠাট্টাবিদ্রূপ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। অপ্রিয় হলেও সত্যকথাই তিনি শুনতে চাইতেন। দুর্ভাগ্যে তিনি যেমন বিচলিত হতেন না, সৌভাগ্যেও তেমনি হতেন না আনন্দে আত্মহারা। তাঁর সিলমোহরের উপর দুটো ফারসি শব্দ ছিল : 'রাস্তি রাউস্তি', মানে শক্তিই ঠিক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং কখনো মুখে আনতেন না হত্যা, লুট ও মেয়েদের শ্লীলতাহানির কথা। সাহসী সৈন্যদের তিনি ভালোবাসতেন।'

অল্পবয়সেই তৈমুরের চুল পেকে গিয়েছিল। অন্যদের বর্ণনায় তৈমুরের চামড়া কালো ছিল বলে উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু একজন আরবের কাছে তাঁর চামড়া শাদা মনে হয়েছিল। আশ্চর্য এই যে, এই বর্ণনা হচ্ছে ইবনে আরব শা-র। তৈমুর এঁকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ইনি তৈমুরকে ঘৃণা করতেন।

তৈমুরের উল্লেখযোগ্য সৈন্যদের নামের তালিকায় আকবোগা নামক একজন তাতারি সৈন্যের নাম পাওয়া যায়। যেমন চেহারায়, তেমনি শক্তিতে ছিলেন তিনি একজন বীর সৈনিক। তিনি দশজনের সরদার, কিন্তু ঘোড়া ছিল তাঁর মাত্র একটি।

তাঁর সম্পর্কে এরূপ শোনা গেছে, ইরানে দ্বিতীয়বারের অভিযানের সময়ে আকবোগা সঙ্গীবিহীন হয়ে রাস্তার ধারের এক গ্রামে গিয়ে পড়েছিলেন—মানে, সেখানে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। শত্রুদেশ বলে তিনি ঘোড়াটা বেঁধে রেখেছিলেন দরজার কাছেই। তিনি কোমরবন্ধ ঢিলে করে আরামে খাবার-টেবিলে বসেছিলেন। হঠাৎ একজন মাতব্বর লোক এসে তাঁকে জানাল যে, চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ইরানি অশ্বারোহী গ্রামের পুকুরের পাড়ে এসে নেমেছে।

আকবোগা উত্তরে বললেন, 'শিগ্‌গির তোমার লোকজনদের নিয়ে এসো—তারপর আমরা ইরানিদের হামলা করব।'

মাতব্বর লোকটি একথার প্রতিবাদ করে জানাল, ইরানি অশ্বারোহী সংখ্যায় অনেক, কাজেই আকবোগার পক্ষে পালিয়ে যাওয়াই ভালো হবে। কিন্তু তাতার বীর সেভাবে চিন্তাই করলেন না। বললেন, 'আমরা যদি তাদের আক্রমণ না করি, তাদের ঘোড়াগুলো দখল করব কী করে? আল্লাহর নামে বলছি, তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। এইসব ইরানি হল শিয়াল—আমার মতো নেকড়েবাঘ দেখলেই তারা পালিয়ে যাবে। আমি তাদের পালাতে দেখেছি। যাও, শিগ্‌গির তোমার লোকজন নিয়ে এসো।'

তিনি মদ্যপান শেষ করতে লাগলেন, আর গ্রামবাসীরা তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। অশ্বারোহীদের দেখে তারা ভীত হয়েছিল বটে, কিন্তু এই সশস্ত্র বীরকে দেখে তারা আরো বেশি ভয় পেয়েছিল। অবশেষে সত্যই একদল লোক সরাইয়ে এল। আকবোগা নিজ কোমরবন্ধ কষে নিয়ে মাথায় শিরস্ত্রাণ চড়ালেন এবং দাড়ির নিচে দিয়ে চামড়ার ফিতা বেঁধে বাহুর উপর ঢাল বেঁধে নিলেন। তারপর লোকগুলোকে বললেন, 'দ্যাখো, আমি হেঁকে উঠলেই তোমরা ছুট দেবে, কোনো অবস্থায়ই থামবে না।'

গ্রাম্যলোকগুলোকে নিয়ে তিনি মসজিদের দিকে রাস্তার পাশে পুকুর লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটালেন। ইরানিরা তাদের ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে দেখেই তিনি নিজের ঘোড়ার চাবুক কষলেন এবং চিৎকার করে উঠলেন : 'হোর-রা'!

কিন্তু গ্রাম্যলোকগুলোর পক্ষে তরবারিধারীদের সাথে মোকাবিলা করা অসম্ভব। তাই তারা আবার যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে ফিরে চলল। কিন্তু আকবোগার পক্ষে পিঠটান দেওয়া সম্ভব ছিল না—তিনি এগিয়েই চললেন।

ইরানি অশ্বারোহীরা হয়তো ভাবল, এ-লোকটা পিছনে আগুয়ান বিরাট বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্য, কিংবা হয়তো এর বিকট হাঁকে একেবারে ভড়কে গেল। তারা তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে অন্যদিকে চম্পট দিল। তাই দেখে আকবোগাও ঘোড়ায় চাবুক কষে তাদের অনুসরণ করলেন। কিন্তু ইরানি ঘোড়সওয়ারদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। কাজেই আকবোগাকে জয়ী হয়েও খালিহাতেই ফিরতে হল।

গ্রাম্যলোকদের তিনি বললেন, 'ইরানিরা শিয়াল, কিন্তু তোমরা হচ্ছ খরগোশ।'

এবারকার অভিযানে তৈমুর দক্ষিণে পারস্যের দিকে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন শহরে যেসব মোজাফফর-বংশীয় শাহজাদাগণকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা আবার পরস্পরের মধ্যে বিবাদ শুরু করেছিল। এই গোলমালের মধ্যে শাহ মনসুর ভাইদের

হারিয়ে দিয়ে ইস্পাহান আর শিরাজের কর্তা বনে গেল। মোজাফফর-বংশীয়দের মধ্যে সে-ই কেবল তৈমুরের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। এখন সে তার ভাইদের সকলের প্রভু হয়ে বসল। হতভাগ্য শাহজাদা জয়নুল আবেদিনকে সে ধরে নিয়ে গেল এবং গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে তার দু-চোখ অন্ধ করে দিল। এই বিদ্রোহ থামাতে গিয়ে এবং এই পাহাড়ের দেশের অদ্ভুত হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে তৈমুরকে এখানে থামতে হল।* তাঁর সঙ্গে অবশ্যি তিন ডিভিশনের বেশি সৈন্য ছিল না—এক ডিভিশনের পরিচালন-ভার ন্যস্ত ছিল শাহরোখের উপর, আর অন্যগুলো ছিল তাঁর পৌত্র খানজাদের বড়ছেলের উপর।

তৈমুরের আগমন-সংবাদ জেনে শাহ মনসুর তার একজন সহকারীর উপর তার অর্ধেক সৈন্যের ভার দিল শ্বেতপ্রাসাদ রক্ষার উদ্দেশ্যে। এই শ্বেতপ্রাসাদ পৌরাণিক যুগের রুস্তমের আমল থেকে ইরানের অভেদ্য নিরাপদ স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। অন্ধ জয়নুল আবেদিনকে এখানেই আটকে রাখা হয়েছিল। তৈমুর এই শ্বেতপ্রাসাদের উপর হামলা চালালেন।

বস্তুত একটা পর্বতের শীর্ষদেশকেই শ্বেতপ্রাসাদ নাম দেয়া হয়েছিল। এ-সম্পর্কে ইতিহাসকার বলেছেন : 'এই স্থানটির প্রতি ইরানিদের বিশ্বাস অগাধ। কারণ এটি কঠিনতম পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থিত এবং মাত্র একটি সংকীর্ণ রাস্তা ছাড়া সেখানে পৌঁছুবার উপায় নাই। পর্বতচূড়াটি সুন্দর, মসৃণ, সমতল এবং এক লিগ লম্বা ও প্রশস্ত। এখানে আছে নদী এবং ফোয়ারা, আছে ফলের গাছ ও কৃষিভূমি, আর সবরকম জীবজন্তু। ইরানের শাহগণ এখানে বহু বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছেন। আগুন বা বন্যার ভয় এখানে বিন্দুমাত্র নাই—বহিরাক্রমণের ভয়ও এখানকার কারুর হয় নাই। কোনো রাজা কখনো এটাকে অবরোধ করার কথা ভাবে নাই। কারণ এটা এত উঁচু যে, এখানে আক্রমণ পরিচালনা করা অসম্ভব। এর কঠিন প্রস্তর খোদাই করা সম্ভব নয়। যে-রাস্তা দিয়ে এর চূড়ায় ওঠা যায়, তা এত সংকীর্ণ যে, মাত্র তিনজন লোকই এক হাজার লোকের গতিরোধ করার পক্ষে এখানে যথেষ্ট। এর প্রাকৃতিক শক্তিতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইরানিরা এর রাস্তার মোড়গুলো বড় বড় পাথর, চুন ও বালিসহযোগে দৃঢ় করে গেঁথে দিয়েছে। এর আবাদি জমিগুলোতে যে-ফসল উৎপন্ন হয়, তা এর অধিবাসীদের খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট। খাদ্য-উপযোগী পশুপাখির সংখ্যাও এখানে প্রচুর। এক আজরাইল ছাড়া অন্য কোনো দিকের আক্রমণের ভয় এখানে নাই।'

শ্বেতপ্রাসাদের নিচে এসেই তৈমুর এর উপর আক্রমণ চালালেন। এই পর্বতের পার্শ্ববর্তী গিরিসঙ্কটের শীর্ষদেশে তাঁর শিবির স্থাপিত হল। তাতারসৈন্যেরা এরপর

---

* এই হত্যাকারীদের নেতা ছিল হাশিশিন নামক এক ব্যক্তি। এর অনুচরেরা বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের দ্বারা নিকট-প্রাচ্যের রাজাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এরা ছিল ইসমাইলীয় সম্প্রদায়ের লোক। ক্রুসেডকারীদের এরা ব্যতিব্যস্ত করেছিল। এদের নেতার নামানুসারে ক্রুসেডকারী 'আসানিস' (হত্যাকারী) শব্দ সৃষ্টি করে। মার্কোপোলো এদের নেতাকে 'শেক-অল-জবল' মানে 'পাহাড়ি বুড়ো' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে।

উক্ত পর্বতের ঢালু স্থান দিয়ে আরোহণ করে এমন স্থানে পৌঁছল, যেখান থেকে সোজা উপরদিকে পাথরের দেয়াল উঠে গেছে। তারা নিচে নেমে এসে বহুদলে বিভক্ত হয়ে আবার পিঁপড়ের সারির মতো উপরদিকে উঠতে লাগল এবং অবশেষে সংকীর্ণ রাস্তা যেখানে মোড় খেয়েছে, সেইখানে গিয়ে পৌঁছল।

পার্শ্ববর্তী গিরিসঙ্কটের শিবির থেকে তৈমুর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর শিরস্ত্রাণধারী লোকেরা ধীরে ধীরে দেয়াল বেয়ে কীভাবে উপরদিকে উঠবার কসরত চালিয়ে যাচ্ছে—সূর্যালোকে তাদের তীরের অগ্রভাগের ঝলকানি দেখে তাদের গতি বুঝতে পারা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শিবির থেকে ভীমরবে 'কেটেল ড্রাম' বেজে উঠছিল এবং প্রত্যুত্তরে তৈমুরের শিরস্ত্রাণধারীদের আনন্দধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

সন্ধ্যাকালে দেখা গেল, কাজ মোটেই এগোয় নাই। অন্য রাস্তাও আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। পর্বত-আরোহণরত লোকদের নিচে-পড়ে-যাওয়া দেহগুলো সরাতে সরাতে তাদের সংখ্যা দেখে অফিসারদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাতাররা সেই অবস্থায় রাত্রি কাটাল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার আরোহণ-অভিযান শুরু হয়ে গেল। পাথর-কাঠা-গাঁইতি নিয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল এবং নিচেও পড়ে যেতে লাগল। আবার উঠবার নির্দেশসূচক তৈমুরের ভেরি বেজে উঠল।

তারপর যেসব লোক বুকে হেঁটে একটা বুরুজে আরোহণ করেছিল, হঠাৎ তারা তাদের মাথার অনেক উপরে একটা উচ্চচিৎকার শুনতে পেল, 'আমাদের মালিকের জয় হয়েছে। ইরানি কুত্তাদের আর রক্ষা নাই।'

দেখা গেল, তাদের থেকে প্রায় দুশো ফুট উঁচুতে পাহাড়ের এক চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আকবোগা। একস্থানে একটা ফাটলের সাহায্যে তিনি সেখানে উঠেছেন। সে-স্থান দিয়ে আরোহণ একেবারে অসম্ভব বলে সেদিকে কারুরই নজর পড়ে নাই—না ইরানিদের, না তাতারদের। কিন্তু আকবোগা পিঠে ঢাল ও ধনুক নিয়ে সেখানে উঠে তাঁর আরোহণ-বার্তা সকলকে এইভাবে জানিয়ে দিলেন।

সম্মুখদিকে পাহাড়ের গায়ে ঢাল রেখে এবং ধনুক ব্যবহার করে তিনি নিকটবর্তী ইরানিদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে শাহরোখ নিচের লোকদের পর্বতচূড়ায় অবস্থিত শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতে আদেশ দিলেন, যাতে শত্রুরা পর্বতারোহীদের উপর আক্রমণ চালাতে না পারে। এর ফলে আকবোগার সহায়তাকল্পে তাতাররা উপরে উঠবার সুযোগ পেল।

পর্বতশীর্ষে উঠে তারা দেখল, ইরানিরা পালাচ্ছে, আর আকবোগা তরবারি-হাতে তাদের পিছু ধাওয়া করেছেন। তারা চূড়ায় উঠে শাহরোখের নিশান উঁচু করে তুলে ধরল। তখন নিচে ঘোররবে ভেরি বেজে উঠল—অভিযানের সমাপ্তির আর দেরি নাই!

ইরানিরা পর্বতচূড়ার আশ্রয় ছেড়ে আরো উঁচুতে উঠেছিল, কিন্তু তৈমুরের লোকদের হাত থেকে রেহাই পেল না। তাদের ধরে ধরে নিচে নিক্ষেপ করা হল। শাহ মনসুরের অফিসারগণকেও রেহাই দেওয়া হল না। তারা সকলে পাহাড়ের নিচে নির্জীব পোশাকের বস্তার মতো পড়ে রইল। এইভাবে হল শ্বেতপ্রাসাদের পতন।

যুদ্ধ শেষ হলে আকবোগার খোঁজ পড়ল। অবশেষে পাওয়া গেলে তাঁকে তৈমুরের

নিকট আনা হল। তাঁকে দেওয়া হল রৌপ্যমুদ্রা, কিংখাবের থান, রেশমি কাপড়, তাঁবু, কয়েকজন সুন্দরী ক্রীতদাসী, বহু ঘোড়া, খচ্চর, উট ইত্যাদি। তৈমুরের সম্মুখ থেকে যখন প্রস্থানোদ্যত হলেন, তখন তাঁর মাথা ঘুরছে। যেতে-যেতে পিছনে ফিরে এসব জিনিসপত্র দেখে তাঁর মাথা দুলতে লাগল। তাঁকে থামিয়ে যখন সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল, তিনি বললেন, 'খোদা সাক্ষী থাকুন! গতকাল একটা ঘোড়ার বেশি আমার ছিল না। আর আজ? আজ এতসব আমার কী করে হতে পারে?'

তাঁকে মোহাম্মদ সুলতানের বাহিনীর পশ্চাদ্‌রক্ষী দলের সেনাপত্যে উন্নীত করা হল। বাকি জীবন তিনি খুব জাঁকজমকেই কাটান। সেইদিন থেকে তিনি কখনো তৈমুরের সঙ্গছাড়া হননি। যখনই তিনি ঘুমাতেন, তৈমুরের শামিয়ানার দিকে তাঁর পা রাখতে কখনো ভুলতেন না। তিনি এ-ও অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দেহ যেন এমনভাবে কবরে রাখা হয়, যাতে তাঁর পা তাঁর মালিকের চিরবিশ্রামের দিকে থাকে।

তৈমুর যখন মোজাফফরদের পশ্চাদানুসরণ শুরু করলেন, তাঁর কাছে খবর এল যে, শাহ মনসুর পালিয়েছে। তাঁর দুই পৌত্র মোহাম্মদ সুলতান ও পির মোহাম্মদের অধিনায়কতায় পরিচালিত ডান ও বাম ডিভিশনের বাহিনী দুটিকে রেখে তিনি ত্রিশ হাজার মূল বাহিনীসহ শিরাজের দিকে ধাওয়া করলেন। শাহরোখ তাঁর সাথেই রইলেন। এক গ্রামের বাইরে এক বাগানে তিন-চার হাজার ইরানি সৈন্য দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। এই অশ্বারোহী দল ছিল অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত। ব্যাপার হয়েছিল এই, অশ্বারোহী সৈন্যসহ পালিয়ে যেতে-যেতে শাহ মনসুর এক গ্রামে এসে থামে এবং গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করে শিরাজের লোকেরা তার সম্পর্কে কী বলাবলি করছে।

উত্তর বলা হয়, 'আল্লার দোহাই, লোকেরা বলেছে যে, কেউ-কেউ বিরাট ঢাল ও ভারী তূণীর বহন করছে বটে, কিন্তু নেকড়েবাঘ দেখে ছাগল যেমন পালায়, তেমনি তারা শত্রুর কাছে পরিবার-পরিজন ফেলে পালিয়েছে।'

এই বিদ্রূপে চটে গিয়ে মনসুর ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সৈন্যদল নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। বেপরোয়া হয়ে সে তার অশ্বারোহী দলকে নিয়ে এখন আবার তৈমুরের উপর হামলা চালাল। তার বাহিনীর কিছু লোক শৃঙ্খলা ভেঙে পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু দুহাজার লোক তাতারব্যূহ ভেদ করে পেছনের উঁচু স্থান দখল করল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা তৈমুরকে আক্রমণ করে বসল।

তৈমুর তাঁর কয়েকজন কর্মচারী নিয়ে একটু দূর থেকে এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার লক্ষ করছিলেন। মনসুর তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। তখন তাতারদের সাথে ইরানি অশ্বারোহী-বাহিনীর হাতাহাতি যুদ্ধ বেধে গেল। তৈমুর তাঁর বর্শার জন্য পিছনদিকে হাত বাড়ালেন। বর্শা ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র সবসময়ে তাঁর পিছনের লোকের কাছেই থাকত। কিন্তু তৈমুরের বর্শাবাহক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ চলে গিয়েছিল। তিনি তরবারি খুলবার আগেই, মনসুর তৈমুরকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। মনসুর দুবার তৈমুরের উপর তলোয়ার চালাল। তৈমুর দুবারই মাথা নত করে রক্ষা পেলেন—শুধু তাঁর লৌহ-শিরস্ত্রাণের উপর তলোয়ারের একটুখানি আঁচড় লাগল। তৈমুর স্থির

হয়ে ঘোড়ার উপর বসেছিলেন। এমন সময়ে একজন শরীররক্ষী এসে তাঁর মাথার উপর ঢাল ধরল। অন্য একজন তাঁর ঘোড়ার উপর চাবুক কষল।

মনসুর তখন পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শাহরোখের কয়েকজন অনুচর তার পিছনে ধাওয়া করল। এমন সময়ে শাহরোখ এসে তার মাথা কেটে ফেলল এবং কর্তিত মস্তক তৈমুরের ঘোড়ার সামনে ফেলে দিল।

পারস্যে প্রতিরোধের এ-ই শেষ। মোজাফফরেরা এইভাবে খতম হয়ে গেল। এই বংশের যারা তখনো বেঁচে রইল, তৈমুর তাদের ধরে শৃঙ্খলিত করে আনতে আদেশ দিলেন। পরে তাদের হত্যা করা হল।

শুধু জয়নুল আবেদিন ও চেনাচিকে দয়া দেখানো হল এবং তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সমরখন্দে। চেনাচিকেও তার আত্মীয়গণ অন্ধ করে দিয়েছিল। সমরখন্দে তাদের বাসস্থান দেওয়া হল এবং সেখানে তারা শান্তিতেই জীবন কাটাল। শিরাজ এবং ইস্পাহান থেকে শিল্পী, কারিগর ও নামকরা পণ্ডিতগণকে সংগ্রহ করে তৈমুরের রাজসভার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমরখন্দে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

২২
বাগদাদের সুলতান আহমদ

তৈমুরের বিরুদ্ধে এক মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তোলা অনিবার্য হয়ে উঠল। পূর্বদিকের মরুভূমির দেশ থেকে প্রায়ই তাঁর আক্রমণ হচ্ছিল—ঝড়ের বেগে শহরগুলোর উপর আপতিত হয়ে তিনি সবকিছু তছনছ করে যেতেন। তাঁর আগমন-কাল অনুমান করাও ছিল কঠিন।

পশ্চিমাঞ্চলের রাজাদের মধ্যে দ্রুত দূত-বিনিময় হতে লাগল। তুর্কির সুলতান ছিলেন তখন ইউরোপ-অভিযানে; কাজেই এই ব্যাপারে ছিলেন তখন তিনি উদাসীন। কিন্তু সিরিয়া, দামেশক ও জেরুজালেমের শাসক, মিশরের সুলতান আর বাগদাদের সুলতানের মধ্যে চুক্তি হল। তাঁরা সম্মিলিতভাবে তৈমুরের গতিরোধ করবেন। আর তৈমুর কর্তৃক পশ্চিমদিকে বিতাড়িত তুর্কম্যানদের অধিপতি কারা ইউসুফ সাগ্রহে এই সম্মিলিত দলের সাথে যোগ দিলেন।

তাতার-অগ্রগতির পথেই পড়েছিল বাগদাদ। এ তখন আর মুসলিমজাহানের কেন্দ্রস্থল ছিল না—যেমন ছিল খলিফা হারুনুর রশিদের আমলদারিতে। দজলার দুই তীরে এ পড়ে রয়েছিল নিশ্চেষ্ট স্থাবরের মতো। তখনো তীর্থযাত্রী ও ধনী-বণিকদের ভিড় হত সেখানে। জুবায়ের পুত্র বলেছিলেন, যৌবনহারা স্ত্রীলোকের মতো তখনো ছিল এর আকাশ-বাতাসে অতীতের ছায়া-স্মৃতির আলোড়ন এবং এককালে যে-নদী ছিল তার সৌন্দর্যের আয়না, বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মতো সে তার দিকে ঢুলুঢুলু নয়নে চেয়ে দেখছিল।

জালাইয়ের বংশের আহমদ ছিলেন এর সুলতান—তখন তাঁকে বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা বলেই অভিহিত করা হত এবং বাগদাদের বাদশাহি মসজিদ তখনো কোরাইশদের কালোবস্ত্রে ছিল মণ্ডিত। কিন্তু বাগদাদের সত্যিকার অভিভাবক ছিলেন

মামলুকরা—মিশরের সুলতান। আহমদ ছিলেন সন্দিগ্ধমনা এবং নিষ্ঠুরপ্রকৃতির। তাঁর রাজকোষে যে ধনসম্পদ সঞ্চিত ছিল, সেজন্য ভয় তাঁর কম ছিল না। আর তাঁর প্রহরায় যেসব ক্রীতদাস নিযুক্ত ছিল, তার জন্য ভয় ছিল তাঁর আরো বেশি। কখন তৈমুরের তাতারবাহিনী ধুলা উড়াতে উড়াতে প্রান্তর-পথে দেখা দেয়, সেজন্য পূর্বদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

খঞ্জ দিগ্বিজয়ীর কাছে প্রচুর উপহারসহ তিনি গ্র্যান্ড মুফতিকে পাঠালেন। অনুরূপ উপহার তাঁর অসময়ের বন্ধু কারা ইউসুফের কাছেও প্রেরিত হল। এ-সম্পর্কে যেসব বিবরণ পাওয়া গেছে, তার একটি সারমর্ম এই যে, তৈমুর সম্ভ্রমপূর্ণ উত্তরসহ মুফতিকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন; অন্য বিবরণীতে দেখা যায়, তিনি পাঠিয়েছিলেন শাহ্ মনসুরের মাথা! এর যে-কোনো একটা সত্য হতে পারে। আসলে তিনি আহমদের উপহার চাননি। চেয়েছিলেন বাগদাদের নতিস্বীকার—খোৎবায় তাঁর নাম উচ্চারণ এবং মুদ্রায় তাঁর সিলমোহর।

ইতোমধ্যে আহমদ তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুতি চালালেন। তিনি তাঁর মিত্র তুর্কম্যানদের এবং দামেশকের অধিপতির সাথে সংযোগ রক্ষা করছিলেন। যদি পালাতেই হয়, তবে পরিবার ও ধনসম্পদসহ যাতে সে-কাজ সহজে সম্পন্ন হতে পারে, সেজন্য সতর্কতার সাথে একদল রক্ষী সৈন্য ও কয়েকটি দ্রুতগামী ঘোড়া তিনি ঠিক করে রাখলেন। আশি মাইল দূরবর্তী তাঁর রাজ্যসীমান্তে তিনি একঝাঁক সংবাদবাহী কবুতরসহ রাখলেন কয়েকজন গুপ্তচর। তৈমুরের আগমন-চিহ্নর দেখা পেলেই সংবাদ পাঠাবে তারা।

তৈমুরের গুপ্তচরেরা যথাসময়ে আহমদের এই প্রস্তুতির সংবাদ তাদের মালিককে জানাল। তৈমুর বাগদাদ জয় করার সিদ্ধান্ত করলেন। প্রথমে তিনি তুর্কম্যানগণকে ব্যস্ত রাখার জন্য তাদের সেখানে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারপর তিনি নিজেই যেন অগ্রবর্তী সৈন্যদের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছেন, সকলের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে একদল সৈন্যসহ অভিযানে বের হলেন।

কিন্তু আসলে তা না করে তিনি রাজপথ ত্যাগ করে পার্বত্য দেশের ভিতর দিয়ে জোর অভিযান চালালেন। তৈমুর যাচ্ছিলেন শিবিকারোহণে। বেশিরভাগ সৈন্য পিছনে পড়ে গেল। তৈমুরের সাথে রইল কিছু বাছা-বাছা সৈন্য।

আহমদের গুপ্তচরেরা তৈমুরের আগমন টের পেয়ে সংবাদবাহী কবুতর মারফত তাঁকে সংবাদ পাঠাল যে, তৈমুরকে দেখা যাচ্ছে। সে-গ্রামে ঢুকেই তৈমুর সেখানকার লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা বাগদাদে খবর পাঠিয়েছে কি না। তারা মিথ্যাকথা বলতে ভয় পেল। তখন তৈমুর তাদের দ্বিতীয় সংবাদ পাঠাতে আদেশ দিলেন, 'বলো যে, তোমরা তাতারদের ভয়ে তুর্কম্যানদের পালাতে দেখেছ।'

আবার কবুতর উড়িয়ে দেওয়া হল। তৈমুর সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তারপর কয়েকশত বাছা-বাছা সৈন্যসহ সবচাইতে দ্রুতগামী ঘোড়া ছোটালেন। একেবারে কোথাও না-থেমে দীর্ঘ একাশি মাইল অতিক্রম করে তারা বাগদাদের এক উপকণ্ঠে পৌঁছুলেন।

প্রথম সংবাদ এসে পৌঁছুবার আগে থেকেই আহমদ পলায়নের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। মালপত্র, ধনরত্ন ইতঃপূর্বেই নদীর ওপারে পাঠানো হয়েছিল। দেহরক্ষী সৈন্যদেরও তিনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। দ্বিতীয় সংবাদটি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত করতে পারল না। তিনি অবশ্য কিছুক্ষণ নগরে অবস্থান করলেন। পরে তৈমুরের আগমন সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে দজলা পার হলেন। তারপর নৌকোর সেতু ধ্বংস করে দেওয়া হল।

তৈমুরের সৈন্যদল আগেকার খলিফাদের আবাসগৃহ প্রাসাদগুলোর দিকে ঘোড়া ছোটাল। তারা নদীর ভাটিতেও বাগদাদপতিকে খুঁজে দেখল। তারপর সাঁতরিয়ে ঘোড়াসহ নদী পার হল।

আহমদ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পালিয়েছিলেন। সিরিয়ার মরুভূমির উপর দিয়ে তিনি দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাতাররা 'আফতার' নামে একটি রাজকীয় বজরা তৈমুরের কাছে পাঠিয়ে দিল। আগের রাতে সুলতান এই বজরায় পানির উপরে খানাপিনা করেছিলেন। একদিন একরাত্রি এবং আরো একদিন তাতাররা শুকনো জলাভূমির উপর দিয়ে তাদের ঘোড়া চালাল এবং তারপর তারা ফোরাতের খাগড়াবনে প্রবেশ করল।

এখানে নৌকা যোগাড় করে তারা নদী পার হল। সাথে সাথে তাদের ঘোড়াগুলোকেও পার করানো হল। পলাতকদের সন্ধান মিলল। কারণ আহমদের নিজস্ব মালপত্র ও ধনদৌলতের ব্যাগ-পেটরার অধিকাংশ সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। এসব বোঝার ঘোড়াগুলোকে অরক্ষিত অবস্থায় মাঠে চরতে দেখা গেল। বোঝা গেল, তারা সওয়ারি-ঘোড়া ছাড়াই এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। এ-অবস্থায়, সহজেই কিছু লোক—প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন—তাতারদের হাতে ধরা পড়ল। এরা প্রায় সকলেই ছিল আমির-ওমরাহ ও সেনাপতির দল। তারা আহমদকে ফিরিয়ে আনতে তৈমুরের কাছে প্রতিশ্রুত হল। অভিযাত্রীদল ক্রমে পতিত জমির কাদার টিলাগুলোর নিকট পৌঁছুল।

ইতোমধ্যে সুলতান একদল সৈন্য তাতারদের প্রতিরোধকল্পে পিছনে রেখে গিয়েছিলেন। ফলে শতাধিক অশ্বারোহীর সাথে তাতার অফিসারদের সংঘর্ষ হল। তীর-ধনুকের ব্যবহার করে এই প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে তাতারিদল এগিয়ে চলল। বাগদাদিরা করল পলায়ন।

দ্বিতীয়বার তাদের উপর আক্রমণ হল। তাতারিরা নেমে পড়ে তাদের ঘোড়ার উপর দিয়ে তীর চালিয়ে শত্রুদের আবার ছত্রভঙ্গ করে দিল। এসবের পরে আর পলাতকদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাতার অফিসারগণ ও তাদের ঘোড়াগুলো খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা পানির তালাশে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল।

আহমদ জীবিত অবস্থায়ই দামেশ্‌কে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু তাঁর পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি তাতারদের হাতে পড়ল এবং তৈমুরের কাছে প্রেরিত হল।

বাগদাদ মুক্তিমূল্য ও তৈমুরের প্রভুত্ব স্বীকার করে রক্ষা পেল। সেখানে একজন শাসনকর্তা রেখে আক্রমণকারীগণ যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তাঁরা বাগদাদের সমস্ত মদ নদীর পানিতে ঢেলে দিয়ে

গেলেন। সমরখন্দ রাজসভার জন্য তৈমুর সাথে নিয়ে গেলেন বাগদাদের জ্যোতিষী ও শিল্পী-কারিগরদের।

সুলতান ছিলেন একজন কবি। নিজের দুর্ভাগ্যের উপর তিনি নিজেই কবিতা লিখে গেছেন।

ঝড় থেমে গেছে। সুলতান আহমদ এখন একপ্রকার প্রায় আবরণ ও আভরণহারা হয়ে পড়েছেন। কায়রোতে পৌঁছে তিনি মিশরের সুলতানের আশ্রয় লাভ করলেন। মিশরের সুলতান তাঁকে নতুন মেয়েলোক ও ক্রীতদাস দিলেন। তাতার-দরবার থেকে কায়রোয় এল কয়েকজন রাজদূত।

রাজদূতেরা বলল, 'চেঙ্গিজ খানের সময়ে আমাদের মালিকের পূর্বপুরুষেরা আপনার পূর্বপুরুষদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তখন তাঁদের মধ্যে একটা সন্ধি হয়েছিল। পরে ইরানে অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আমাদের মালিক ইরানে শান্তিস্থাপন করেছেন। ইরানের সীমান্তে আপনার রাজ্যসীমা মিলেছে। তাই তিনি আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছেন, যাতে বণিকরা নির্বিবাদে উভয় রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারে। দিন-দুনিয়ার মালিক আল্লাহতালাই সব প্রশংসার অধিকারী।'

মিশরের সুলতান এই দূতদের হত্যা করে একটা পৈশাচিক সুখ অনুভব করলেন। বাগদাদ দখল করে তৈমুর পশ্চিমি শক্তিবর্গের খুবই সন্নিহিত হয়ে পড়েছিলেন। মামলুক-বাহিনীও সেজন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁরা একজন প্রবল শক্তিসম্পন্ন মিত্র পেয়ে গেল।*

এশিয়া মাইনরের নানা ব্যাপারে তাতারবাহিনী হস্তক্ষেপ করেছিল। এর ফলে তুর্কি সুলতান বায়েজিদের ক্রোধ তৈমুরের উপরে ফেটে পড়ল। তুর্কি-মিশর মৈত্রীবন্ধন পাকা হয়ে গেল। মনে হল, তৈমুরের পশ্চিমমুখি অভিযানেরও বুঝি সমাপ্তি ঘটে গেল। তুর্কম্যান ও সিরীয় আরবদের সমর্থন-বলে দুই পার্শ্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে সুলতানদ্বয় ফোরাত নদী ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে গেলেন।

মিশরের মামলুক-বাহিনী দজলা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পলাতক আহমদকে নিয়ে বাগদাদ প্রবেশ করল। তাঁর প্রাসাদে তাঁকে আবার যথারীতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হল—তবে এবার মিশরের অধীন শাসনকর্তা হিসেবে। নিজেদের সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে যখন মামলুকগণ বাগদাদ থেকে এবং তুর্কিরা মসুল থেকে চলে গেল, তখন আহমদ বড় একা পড়ে গেলেন। তৈমুরের খবর জানবার জন্য তিনি সমরখন্দে গুপ্তচর পাঠালেন। তারা নিয়ে এল বিস্ময়কর কাহিনী :

'আমরা যা দেখেছি, ঠিক তা-ই বলছি। আগে যেরূপ ছিল, এখন আর শহর তেমনটি নাই। এককালে যেখানে উট চরে বেড়াত, এখন সেখানে উঠেছে নীল গম্বুজ ও মার্বেলপাথরের দরবারগৃহ। আমরা তাতার-অধিপতিকে দেখেছি সরাইয়ের এক

---

* এই সময়ে কাস্পিয়ানের দক্ষিণদিকের তাতার প্রদেশে মিরন শাহ মদ খেয়ে পাগলামি করেছিলেন। তৈমুর তখন উত্তরদিকে তোক্তামিশকে দমন করে ভারত অভিযানে যাত্রা করেছিলেন।

দালানে। কারিগরগণ যা তৈরি করেছে, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি সেটা ভেঙে ফেলতে আদেশ দিয়েছেন। তারপর কুড়িদিন ধরে তিনি ঘোড়ায় চড়ে প্রতিদিন নিজে কাজ দেখতে এসেছেন। খোদা সাক্ষী, যা ঘটেছে, ঠিক তা-ই আমরা বলছি। মাত্র এই কুড়িদিনেই একেবারে গম্বুজের শেষ ইটটি এবং খিলানের শেষ পাথরটিসহ এক বিরাট প্রাসাদ উঠে গেছে! খিলানটি চব্বিশবর্শা-প্রমাণ উঁচু এবং প্রস্থ যতটুকু, তাতে তার উপর পঞ্চাশজন লোক একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে।'

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'আরো কিছু?'

'সুন্নাপন্থি এবং আলিপন্থি ইমামদের সাথে তিনি গল্প করতে বসেন। তাঁদের তিনি বলেন...'

'আমার সম্পর্কে কী বলেন, তা-ই বলো।'

'আল্লাহ ও তাঁর অনুগামীদের দোহাই! দয়া করুন আমাদের! তিনি ভারতের দিকে চলে গেছেন।'

তৈমুর এখন হাজার মাইল দূরে, এ জানা সত্ত্বেও আহমদ স্বস্তিলাভ করতে পারলেন না। পতিত জমির উপর দিয়ে আমির-ওমরাহসহ তাঁর অনুসরণে তৈমুরের সেই পাগলা অভিযানের স্মৃতি তিনি এখনো ভুলতে পারেননি। তিনি তাঁর উজিরদের অবিশ্বাস করতে লাগলেন—এমনকি, বেশ কয়েকজনকে নিজহাতে হত্যাও করে ফেললেন। প্রায়-পরিত্যক্ত 'জানানা'-মহলে তিনি বাস করার জন্য উঠে গেলেন। সে-মহল বেষ্টন করে রইল সারকাশিয়ান মামলুক ও নিগ্রো তলোয়ারবাজগণ। তাঁর স্ত্রীদের আড়াল-করা নকশাকাটা মার্বেলের পরদার পিছনের ঘোর বারান্দা থেকে তিনি নৌকার সেতুর উপর দিয়ে চলমান জনতার ভিড় লক্ষ করতেন। দজলার ওপারে এক আস্তাবলে গোপনে তিনি আটটা ঘোড়া রেখে দিয়েছিলেন। কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর এদের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিল। তারপর তিনি হুকুম জারি করেছিলেন যে, তাঁর সাথে দেখা করতে কেউ সেখানে যেতে পারবে না। কোনো চাকরও তাঁর কামরায় ঢুকতে পারত না। এমনকি, তাঁর প্রহরীদেরও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি শুধু কামান ছুড়বার ছিদ্রপথগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন।

বস্তুত ভয় তাঁর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, অবশেষে তিনি তাঁর খানা আনাতে লাগলেন একটা ট্রেতে করে এবং সে-ট্রে সরাইয়ের দরজায় রেখে দিতে হত। খানা নিয়ে যে আসত, সে চলে যাওয়ার পর আহমদ দরজা খুলে খানার ট্রে ভিতরে নিয়ে আসতেন।

রাত্রে তিনি বাইরে বেরুতেন, তাঁর নিরাপত্তার রাস্তা ঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে। ভারী কাপড়ে দেহ আবৃত করে নদী পার হয়ে তিনি যেতেন, যেখানে তাঁর ঘোড়া রাখা হয়েছে। এমনি ছদ্মবেশে অবস্থানের সময়ে একদিন তাঁর কাছে সুন্দর ফারসিভাষায় লেখা ভাঁজ-করা একখণ্ড কাগজ এল—অমর কবি হাফিজের লেখা একটি কবিতা। বহু আগে তিনি হাফিজকে তাঁর দরবারে আসতে লিখেছিলেন।

এমনিভাবে এক বছর চলে গেল। আহমদ ক্রমে নিরাপদ বোধ করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর নীরবতা ভঙ্গ হল প্রচণ্ড ভেরিনিনাদে।

২৩
সুরক্ষিত

এরপর দীর্ঘ দশ বছর যুদ্ধের বিষাক্ত নিশ্বাসে সমরখন্দের আকাশ-বাতাস কলুষিত হয়নি। এই দশ বছরে তৈমুরের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় অনেককিছু হয়েছে। তিনি পেয়েছিলেন রৌদ্র-শুষ্ক কাদা, ইট ও কাঠের তৈরি সমরখন্দকে, আর সেখানে গড়ে তুললেন তিনি এশিয়ার এক রোম। অন্যান্য দেশের যা-কিছু তাঁর ভালো লেগেছে, নয়া সমরখন্দ রচনায় সেসব এনে তিনি লাগিয়েছেন। যুদ্ধবন্দিদের এনে তিনি সমরখন্দের নতুন নাগরিক বানিয়েছেন, আর বিজিত দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের এনে দেশের মনীষা সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতিটি বিজয়ের স্মরণচিহ্ন হিসেবে একটি করে নতুন প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। বিদ্যার্থীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার, আর কারিগরদের জন্য বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এমনকি অদ্ভুত অদ্ভুত পশুপাখিদের এক চিড়িয়াখানা এবং জ্যোতিষীদের জন্য এক মানমন্দিরও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন।

এরূপ একটি শহর নির্মাণ ছিল তৈমুরের স্বপ্ন। এ-শহরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারে এমন জিনিস বা শিল্পকর্ম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—এতটা যুদ্ধ-পাগল তিনি ছিলেন না। তাব্রিজের শ্বেতপ্রস্তর, হিরাতের কাচ-লাগানো টালি, বাগদাদের রুপার তারের সূক্ষ্ম কারুকার্য, খোটেনের উজ্জ্বল মণি—সবই তখন সমরখন্দে ছিল। এরপর কী করা হবে, তা কেউ বলতে পারত না, কারণ নয়া সমরখন্দের পরিকল্পনার ব্যাপারে তৈমুর ছাড়া আর কারুর হাত ছিল না। তৈমুর সমরখন্দকে ভালোবাসতেন, বৃদ্ধ যেমন ভালোবাসে তার তরুণী প্রিয়াকে। সে-সময়ে তৈমুর সমরখন্দকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য ভারত লুট করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এ-ব্যাপারে দশ বছরে তিনি যে-ফললাভ করেছিলেন, তা সত্যই ছিল দেখবার মতো।

১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে বসন্তকালের সূচনায় একটি বিশেষ দিনের কথা বলা হচ্ছে। সেদিন তৈমুর ভারতবর্ষে ছিলেন না। খাইবার পাস ও কাবুলের মধ্য দিয়ে দূত মারফত তিনি সমরখন্দের সাথে সংযোগ রক্ষা করছিলেন। সবুজ-নগরী থেকে বেরিয়ে দক্ষিণের রাজপথ ধরে দূতকে প্রান্তর পেরিয়ে যেতে দেখা গেল। প্রান্তরের কুঞ্জগুলো পূর্ণ হয়ে গেল তাঁবু আর ছোট ছোট কুটিরে। এসব শিবিরে হয়েছিল অগণ্য লোকের জটলা—তাদের মধ্যে ছিল যুদ্ধবন্দিরা, গলগ্রহের দল এবং নতুন কল্পরাজ্যে গমনেচ্ছু ভাগ্যান্বেষীরা। এখানে এসে জড়ো হয়েছিল খ্রিস্টান, ইহুদি, নেস্টোরিয়ান—আরব, মালাকাইট, সুন্নি, শিয়া প্রভৃতি। কেউ-কেউ বোকার মতো হাঁ করে চেয়ে ছিল, আবার কেউ-কেউবা মদ্যপের মতো উত্তেজনায় মাতলামি করছিল।

এখানেও ঘোড়া ও উট-ব্যবসায়ীদের একটা ঘাঁটি ছিল এবং তাদের তদারকের জন্য নিযুক্ত সশস্ত্র প্রহরী। রাস্তার একপাশে একটা কুয়ার কাছে ছিল একটা গম্বুজহীন ছোট পাথরের ঘর—নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের একটা গির্জা। এসব অদ্ভুত লোকদের আস্তানা ছাড়িয়ে শুরু হয়েছিল আমির-ওমরাহদের এলাকা। সেখান থেকেও শহর-

দেয়াল ছিল মাইলখানেক দূরে। রাজদূতগণ শহরতলিতে প্রবেশ করতে করতে দূরবর্তী এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীলাভ সম্মুখভাগে আঁকা বিরাট লেখাগুলো পড়তে পারছিল : 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নাই।'

রাস্তাটা পপলার গাছের দুই সারির ভিতর দিয়ে শহরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু বামদিকে একটু দূরেই রয়েছে পানির নহর ও সেতু এবং বাগানের গোলকধাঁধা। প্রাসাদের বহির্সীমানার নাম দেওয়া হয়েছে 'দিল-আরা'—পাথর খোদাইকারীদের কাজ তখনো সেখানে চলছে। একপাশে ডুমুরগাছ ও মুকুলিত ফলগাছের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচশত পদক্ষেপ লম্বা এক দেয়াল। এটা একটা স্কোয়ারের এক পার্শ্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

এর ভিতরে ইরানি মালীরা কাজ করে যাচ্ছে আর গোলামের দল সিমেন্টের আবর্জনা পরিষ্কার করছে। একটা মার্বেলস্তম্ভের ওপাশে কেন্দ্রীয় প্রাসাদের দেয়াল তোলা হয়েছে। উচ্চতায় এটা তিনতলা। কয়েকজন নামকরা স্থপতি এর পরিকল্পনা আঁকা শেষ করেছে। সুদক্ষ চিত্রশিল্পীরা এখনো এর প্রবেশ-কক্ষটির কাজ করছে। প্রত্যেক শিল্পী দেয়ালের এক-এক অংশ চিত্রায়িত করছে। দাড়িওয়ালা চীনা শিল্পীটি রং দেয়া পছন্দ করে না—তাই সে শুধু চুলের ব্রাশ দিয়ে কাজ করছে। তার পাশে মিরাজের দরবারি চিত্রকর বিশেষ কিছুই করছে না। তাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে এক হিন্দু; সে অবশ্য চিত্রাঙ্কন তেমন কিছু জানে না, তবে সে জানে সিমেন্টের উপর সোনালি ও রুপালি কাজ করতে। উপরদিকের সিলিং যেন একটি ফুলের মেলা, ফুলগুলোর সব মোজেক-করা। দেয়ালগুলো উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করছে—যেন শাদা চীনামাটির বাসন সদ্য পরিষ্কার করা হয়েছে।

শহরের উত্তরদিকে ভারত-অভিযানে রওনা হওয়ার আগেই তৈমুর একই ধরনের আরেকটি বাগানের নির্মাণকার্য শেষ করিয়েছিলেন। তৈমুরের দৈনিক কাজের বিবরণ-লিখিয়ে এই ব্যাপার সম্পর্কে লিখেছেন : 'আমাদের মালিক সেখানে এক রাত্রের জন্য এই শামিয়ানা তৈরি করিয়েছিলেন। আনন্দের দিনে খেলা ও ভোজোৎসবের জন্য এটা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন স্থাপত্যের পরিকল্পনা থেকেই তিনি এর মডেল গ্রহণ করেন। তৈমুর এটা তৈরির ব্যাপারে এমন একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে, এর নির্মাণকার্য দ্রুত শেষ হল কি না, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি দেড়মাস অপেক্ষা করেন। এর প্রতি কোণের ভিত্তিমূলে তাব্রিজের এক-এক খণ্ড মার্বেলপাথর স্থাপিত হয়। ইস্পাহান ও বাগদাদের শিল্পীদের দ্বারা এর দেয়ালগুলো চিত্রায়িত করা হয়। চিত্রগুলো এত সুন্দর হয়েছিল যে, কিউরিয়ো-হাউজের কুঠরির চীনা চিত্রগুলোও এত সুন্দর ছিল না। এর প্রাঙ্গণ মণ্ডিত হল মার্বেলপাথরে, আর ভিতর ও বাইরের দেয়ালের নিম্নাংশ আবৃত হল চীনামাটির প্রলেপে। এর নাম হল : উত্তরী বাগান।'

এই বাগান-প্রাসাদের পরিধির ভিতরেই রইল মূল শহর। দেয়ালের পরিধি ছিল পাঁচ মাইল। এর একটা দ্বারে, মানে তুর্কি গেটে, এসে জনৈক রাজদূত খচ্চরারোহী মোল্লার দল থেকে খসে পড়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে চলতে থাকে। সেও একজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। তার কালো ঘর্মাক্তকলেবর ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। এ-লোকটি

ভারতে অবস্থিত তৈমুরবাহিনীর একজন দূত।

দ্বারে পদচারীদল দ্রুতবেগে তার অনুগমন করে। তারা চলে আর্মিনিয়াদের আবাসস্থানের ভিতর দিয়ে। সেখানে কয়েকজন কালো ফার-পরিহিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রমে তারা জিন-নির্মাতাদের রাস্তায় এসে পড়ে। তার পরেই এক গভর্নরের প্রাসাদ। সেখানে সেক্রেটারিরা সবাই চিঠিপত্র নকল করার জন্য প্রতীক্ষারত। সেখানে অপেক্ষা করতে করতে তারা হয়তো কোনো সংবাদ জানতে পারে। মনে হয়, চিঠিপত্রগুলো জরুরি।

কেউ হয়তো বলে, 'আমাদের প্রভুর ফরমান।' কিন্তু তাঁর ফরমানের মর্ম জানবার উপায় নেই। গভর্নরের কর্মচারীরা বেরিয়ে যায়। তখন সকলে সে-সম্পর্কে আলোচনামুখর হয়ে ওঠে।

তার পরই রাজপরিবারের মহিলাদের দরবার-কক্ষ। সশস্ত্র তাতার প্রহরীরা সেদিকে কাউকে যেতে দেয় না। মহিলাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দরবার-কক্ষ রয়েছে। আজ একজনের কক্ষে ভোজ-উৎসব হবে।

এ-দালানে গোলাপ ও তুলিপ গাছের বড় ছড়াছড়ি। দর্শকদের নজরে পড়ে। এর ছাদে আছে এক চীনা প্যাগোডার চূড়া। খিলানগুলোর মধ্য দিয়ে এর কক্ষ হতে কক্ষান্তরে যাওয়া চলে। শেষ কক্ষটিতে গোলপিরঙা রেশমের কাপড় ঝোলানো। দেয়ালগুলো ও সিলিং রুপার পাতে মোড়ানো। রেশমের সুতার গুচ্ছগুলো দুলতে থাকে বাতাসে আন্দোলিত পরদার মতো। এখানে বর্শার খুঁটিতে বাঁধা রেশমের চাঁদোয়ার নিচে রয়েছে বসবার গদিআঁটা তাকিয়া। বোখারা ও ফারগানার কম্বলে করা হয়েছে ঘরের মেঝে আবৃত।

কিন্তু ভোজের উৎসবটা হচ্ছে শামিয়ানার নিচে। সেখানে বসেছেন বৃদ্ধ মোয়াভা, কয়েকজন তাতার এবং রাজবংশের বহু ইরানি। আর বসেছেন আফগান ও আরবদের কয়েকজন দলপতি। এঁরা সকলে বসে অপেক্ষা করছিলেন—এমন সময় এসে পৌঁছলেন সরাই মুল্‌ক্‌ খানুম। বেগমসাহেবার আগে-আগে চলেছিল কাফ্রি ক্রীতদাসেরা, আর তাঁর পাশে-পাশে হেঁটে যাচ্ছিল নতচোখে সহচরীবৃন্দ। কিন্তু 'জানানা'-মহলের কর্ত্রী মণিমুক্তাখচিত লাল মস্তকাবরণে সজ্জিত হয়ে সোজা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মস্তকাবরণের চূড়ায় রয়েছে একটি শাদা পালকখচিত ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাসাদ। পালকগুলোর দুএকটা এসে তাঁর চিবুকের আশেপাশে পড়েছে—এগুলোর সাথে সংযুক্ত রয়েছে সোনার চেন। তাঁর গায়ের ঢিলে লাল চাদরও সোনার ফিতেয় খচিত। পিছনে চাদরের লুটানো বিরাট অংশ বহন করে চলে পনেরোজন সহচরী। সরাই খানুমের মুখমণ্ডল শাদা সিসার রঙে রঞ্জিত—তখনকার রীতি অনুযায়ী পাতলা রেশমে মুখ আবৃত। তাঁর কালোচুলের রাশি পিছনে কাঁধের উপর ছড়ানো।

তিনি আসন গ্রহণ করার পর অন্য এক বেগম এলেন। বয়সে সরাই খানুমের চাইতে ছোট, কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। তাঁর শ্যামবর্ণ চেহারা ও বড় বড় চোখ দেখে মনে হয় তিনি মোঙ্গলগোত্রীয়া। বস্তুত তিনি এক মোঙ্গল খানের কন্যা এবং তৈমুরের সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী।

সোনার ট্রের উপর পানীয়ের পেয়ালা বহন করে পরিবেশনকারীরা উপবিষ্ট বেগমদের কাছে আসে। পরিবেশনকারীদের হাত বস্ত্রাবৃত—যেন ট্রেতেও তাদের হাতের স্পর্শ না লাগে। তারা ট্রেসহ হাঁটু গেড়ে বসলে বেগমগণ পেয়ালা তুলে নিয়ে পানীয় গ্রহণ করেন। পান শেষ হলে পরিবেশনকারীরা ট্রেসহ পিছিয়ে যায়। পরে আমিরদের পান-পেয়ালা নিয়ে অন্য লোক আসে। খালি পেয়ালাগুলো ট্রের উপর উপুড় করে রাখা হয়—যেন সকলে বুঝতে পারে যে, পেয়ালায় আর এক বিন্দু পানীয়ও পড়ে নেই।

তৈমুরের আবাসস্থল অন্যত্র—'জানানা'-মহলের বাইরে। সেখানে রয়েছে তাঁর স্টাফ অফিসারদের শামিয়ানা—এরা সৈন্যবাহিনীর সাথে ভারতে যায় নাই। আর রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট ও খাজাঞ্চিদের শামিয়ানা। এসবের জন্য গিরিসঙ্কটের কাছে একটা আলাদা প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। এটা অস্ত্রাগার ও ল্যাবরেটরি হিসেবেও ব্যবহৃত হত।

অস্ত্রাগারে রয়েছে নানাশ্রেণীর সুন্দর ও অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ। এখানে অস্ত্র মেরামতের কারখানাও রয়েছে। তরবারিনির্মাতাগণ নতুন তরবারির ফলা ও ধার পরীক্ষা করে। সহস্রাধিক যুদ্ধবন্দি কারিগর সেখানে শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য অস্ত্রতৈরিতে নিযুক্ত রয়েছে। সে-সময়ে তারা একটা হালকা শিরস্ত্রাণ তৈরি শেষ করে এনেছিল—যাতে ছিল নাকের একটা প্রশস্ত অংশ। সেটা নিচে টেনে নামিয়ে মুখ ঢেকে ফেলা যেত, কিংবা সহজে খুলে ফেলাও যেত।

খাজাঞ্চিখানায় যাওয়ার অনুমতি কেউ পেত না। কিন্তু অদূরের তপোবনের মতো একটা জায়গা রয়েছে কতকটা শাদা মার্বেলের কিউরিয়ো-হাউজের মতো। তারই পাশে রয়েছে পশুবিচরণক্ষেত্র। সেখানে তৈমুর মাঝে মাঝে নিদ্রা যান। এর প্রাঙ্গণে আছে একটা রৌদ্রঝলসিত গাছ। এর গুঁড়িটা স্বর্ণমণ্ডিত। আর এর শাখা ও পাতাগুলো রুপার পাতে মোড়ানো। আর এর ফলগুলো? এর শাখাগুলো থেকে চেরি ও আলুবোখারার মতো ঝুলছে কতকগুলো বিভিন্ন রঙের মুক্তা ও মূল্যবান পাথর। এমনকি পাখিও আছে সেখানে—রুপার উপর লাল-সবুজের এনামেল-করা সেগুলো। পাখিগুলো এমনভাবে পাখা ছড়িয়ে আছে যেন ফলে ঠোকর দিতে চাইছে! খাজাঞ্চিখানার ভিতরে রয়েছে এমারেল্ডমণ্ডিত চারচূড়াওয়ালা একটি প্রাসাদের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এগুলো খেলনা ছাড়া আর কিছু নয় বটে, কিন্তু ধনরত্নের প্রাচুর্যের পরিচয় বহন করছে এসব।

চলন্ত মসজিদ আর নেই। তা ছিল নীল ও লাল রঙের পাতলা কাঠের তৈরি। এতে ছিল একটা উঁচু সিঁড়ির রাস্তা এবং বিভিন্ন রঙের কাচের ভিতরে জ্বলন্ত এর আলো। এটা খুলে ফেলে টুকরো টুকরো করে প্যাক করে বড় বড় গাড়িতে করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া চলত। এখন গাড়িতেই সেটা থাকে। তৈমুরের ভারত-অভিযানের পথে শুধু একমাত্র তৈমুরের নামাজ পড়ার সময়েই সেটা প্রতিদিন খাড়া করা হয়।

এখন, এই মধ্য-বিকেলে, বাজারগুলো গরম—জনতার কোলাহলে মুখরিত এবং ধুলোয় ছেয়ে আছে। এখানে তাতারগণ যা-ইচ্ছে তা-ই কিনতে পারে—মান্না থেকে শুরু করে তরুণী মেয়েলোক পর্যন্ত। কিন্তু তাদের অনেকেই চলেছে বাজার ছাড়িয়ে

বিবি খানুমের কবরগাহের দিকে। ক্যাথে ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে চলমান এক উটের সারির সামনে পড়ে যাওয়ায় তারা রাস্তার পাশে সরে দাঁড়ায়। উটগুলো বোঝাই ছিল লঙ্কার বস্তায়। এই লঙ্কা যাবে মস্কোর রাস্তা দিয়ে হানসের বিভিন্ন শহরে। বস্তাগুলো চীনা ও আরবি অক্ষরে চিহ্নিত এবং তাতে তাতার শুল্ক-কর্মচারীদের সিলমোহর মারা রয়েছে।

বড় বড় প্রাসাদের মতো বিবি খানুমের চিরআবাসস্থানটিও ছিল পাতলা পপলারশ্রেণী-পরিবেষ্টিত এক নিচু পাহাড়ের উপর। ঘরগুলো এত বড় যে, দূর থেকেও তার বৃহত্ত্ব বুঝতে কষ্ট হত না—যদিও তখনো এর নির্মাণকার্য শেষ হয়নি। সঙ্গে ছিল একটি মসজিদ—তাতে ছিল যথানিয়মে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-ছাত্রদের একটি আবাসগৃহ। মসজিদটি দেখতে আকারে কতকটা রোমের সেন্ট পিটার গির্জার মতো। তাতে কেন্দ্রীয় গম্বুজ ছিল না বটে, তবে পাশে দুশো ফিট উঁচু কয়েকটি বুরুজ ছিল। সে-স্থানে বোখারার বিরাট পাগড়িধারী মোল্লারা বসেছেন। আর বসেছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানপড়া দার্শনিকগণ। মোল্লা-দার্শনিকের তর্কও বেশ জমে উঠেছে সেখানে।

কালো চাদরপরা আরব জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু সিনাকে কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কৌশল শিখিয়েছে? তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর পরীক্ষাকার্য চালান?'

আলেপ্পোর জনৈক সরুনাক দার্শনিক উপরোক্ত প্রশ্নে যোগ করেন, 'আর বইয়েও কি তা তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখেন?'

তৃতীয় একজন উত্তরে বলেন, 'নিশ্চয়ই তিনি তা করেছেন। তবে তিনি অ্যারিস্টটলের প্রকৃতিবিজ্ঞানও পড়েছেন বইকি!'

মোল্লাদের একজন বলেন, 'সবই সত্য, কিন্তু কথা হচ্ছে, তাঁর বক্তব্যের মোদ্দা কথা কী?'

আরবটি হেসে বলেন, 'আল্লার দোহাই, আমি তাঁর বইয়ের শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানি না। তবে সম্ভবত অতিরিক্ত রমণীচর্চার ফলে তিনি নিজেরই জীবনের শেষে এসে পৌঁছেছেন!'

গম্ভীর আওয়াজে একজন বললেন, 'যত-সব নির্বোধের কথা! সত্যই তাঁর শেষের কথা কী? মৃত্যুপথযাত্রী এই বিখ্যাত চিকিৎসক আদেশ করেছিলেন তাঁকে বুলন্দ আওয়াজে কোরআন পড়ে শোনাতে। এর ফলে তিনি তাঁর মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছিলেন।'

একথা শুনে আলেপ্পোর লোকটি মাথা তুলে বলল, 'শোনো, যুক্তির থুতু দিয়ে ধ্যানের গালিচা যারা নষ্ট করছ, তারা শোনো! আমাদের মালিক তৈমুরের একটা গল্প আমি শুনাতে চাই।'

তার দিকে তখন সকলের মাথা ঘুরল। সে বলতে লাগল যে, দুবছর আগে সে তৈমুরের শিবিরে এক বিতর্কসভায় উপস্থিত ছিল। সেখানে তৈমুরের সম্মুখে সমরখন্দের কয়েকজন জ্ঞানীলোক এবং ইরানের কতিপয় শিয়া বসেছিল। 'আমি শুনলাম, আমাদের প্রভু প্রশ্ন করলেন, তাঁর যেসব লোক যুদ্ধে মারা গেছে, আর শত্রুপক্ষের যারা মরেছে—এদের মধ্যে শহীদ কাদের বলা হবে? কেউই সাহস করে এর উত্তর দিতে পারল না। অবশেষে এক কাজির স্বর শোনা গেল। তিনি বললেন,

হজরত মোহাম্মদ (দ.) স্বয়ং এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, যারা নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে, কিংবা যারা যুদ্ধ করেছে শুধু সাহস দেখাবার বা শুধু গৌরবলাভের আশায়, বিচারের দিন তাদের মুখ তিনি দেখবেন না। তারাই শুধু পয়গম্বরের মুখ দেখতে পাবে, যারা কোরআনের সত্যরক্ষার জন্য মরেছে।'

জনৈক মোল্লা জিজ্ঞেস করলেন, 'একথায় আমাদের প্রভু কী বললেন?'

'তিনি কাজিকে তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করলেন। কাজি জানালেন যে, দুকুড়ি বছর তাঁর বয়স। তখন আমাদের প্রভু বললেন, তাঁর নিজেরই বয়স হয়েছে তিন কুড়িরও দুবছর বেশি। বিতর্কে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, সবাইকে তিনি এনাম দিলেন।'

আরবটি বলল, 'আমি মনে করি, আপনি এই ঘটনাটি শরিফুদ্দিনের ইতিহাস থেকে নিয়েছেন।'

আলেপ্পোর লোকটি আত্মসমর্থনে বলল, 'আমার কান যা শুনেছে, তা-ই আমি বলেছি। শরিফুদ্দিনই আমার থেকে এটা নিয়েছে।'

আরবটি উপহাসের সুরে বলল, 'মাছি বলল, 'এ-জামা আমার'। ওহে আহমদ, সে-বিতর্কে কি আর কেউ ছিল না?'

আহমদ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের মালিকের কথায়ও যদি আপনাদের সন্দেহ হয়, তবে এই দেখুন!'

এই বলে সে তার সুদীর্ঘ বাহু মাথার উপর তুলে বিবি খানুমের মসজিদের সম্মুখভাগ দেখাল। বিশাল স্থাপত্য-নিদর্শন—যেন সমতল মরুভূমি থেকে ছোট পাহাড়ের মতো পরিষ্কারভাবে উপরে উঠে গেছে।

আরব দমবার পাত্র নয়। সে বলল, 'আল্লার দোহাই, আমি বুঝতে পেরেছি, এটা তাঁরই কোনো রমণী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।'

যে-রমণী এটা তৈরি করিয়েছিলেন, বা যাঁর জন্য তৈমুর এটা তৈরি করিয়েছিলেন, তিনি শায়িত আছেন পার্শ্ববর্তী বাগানের ছোট গম্বুজওয়ালা একটি কবরে। বিবি খানুমের দেহাবশেষ রয়েছে প্রবেশদ্বারের শাদা মার্বেলের এক চতুষ্কোণ জমাট পাথরের নিচে। সেখানে এখন বহুলোকের যাতায়াত এবং তাতার তলোয়ারধারী রক্ষী হিসেবে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বিবি খানুম ছাড়া তাঁর অন্য নাম আজ লুপ্ত হয়ে গেছে।*

পরিদর্শকগণ শুনেছেন যে, ইনিই ছিলেন তৈমুরের প্রিয়তমা প্রথমা পত্নী মালেকা আলজাই আগা—সবুজ-নগরী থেকে তাঁর দেহাবশেষ তুলে এনে এখানে সমাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ-কেউ বলেন, বিবি খানুম ছিলেন চীনা রাজকুমারী। অনেকে বলে, একরাত্রে কয়েকজন চোর এসে এর কাফনের বস্ত্র থেকে মূল্যবান পাথর চুরি করতে চেষ্টা

---

* বিবি খানুম সম্পর্কে এত গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি কে ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ঐতিহাসিকের মতে, তৈমুর চীনা রাজবংশের কোনো মেয়েকে কখনো বিয়ে করেননি। তবে মোঙ্গল খানের এক মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন বটে। কিন্তু এই বিয়ের সময়েই বিবি খানুমের সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। আর সরাই খানুম যে বিবি খানুম হতে পারেন না, তাতে ভুল নেই।

করেছিল, তখন একটা সাপ এসে তাদের কামড়ায়। পরদিন সকালে কবররক্ষীদল এসে দেখতে পায় যে, চোরদের মৃতদেহ সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

রাত্রির আঁধার নেমে এলে সমরখন্দবাসীদের গল্পগুজব শেষ হয়। তখন কেউ-কেউ যায় গোসলখানায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে। সেখান থেকে বেরিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে তারা খেতে যায়। খাওয়াদাওয়া সেরে কেউবা যায় আমিরদের দরবারে, আবার কেউ-কেউ যায় নদীর ধারে বেড়াতে। আমোদলোভী তাতারদের এই হচ্ছে পারস্পরিক দেখাসাক্ষাতের অবসর-মুহূর্ত। তখন তারা খাদ্যলোভে নানা দোকানে-হোটেলে ঘুরে বেড়ায়। কেউ যায় মটন রোস্টের হোটেলে, কেউবা যায় কেক-পিঠার দোকানে। শেষ পর্যন্ত প্রায় সবাই গিয়ে ভিড় জমায় মদের দোকানে।

নদীর তীর-বরাবর পরদা টানিয়ে ছায়াচিত্র দেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছায়াচিত্র দেখতে সেখানে ভিড় জমে। দড়ির উপর নৃত্য করার ব্যাপারও সেখানে প্রায়ই দেখা যায়। মাটির উপর গালিচা বিছিয়ে সেখানে বসে অনেকে সাগ্রহে এই নৃত্য উপভোগ করে। তাতারদের কেউ-কেউ আবার লিলি ও ডালিম গাছের কুঞ্জে বসে তাদের লাল নীল ফুলের আলো দেখতে ভালোবাসে। গালিচায়-বসা লোকদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় মদের সোরাহি-হাতে সাকির দল। সেখানকার লোকদের মধ্যে নানাশ্রেণীর কথার বিনিময় হয়—নানা সংবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। গীতরসিকরা গিটার বাজায়। চারদিকে চেয়ে দেখে কবি কবিতা আওড়ায়—যে-অজ্ঞাতপরিচয় জ্যোতিষী তাঁবুনির্মাতা বলে নিজের নাম স্বাক্ষর করত, তার কবিতা আওড়িয়ে যায়!

২৪
বড় বেগম বনাম ছোট বেগম

সমরখন্দ নির্মিত হয়েছিল তৈমুরের কল্পনা অনুসারেই। তাঁর জাতির অন্যসব বিজয়ীদের মতো তিনি পারস্য স্থাপত্যের অবিকল অনুকরণ করেননি। তিনি ইরানের ইমারতগুলো পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তারপর দক্ষিণাঞ্চল থেকে সঙ্গে নিয়ে যান কারিগরদের। কিন্তু সমরখন্দের ইমারতগুলো তাতারি রীতির—পারস্য রীতির নয়। এগুলোর ভগ্নাবশেষ এবং তৈমুর-নির্মিত অন্যান্য শহরের ধ্বংসাবশেষে আজও তাতার আর্টের চরম বিকাশ হিসেবে রয়ে গেছে। আজও রয়েছে সেগুলোতে মৃত্যুহীন সৌন্দর্যের প্রকাশ-চিহ্ন।

তাঁর পরিকল্পিত ইমারতগুলো সম্মুখভাগের চমৎকারিত্বের সাথে পেছনদিকের নির্মাণে কোনো-কোনো স্থানে কিছুটা অদ্ভুতত্ব ও কৌৎসিত্য হয়তোবা দেখা গেছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে এগুলোর পরিকল্পনায় ছিল একটা পরিপূর্ণ সারল্য। তৈমুর চেয়েছিলেন বিরাট কিছু গড়তে। অন্তত দুবার তিনি নির্মাণ শেষ-হয়ে-যাওয়া প্রাসাদ ভেঙে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন এবং পরে সেখানে আরো বৃহত্তর পরিধিতে তা নির্মাণ করিয়েছিলেন। বর্ণবিন্যাসে তাঁর ছিল আনন্দ।

তাতারজাতির বিষণ্ণ মেজাজ ও যাযাবরদের নীরব কাব্যানুভূতি তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর দালানগুলো ছিল মজবুত এবং সুন্দর। সবুজের সমারোহ ও প্রবহমান পানির নহর সম্পর্কে মরুবাসীদের যে-আনন্দ, তৈমুর এসবে সেই আনন্দই পেতেন। স্মরণযোগ্য যে, তাঁর প্রাসাদগুলোর সাথে বাগানের অবস্থান ছিল অপরিহার্য।

সমরখন্দে পাবলিক স্কোয়ারও ছিল। সেখানে সাধারণ নাগরিকদের নামাজপড়া, গল্পগুজব, রাজনীতি ও সংবাদচর্চার আসর বসত, আর বড় বড় আমির-ওমরাহগণের বিশ্রাম ও ভ্রমণের এবং বণিকগণের ব্যবসা সম্পর্কে আলাপ-পরিচয়ের স্থানও ছিল এই স্কোয়ার। এটাকে বলা হত 'রেগিস্তান'।

তৈমুরের ইচ্ছানুসারে এর চারদিকে যে-কয়েকটি ইমারত তৈরি করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল মসজিদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সরাই খানুমের ভোজসভার পরদিন সকালে সেখানে জমায়েত হয়েছিল বহু লোক। কারণ এরূপ গুজব প্রচারিত হল যে, আগের দিন একজন রাজদূত এসে রাজধানীতে পৌঁছেছে। মাতব্বর লোকেরা বলল, 'রাজদূত তৈমুরের নিকট থেকে এসেছে—শুধু এটুকু ছাড়া আর কিছু জানতে পারা যায় নাই। কিন্তু এ-নীরবতার কী অর্থ হতে পারে? এ কি বিপদের পূর্বাভাস?'

তাঁদের মনে পড়ল, বড় বড় আমির-ওমরাহগণ ভারত-অভিযানে অনিচ্ছুক ছিলেন—শুধু তৈমুরের তাগিদেই তাঁরা তাঁর সঙ্গে গেছেন। এমনকি, তৈমুরের পৌত্র মোহাম্মদ সুলতান বলেছিলেন, 'আমরা ভারতকে কাবু করতে পারি, কিন্তু তবু সেখানে বহু আড়াল-প্রাচীর রয়েছে। প্রথম এর নদীগুলো, দ্বিতীয় বন-জঙ্গল, তৃতীয় সশস্ত্র সৈন্য এবং চতুর্থ মানুষধ্বংসী হাতিসমূহ।'

ভারতে আগে গিয়েছিলেন, এমন একজন তাতার সেনাপতি বলেছিলেন, 'ভারত হচ্ছে আকস্মিক উত্তাপের দেশ। তা আমাদের দেশের গরমের মতো নয়। সে-গরম রোগ নিয়ে আসে, শক্তিহরণ করে। সেখানকার পানি খারাপ। সিন্ধুর ভাষা আমাদের ভাষা নয়। এমন দেশে আমাদের সৈন্যদের যদি বেশিদিন থাকতে হয়, তা হলে উপায় কী হবে?'

তাতার দরবারে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তৈমুরের আবির্ভাবের আগে তাঁরা রাজ্যশাসনও করেছেন। এখন অবশ্যি তাঁদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা জোরের সঙ্গে বললেন, 'ভারতের সোনা পেলে আমরা পৃথিবী জয় করতে পারি।'

তাঁরা জানতেন, পাহাড়ের ওপারে যে-সাম্রাজ্য, তা হচ্ছে এশিয়ার অর্থভাণ্ডার। এবং তৈমুর তা নিজের করে পেতে চান। তাঁরা এও সন্দেহ করতেন, তৈমুর সম্ভবত চীন পর্যন্ত একটা রাস্তা খুলতে চান। খোটেনের ওপারে গোবি মরুভূমিতে অনুসন্ধানকার্য চালানোর জন্য ইতঃপূর্বে কি দুই ডিভিশন তাতারসৈন্য পাঠানো হয়নি? কিছুদিন আগেই তো সেখান থেকে খবর এসেছে যে, খোটেন থেকে কাম্বালু পর্যন্ত দুমাসের পথ। তারা কাশ্মীরেও অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং জানিয়েছে যে, কাশ্মীরের পাহাড়গুলো চীনের পথের একটা বড় বাধা।

এই জ্ঞানীদের তখন স্মরণ হল, মাত্র কিছুদিন আগেই তৈমুর মোঙ্গল খানের এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন—আর মাত্র অল্পদিন আগে চীন-সম্রাট মারা গেছেন।

তাঁদের একজন বললেন, 'দুনিয়ায় বর্তমান সময়ে আছেন এমন ছয়জন শাসক,

যাঁদের আমরা নাম ধরে ডাকি না। বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতাও তা-ই বলেছেন এবং তাঁর সাথে সকলের দেখাও হয়েছে।'

একজন অফিসার হেসে বললেন, 'ছয়জন? না, মাত্র একজন, এবং তাঁর নাম হচ্ছে আমির তৈমুর!'

তাঁদের মধ্যে অধিকতর অভিজ্ঞ একজন বললেন, 'না, না! পর্যটক ঠিকই বলেছেন। তিনি এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন : কনস্টান্টিনোপোলের তাকফুর,* মিশরের সুলতান, বাগদাদের রাজা, তাতারিদের আমির, ভারতের মহারাজ এবং চীনের ফাগফুর। এ-পর্যন্ত আমাদের তাতারি প্রভু এক বাগদাদের সুলতান ছাড়া এঁদের মধ্যে অন্য কাউকেই বাগে আনতে পারেননি।'

তাতার অফিসারগণ তাঁদের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের যুদ্ধগুলো সম্পর্কে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। সেদিন সকালের 'রেগিস্তানের' এই বৈঠকে বৃদ্ধ সাইফুদ্দিন ও মোয়াভাও ছিলেন। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মাত্র একজন তৈমুরের নিকট পরাজিত হয়ে পালিয়েছিলেন, এবং এখন সেই সুলতান আহমদও আবার বাগদাদে ফিরে এসেছেন।

সত্যই পশ্চিমাঞ্চলের সব খবরই খারাপ। ককেশাস-বরাবর সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। সুলতানরা সমগ্র মেসোপটোমিয়া পুনর্দখল করেছেন। এখন যদি অদৃষ্টের ফেরে তৈমুর ভারতে পরাজিত হন! তৈমুরবাহিনী জয়ে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, আকস্মিক পরাজয়ের কথা তারা ভাবতেই পারে না! বিরান্নব্বই হাজার সৈন্য কি খাইবার পাস দিয়ে ভারতে যায়নি এবং সিন্দুনদের উপরে সেতু তৈরি করেনি? মুলতানের পতন হয়েছে এবং তৈমুর এখন দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন।

রাজধানীর তাতাররা হাতির যুদ্ধক্ষমতার কথা চিন্তা করছিল। তারা কখনো হাতি দেখে নাই।

সেই সকালে হঠাৎ সারা 'রেগিস্তানে' একথা রটে গেল যে, সংবাদবাহক দূতের খবর জানা গেছে। নগররক্ষীরা সে-খবর জানতে পেরেছে। খবরটি এই, 'প্রভু তৈমুর নটী শাদিমুলখকে হত্যা করার আদেশ পাঠিয়েছেন।'

শাদিমুলখ কে হতে পারে? সমগ্র সমরখন্দ সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল। যে-অল্পকয়েকজন জানতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বৃদ্ধ সেনাপতি সাইফুদ্দিন একজন। এই বৃদ্ধ সেনাপতি কিছুদিন আগে ইরান থেকে এক কৃষ্ণকেশ বালিকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটির ছিল বড় বড় চোখ এবং হারেমে লালিত শ্বেতশুভ্র দেহ। খানজাদের ছোটছেলে খলিল মেয়েটির সৌন্দর্য দেখে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারই পীড়াপীড়িতে সাইফুদ্দিন মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন তাকে। এইভাবে শাদিমুলখ তৈমুরের সর্বকনিষ্ঠ পৌত্রের বাহুতে গিয়ে ধরা দিল। প্রথম যৌবনের আবেগে খলিল

---

* তাকফুর মানে সম্রাট। ইবনে বতুতার এই তালিকা ইউরোপীয়গণকে বিস্মিত করবে বটে, কিন্তু গ্রিকসম্রাট ও বাগদাদের সুলতান সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতিরঞ্জিত হলেও মোটামুটিভাবে তাঁর তালিকাটি সত্যের সাথে সুসমঞ্জস।

তার এই নতুন প্রিয়ার পায়ের নিচে বসে দিন কাটাতে লাগল। সে রাজকীয় সমারোহে বিবাহেরও স্বপ্ন দেখতে লাগল।

কিন্তু তৈমুর এই বিবাহর অনুরোধে তৎক্ষণাৎ শুধু নিজের অস্বীকৃতিই জানালেন না, শাদিমুলখকে তাঁর কাছে হাজির করবার জন্যও আদেশ করলেন। ভয় পেয়ে বালিকা পালাল, কিংবা খলিল তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখল। তখন সৈন্যবাহিনী ভারত-অভিযানে চলে গেছে।

এখন তৈমুর ভারত থেকে শাদিমুলখের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পাঠালেন। খলিলের পক্ষেও এরপর তাকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল। আর সমরখন্দের সর্বত্র তাকে খুঁজে বার করার জন্য যে-অনুসন্ধান শুরু হল, তার ফলে আত্মগোপন করাও তার পক্ষে হয়ে উঠল অসম্ভব। মাত্র একটি স্থানে গেলে সে রক্ষা পেতে পারে। কাজেই সে আর দেরি না করে, বোরখা পরে প্রধানা বেগম সরাই খানুমের মহলে গিয়ে ঢুকল। বেগমের পায়ে পড়ে সে তার জীবনরক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাল। তাতারদের বেপরোয়া সাহস তার ছিল না।

মহিলা-মহলে এরপর এ-সম্পর্কে কী ধরনের আলোচনা হল, তা জানা যায়নি। কিন্তু এর আনুমানিক চিত্রটা পরিষ্কার। হেনা-মাখা সুন্দরী মেয়েটির দুচোখ থেকে গাল বেয়ে অঝোরে পানি পড়ছে, বিজয়ী তাতারদের ঐতিহ্যানুযায়ী সম্রাজ্ঞী কঠিনমুখে গম্ভীরভাবে বসে আছেন, আনন্দ-উপভোগের জন্য সৃষ্ট একটি সুন্দরী বালিকা শাদিমুলখ ভয়ে একেবারে উন্মাদপ্রায়, আর সরাই খানুম একই সঙ্গে বিধবা এবং স্ত্রী, শাহজাদাদের মা এবং দাদি—পঞ্চাশ বছরের ঝড়ঝাপটা যাঁর উপর দিয়ে গিয়েছে—

অবশেষে শাদিমুলখ চিৎকার করে উঠল। জানাল যে, তার পেটে রয়েছে খলিলের সন্তান।

বড় বেগম বললেন, 'তা যদি সত্য হয়, তা হলে তোমাকে তিনি মারবেন না।'

শাদিমুলখকে তিনি তার খোজাদের হেফাজতে পাঠিয়ে দিলেন। তবে তাকে নিষেধ করলেন, যতদিন-না তৈমুর এর ফয়সালা করেন, ততদিন যেন সে খলিলের সাথে দেখা না করে। ব্যাপারটা তুচ্ছ—এক অজ্ঞাতপরিচয় নটীর জন্য এক বালকের প্রেম। কিন্তু একটা সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ হয়ে পড়েছিল এর উপর নির্ভরশীল। সরাই খানুম ও খানজাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র বিদ্বেষ। কারণ বড় বেগমের মর্যাদার চাইতে খানজাদের প্রভাব বড় কম ছিল না। আর খানজাদে ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী এবং বড় বেগমের চাইতে বেশি চালাক। লোকে তাঁদের বলত বড় বেগম ও ছোট বেগম।

বড় বেগম যদি শাদিমুলখকে না-বাঁচাতেন, তা হলেই ভালো হত। যাহোক, পরে তৈমুর বড় বেগমের সিদ্ধান্তই মেনে নেন এবং শাদিমুলখ বেঁচে গেল।

সমরখন্দে এল একজন অশ্বারোহী দূত। যে-খবর নিয়ে সে এসেছিল তা সে মোটেই গোপন করবার চেষ্টা করল না। রক্ষীদলের আবাসগৃহ, সরাইখানা এবং সিংহদ্বারের সামনে ফিরে সে চিৎকার করতে করতে এল, 'জয়! আমাদের মালিক জয়লাভ করেছেন।'

তার পিছনে যারা এল, তাদের কাছে বিস্তৃত এবং ভয়াবহ খবর পাওয়া গেল। তারা

বলল, দিল্লির সুলতানের সাথে মোকাবিলা হওয়ার আগে তাতারসৈন্যরা প্রায় একলাখ বন্দিকে হত্যা করে। যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে তারা দিল্লি অধিকার করে। এরূপ শোনা গেছে যে, অগ্নিনিক্ষেপকারীরা হাতিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।*

সমরখন্দে উৎসব শুরু হল। প্রতি রাত্রেই 'রেগিস্তান' লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠতে লাগল। মসজিদে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। উত্তর-ভারতের পতন হওয়ার ফলে এশিয়ার অর্থভাণ্ডার তৈমুরের হস্তগত হল। হিন্দু রাজারা তাদের পার্বত্য আবাসে বিতাড়িত হল, ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নতুন খেলাফতের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—আর তৈমুরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল বাগদাদ থেকে ভারত পর্যন্ত। তৈমুরের আশ্রয়ে এসব অঞ্চল শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখবে। এর ফলে ইমামদের ক্ষমতা বাড়বে।

পরবর্তী বসন্তকালে সবুজ-নগরী এবং কৃষ্ণ-সিংহাসন হয়ে সৈন্যদল ফিরে এল। কৃষ্ণ-সিংহাসন মানে, যেখানে এক পাহাড়ের শীর্ষদেশে কৃষ্ণ-মার্বেলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।

শহরের তুর্কিগেটের নিচে গালিচা বিছানো হল এবং রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় বিছানো হল কাপড়। ছাদের প্রাচীর এবং বাগানের দেয়ালে রেশমের কাপড়ের ঝালর ঝুলিয়ে দেওয়া হল। দোকানগুলোর সম্মুখভাগ সাজানো হল এবং জনসাধারণ পরল বিচিত্র বর্ণের পোশাক।

তৈমুরকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য রাস্তায় নেমে এলেন আমির-ওমরাহগণ, বিদেশী দূতেরা এবং অন্দরমহলের বেগম ও শাহজাদিগণ। এলেন সহচরীদের নিয়ে অশ্বারোহণে সরাই খানুম—জনতার উপর দিয়ে এই অশ্বারোহিণীর ইতস্তত নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি পুত্র শাহরোখের মুখ অনুসন্ধান করে ফিরছিল। সেখানে খানজাদেও অপেক্ষা করছিলেন তাঁর প্রথম দুই ছেলে—মোহাম্মদ সুলতান ও পির মোহাম্মদের জন্য। শাহজাদাগণ চলে গেলে ক্রীতদাসরা তৈমুরের ঘোড়ার খুরের নিচে থেকে স্বর্ণরেণু, হীরার দানা এবং মূল্যবান পাথরকণা তুলে বাতাসে ছড়িয়ে দিল। প্রতীক্ষারত দর্শকগণ এরপর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ধুলোর উপরে মাথা দোলাতে দোলাতে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে এল বিশালকায় হাতির দল—সংখ্যায় তারা সাতানব্বুই। পিঠে চাপানো ছিল তাদের আগেকার প্রভুদের বিরাট সম্পদ-ভাণ্ডার।

এইভাবে অষ্টমবার তৈমুর বিজয়-গৌরবে সমরখন্দে প্রবেশ করলেন। ভারত থেকে আনা জিনিসগুলোর মধ্যে ছিল জুমা মসজিদের পরিকল্পনা আর দুশো কারিগর। এরা তেমনি একটা জুমা মসজিদ সমরখন্দেও তৈরি করবে। ইতিহাসে আছে, ঘোড়া থেকে নেমেই তৈমুর গিয়েছিলেন হাম্মামখানায়।

---

* তৈমুরের ভারতবিজয় একটা ছোট যুদ্ধের ব্যাপার মাত্র। তিনি দিল্লি অবরোধ করতে চাননি। এ-কারণে তিনি প্রান্তরে পরিখা খনন করে অপেক্ষা করছিলেন। এতে দিল্লির সুলতান প্রতারিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এটাই তৈমুর চাইছিলেন। ভারতীয় বাহিনী পরাজিত হল। তৈমুর ধীরেসুস্থে দিল্লিনগরী বিধ্বস্ত করেন। এরপর তৈমুর দক্ষিণসীমান্তের হিন্দুরাজ্যগুলো আক্রমণ করেন।

২৫
তৈমুরের শাহি মসজিদ

ভারতবিজয়ের স্মরণচিহ্ন হিসেবে তৈমুর একটা উল্লেখযোগ্য ও নতুন কিছু তৈরি করতে চাইলেন। অবশ্যি তিনি এ-সম্পর্কে আগেই একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছিলেন। তা বোঝা গেল, যখন সকলে দেখল যে, ২০শে মে তারিখে সমরখন্দে পৌঁছেই সে-মাসের ২৮শে তারিখেই তিনি একটা বিরাট মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এটাই অভিহিত হল শাহি মসজিদ নামে।

ইতিহাসকারের মতে, এটা হল বিরাট আকারের মসজিদ। তাতে তাঁর দরবারের সব লোকের স্থান হত। এরপর শিল্পী ও কারিগরদের আর ঘুমুবার অবসর রইল না। পাথর কাটার জন্য পাঁচশত লোক পাহাড়ি খনিতে প্রেরিত হল। হস্তীবাহিত হয়ে রাস্তা দিয়ে অনবরত কাটা প্রস্তরখণ্ড আসতে লাগল। হস্তীশক্তিকে গৃহনির্মাণের কাজে লাগাবার সমস্যা ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে উপস্থাপিত করা হল। তাঁরা এর একটা সুষ্ঠু সমাধান বের করলেন এবং সে-অনুসারে কাজ চলতে লাগল।

দেয়ালের কাজ শেষ হলে ভারতীয় কারিগরদের দুশো লোককেই ভিতরের কাজে লাগানো হল। তৈমুর যুদ্ধের কথা একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতের যুদ্ধের পরে নতুন মসজিদ নির্মাণ ছাড়া তাঁর মনে আর কোনো খেয়াল রইল না। গতবার শীতকালের যুদ্ধগুলোতে প্রায় দুলাখ লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু এর স্মৃতি তাঁর মন এতটুকু পীড়িত করল না। বিজয়ী সেনাপতিদের এখন স্তম্ভ ও প্রাসাদ-নির্মাণের কাজ তদারক করার জন্য নিয়োগ করা হল।

মসজিদের ভিতরদিকে চারশো আশিটি পাথরের স্তম্ভ নির্মিত হল। পিতলের কাজ-করা দরজা লাগানো হল। সিলিং দেওয়া হল মার্বেলের। মিম্বর বা পাঠমঞ্চ লোহা ও রুপার পাতে মুড়ে দেওয়া হল। কোরআনের আয়াত খোদাই করে চারদিকের দেয়াল সাজানো হল।

তিন মাসের কম সময়ের মধ্যেই মসজিদের মিনার থেকে মোয়াজ্জিনের আজান ধ্বনিত হল এবং ইমামের মিম্বর থেকে সম্রাটের নামে খোৎবা পঠিত হতে লাগল।

তৈমুর কখনো সরকারিভাবে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেননি। তিনি তখনো আমির তৈমুর গুরিগান নামেই অভিহিত হতেন। রাজবংশের শাসক 'তুরা' বলে তিনি দাবিও করেননি। তিনি তাঁর পরোয়ানায় এইভাবে নিজের সম্পর্কে উল্লেখ করতেন, 'আমির তৈমুর এই আদেশ দিচ্ছেন' বা আরো সংক্ষেপে, 'আমি, খোদার বান্দা তৈমুর, বলছি....'

কিন্তু তাতার রাজবংশীয় বেগমদের গর্ভজাত তাঁর পৌত্রগণ মির্জা এবং সুলতান উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তৈমুর তাঁর সাম্রাজ্য তাঁদের দিয়েছিলেন জায়গির হিসেবে। জাট-রাজ্য শাসন করতে দেওয়া হয়েছিল মোহাম্মদ সুলতানকে, আর ভারত পির মোহাম্মদকে। তৈমুরের শান্ত সুবোধ পুত্র শাহরোখ খোরাসান শাসন করছিলেন। হিরাতে তিনি নিজের প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। আর তৈমুরের দুর্নামী বিরাগভাজন পুত্র মিরন শাহের ছেলেদের কাছারি ছিল পশ্চিমাঞ্চলে—বর্তমানে তা বিশৃঙ্খলা ও

অশান্তিতে পূর্ণ হয়েছিল।

কাকে তাঁর উত্তরাধিকারী করা হবে, তৈমুর সে-সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেননি। প্রৌঢ় সরাই খানুম সবরকমের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আশা করতেন, তাঁর ছেলে শাহরোখকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হবে। খানজাদে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে খলিলের পক্ষে চেষ্টা-তদবির চালাতে কোনো উপায় বাকি রাখেননি। কিন্তু বৃদ্ধ দিগ্বিজয়ীর কাছে এ-সম্পর্কে কোনো কথা উত্থাপন করতে কারুরই সাহস হত না। আর পৌত্রদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল নিরপেক্ষ সালিশ বা বিচারকের।

বেগমদের উচ্চাশা সম্পর্কে নিরুদ্বেগ তৈমুর ঘোড়ার জিনে বসে হাতিগুলোর কাজ দেখেন। তাঁর মনে হল, শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বর্তমান বাজারটা খুবই ছোট। তিনি হঠাৎ আদেশ করলেন, রেগিস্তান থেকে একটা প্রশস্ত রাস্তা বের করে নদী পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে এবং সেটাকে বাণিজ্যের উপযুক্ত রাস্তা করে তুলতে হবে। এ-কাজ কুড়িদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে বলেও আদেশ দিলেন। দুজন ওমরাহের ওপর এ-কাজের ভার দেওয়া হল। তাদের বলে দেওয়া হল, তাঁর আদেশমতো কাজ না হলে তাদের গর্দান যাবে।

অবিলম্বে দুজন ওভারশিয়ার কাজে লেগে গেল। প্রস্তাবিত রাস্তায় যেসব বাড়িঘর পড়ে, সেগুলো ভেঙে ফেলার জন্য তৈমুর একদল সৈন্য নিযুক্ত করলেন। বৃথাই বাড়িঘরের মালিকরা প্রতিবাদ জানাল—নিজেদের মাত্র কাপড়চোপড় নিয়েই তারা পালিয়ে গেল। তাদের দেয়াল যখন ভাঙা পড়তে লাগল, তখন আর কী-ই-বা তারা সংগ্রহ করতে পারত।

শহরের বা'র থেকে কারিগর আনা হল। বস্তায় বস্তায় বালু চুনা এল। আবর্জনা সব গাড়ি করে দূরে ফেলে দেওয়া হল। মাটি সমান করে রাস্তা কাটা হল। মজুরদের কাজ দুভাগ করে দিনে-রাত্রে সমানে কাজ চলতে লাগল। ইতিহাসকার বলেছেন, কার্যরত মজুরদের দেখে মনে হয় যেন আগুনের পাশে কতকগুলো দৈত্য নড়াচড়া করছে! গোলমালে সেখানে কান পাতা যেত না।

বড় রাস্তার কাজ শেষ হয়ে গেল। তার উপর তোরণ নির্মিত হল। দোকানঘরগুলো তৈরি করা হল—তাদের গম্বুজওয়ালা ছাদের ভিতর দিয়ে জানালা বসানো হল। বণিকদের তাড়াতাড়ি দোকানঘর নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হল। নির্দিষ্ট কুড়িদিনের আগেই রাস্তা জনবহুল হয়ে উঠল। রাস্তা দিয়ে অশ্বারোহণে যেতে-যেতে তৈমুর কাজ দেখে খুশি হলেন।

এ-ব্যাপারে একটা অন্যরকমের পরিণতিও ছিল। গৃহ-বিতাড়িত মালিকরা কয়েকজন কাজির কাছে এ-ব্যাপারে তাদের নালিশ জানিয়েছিল। একদিন এই কাজিরা যখন তৈমুরের সাথে দাবা খেলছিলেন, তখন তাঁরা তৈমুরের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, এদের বাড়িঘর যখন ভেঙে দেয়া হয়েছে, তেমন অবস্থায় যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ তাদের দেয়া উচিত। তৈমুর রেগে গেলেন। বললেন, 'এ-শহর কি আমার নয়?'

তাঁদের জল্লাদের হাতে দেওয়া হবে, এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে কাজিরা তাড়াতাড়ি এই বলে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন যে, শহর নিশ্চয়ই তাঁর এবং তিনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তৈমুর বললেন, 'যদি ক্ষতিপূরণ

দেওয়া আপনারা উচিত মনে করেন, তা হলে নিশ্চয়ই আমি তাদের ক্ষতিপূরণ দেব।'

বস্তুত সে-সময় আর-একটা যুদ্ধের খেয়াল তাঁর মনে মোটেই ছিল না। তিনি তখন সংবাদ-সংগ্রহ করছিলেন। যতটুকু তিনি অধিকার করেছিলেন, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার তাঁর যথেষ্ট কারণ ছিল। ভারতকে তিনি নখদন্তহীন করেছেন, আর উত্তরাঞ্চল তাঁর হাতের মুঠোয়। একথা সত্য, দজলার পশ্চিমপার্শ্ব তাঁর কবল থেকে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানবার শক্তি পশ্চিমিদের হয়নি।

তাঁর বয়স তখন চৌষট্টি বছর। দেহ যদিও তাঁর আগের মতোই মজবুত রয়েছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝেই তাঁকে অসুখে ভুগতে হচ্ছে। মন তাঁর যৌবনকালের মতোই রয়েছে তাজা, কিন্তু নীরবে কাল কাটাতেই তাঁর এখন ভালো লাগে এবং তাঁর মেজাজ হয়ে পড়েছে রুক্ষ। শাহি মসজিদ তিনি তৈরি করেছেন বটে, কিন্তু ধর্মনেতারা তাঁর উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সমস্ত জীবন ধরে তিনি একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। ধর্মভীরু পিতার বিশ্বাস, ধর্মগুরু জইনুদ্দিনের নির্দেশ, কোরআনের আইন—এসবের প্রভাবের সাথে তাঁর যাযাবর পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারের এবং যুদ্ধলিপ্সা ও ধ্বংস করার প্রবৃত্তির বিরোধ বেধেছে। এখন মনে হল, যেন তিনি যাযাবর-বৃত্তির দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছেন—'মানুষের পথ মাত্র একটিই—সংগ্রাম, জয় এবং অধিকারের গৌরব!'

পশ্চিমের শাসকগণ ইসলামের এক-একটি স্তম্ভ—মিশরে রয়েছেন খলিফা, বাগদাদে আছেন বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা, আর তুর্কি সম্রাটের ব্যক্তিত্বে রয়েছে তরবারিহস্ত ইসলামি বাহু। তাঁদের কাছে তাতারিরা বর্বর—আধা-প্যাগান, বরং তার চাইতেও কিছু বেশি।

এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানে দাঁড়াবে মুসলিমজাহানকে বিভক্ত করা এবং দশলক্ষাধিক লোককে অস্ত্রসজ্জিত করা। ধর্মগুরুরা চান শান্তি—নিছক শান্তি। তাঁরা তৈমুরকে গাজি বলে অভিহিত করেন—মসজিদে মসজিদে তাঁর নামে খোৎবা পড়া হচ্ছে।

কিন্তু আদি তাতার-চরিত্রের একটা তৃতীয় দিকও আছে। তিনি এখনো সেই তৈমুর, যিনি একাকী দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে উরগঞ্জের সিংহদরজায় হাজির হয়েছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান যদি আসে, কস্মিনকালেও তিনি নীরব থাকতে পারবেন না। এখন তাঁরই আশ্রিত দলপতিগণকে এশিয়া মাইনর থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তাঁরই পুত্রের শাসনভূমি হয়েছে আক্রান্ত এবং তাঁরই নিযুক্ত গভর্নরের হাত থেকে বাগদাদ কেড়ে নেয়া হয়েছে। এ সবই হল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুস্পষ্ট আহ্বান।*

---

* এ ছাড়া তৈমুর তখন চীন আক্রমণেরও স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু পশ্চিমদিকে তাঁর রাজ্যসীমান্তকে অরক্ষিত রেখে তিনি পূর্বদিকে অভিযান করতে পারছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, গোবির মোঙ্গল খানদের সাথে মৈত্রীস্থাপন করে চীন আক্রমণ করা। এটা করতে গিয়েই তাঁকে কয়েক বছরের জন্য সমরখন্দের বাইরে যেতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি দিল্লির সুলতানকে অবনমিত করলেন, কারণ তিনিই ছিলেন তাঁর নিকটতম শত্রু। ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে তিনি পশ্চিমদিকে আক্রমণ চালিয়ে তাঁর সে-সীমান্ত সুরক্ষিত করলেন। তুর্কিদের সাথে তিনি বিবাদ চাননি—যতদিন তারা ইউরোপ নিয়ে থাকে। কিন্তু যখন তারা এশিয়ায় এল, তাদের সাথে তাঁকে যুদ্ধ করতেই হল। তারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তিনি সমরখন্দে ফিরে গেলেন এবং মাত্র দুমাসের মধ্যে চীন-অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েন।

১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি সমরখন্দে প্রবেশ করেন, আর সেপ্টেম্বরেই আবার নিজ সৈন্যবাহিনীসহ বেরিয়ে পড়েন। তারপর দীর্ঘ তিন বছর ধরে তাঁকে আর সমরখন্দে দেখা যায়নি।

২৬
তিন বছরব্যাপী যুদ্ধ

তাতার দিগ্বিজয়ী এরপর যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, তা বেশ একটুখানি অদ্ভুত ধরনের। শত্রুপক্ষের সাথে মোকাবিলা করতে হলে তাঁর পক্ষে সহস্রাধিক মাইল পশ্চিমদিকে যাওয়া দরকার। সেখানে তাদের সম্মিলিত বাহিনীর যে-সীমানা, তা অর্ধবৃত্তাকারে প্রসারিত ককেশাস পর্বত থেকে বাগদাদ পর্যন্ত। এ যেন কতকটা বাঁকা নমনীয় ধনুকের মতো—যাকে গোড়া পর্যন্ত টেনে নেয়া চলে। এবং তাতারবাহিনীর সুদীর্ঘ খোরাসান রোড ধরে অগ্রগমন যেন তীরের অগ্রভাগ থেকে তার গোড়া পর্যন্ত ধনুকের কেন্দ্রস্থলে যাওয়ার ব্যাপার আর-কি! পশ্চিমদিকে তৈমুর এগিয়ে চলেছিলেন—যেমন করে নেপোলিয়ান ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বিরোধী সম্মিলিত বাহিনীর অর্ধবৃত্তাকার ফ্রন্টের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল লিপজিগের যুদ্ধে এবং প্যারিসে তাঁর পশ্চাদপসরণের পূর্বে—যার ফলে নেপোলিয়নের পতন এবং তাঁর প্রথম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

নেপোলিয়ানের মতো তাতার দিগ্বিজয়ীরও ছিল বিচ্ছিন্ন শত্রুবাহিনীর বিপক্ষে এক অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী—যার সেনাপতি ছিলেন তিনি নিজে। কিন্তু যেসব দেশের উপর দিয়ে তাঁকে অভিযান করতে হয়েছিল, তা কিন্তু একরূপ ছিল না। ইউরোপের সেসব স্থান ছিল সমতল, আবাদযোগ্য ভূমি এবং সেখানে ছিল বহু রাস্তাঘাট ও খোলা গ্রাম। কিন্তু তৈমুর পশ্চিম-এশিয়ার যেসব স্থান অতিক্রম করলেন, তা ছিল নদী, পাহাড়, উপত্যকা, জলাভূমি ও মরুবালুকাপূর্ণ।

কয়েকটা পথের একটা তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল। কিন্তু একবার সে-পথ ধরে চলবার পর তাঁর পক্ষে পথ বদল করার উপায় ছিল না। এসব কাফেলা চলার পথে ছিল বহু সুরক্ষিত নগরী—এবং তাদের প্রত্যেকটির ছিল রক্ষী সৈন্যদল। তা ছাড়া তৈমুরকে মাস-ঋতুর দিকে নজর রেখেও চলতে হত, কারণ তাঁকে সৈন্যবাহিনীর খাবার শস্য এবং ঘোড়াগুলোর চারণভূমির কথাও ভাবতে হত। শীতকালে কতকগুলো দেশ ছিল একেবারে অনতিক্রম্য, আবার কতকগুলো গ্রীষ্মের অতিরিক্ত গরমের জন্য ছিল একেবারে নিষিদ্ধ স্থান। একবার নেপোলিয়ানও এই সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সিরিয়ার মরুভূমির গরমে একবার সুরক্ষিত নগরীর অবরোধ ত্যাগ করে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল।

অর্ধবৃত্তাকার শত্রুসীমানা-বরাবর তাতারদের জন্য অপেক্ষা করছিল প্রায় ডজনখানেক স্বতন্ত্র শত্রু-সৈন্যবাহিনী,—তারা ছিল ককেশাসের জর্জিয়ান যোদ্ধাদল।

তাদের পরেই ছিল ফোরাতের উৎসমুখ দখল করে ক্ষিপ্রগতি তুর্কি অভিযানকারীদল। তুর্কম্যানদের নিয়ে কারা ইউসুফ ছিল ওত পেতে। সিরিয়া দখল করে ছিল এক শক্তিশালী মিশরীয় বাহিনী আর দক্ষিণদিকে ছিল বাগদাদ। তৈমুর বাগদাদ আক্রমণ করলে উত্তরদিক থেকে তাঁর পিছনভাগে আক্রমণ চালাতে পারত তুর্কিসৈন্যরা। আর তিনি যদি এশিয়া মাইনরে তুর্কিরাজ্যে অভিযান চালাতে যেতেন, তেমন অবস্থায় মিশরীয় বাহিনী কর্তৃক তাঁর পিছনভাগ আক্রান্ত হতে পারত।

এ-কারণেই তিনি প্রথম যেমন ইউরোপে তুর্কি-ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে পারলেন না, তেমনি পারলেন না মিশরের মামলুকদের রাজধানীর উপর হামলা করতে। উভয় সুলতানের কাউকে তিনি তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করতে পারলেন না ; অথচ তারা যে-কোনো সময়ে ইচ্ছা করলেই এশিয়া আক্রমণ করতে পারত।*

সবার উপরে ছিল পানির প্রশ্ন। সৈন্যবাহিনীর সাথে হাতিও ছিল। আসলে সৈন্যদলে অশ্বারোহীই ছিল বেশি এবং তাদের প্রত্যেকের সাথে থাকত একটা করে অতিরিক্ত ঘোড়া। পঞ্চাশ হাজার থেকে আড়াই লাখ ঘোড়া নিয়ে পথ চলতে হলে এজন্য দরকার এদের যথোপযুক্ত যত্ন এবং স্থান সম্পর্কে নির্ভেজাল জ্ঞান। অভিযানের সময়ে তৈমুর তাঁর ভূগোলবেত্তা ও বণিকদের সাথে প্রতিদিন আলোচনা করতেন। প্রধান সৈন্যদলের আগে-আগে চলত একদল স্কাউট। তাদেরও আগে-আগে একদল পরিদর্শক শত্রুদের গতিবিধি ও পানি-পরিস্থিতির খবরাখবর করত। পরিদর্শকদেরও আগে সীমান্তে চলে যেত গুপ্তচরের দল।

অভিযানের প্রথমদিকে তৈমুর বেশ জাঁকজমকের সাথে ধীরেসুস্থেই এগুচ্ছিলেন। সরাই খানুম, আরো দুজন বেগম এবং কয়েকজন পৌত্র তাঁর সাথে ছিলেন। খোরাসান রোড তাতার-দরবারের ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী-ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ইতোমধ্যে তৈমুরের অফিসারগণ তাব্রিজ শহরকে পশ্চিমদিকের যুদ্ধ-পরিচালনা-কেন্দ্রে এবং কারাবাগ প্রান্তরকে ঘোড়া-বদলানোর ক্ষেত্রে পরিণত করার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। তৈমুর নিজে চিঠিপত্র লেখায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশেষ করে, রুশ তৃণাঞ্চলের অধিপতি ইদিকু নামক জনৈক তাতার খানের নিকট তিনি এক পত্র লিখলেন। এ-চিঠির এক বিস্ময়কর সরল উত্তর তিনি পেলেন।

ইদিকু লিখলেন, 'আমির তৈমুর, আপনি বন্ধুত্বের কথা বলেছেন। কুড়ি বছর আমি আপনার দরবারে কাটিয়েছি। কাজেই ভালো করেই আমার জানা আছে, আপনার মনের অভিসন্ধি। আমাদের যদি বন্ধু হতে হয়, তবে তরবারি হাতে নিয়েই তা হতে হবে।'

---

* এই পর্বতশ্রেণী অভিযান-পরিচালনার পক্ষে যে কতবড় বাধা, তা প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি বুঝেছিল। উত্তরদিক থেকে রুশবাহিনী আর্জরুমের বাইরে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ব্রিটিশবাহিনীকে বাগদাদের দক্ষিণে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। সিরিয়ায় দামেশ্‌ক দখল করতে তাদের দুবছর লেগেছিল। তৈমুরের সময়ে তুর্কিবাহিনী অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তা ছাড়া মামলুক, জর্জিয়ান, তুর্কম্যান, সার্কাশিয়ান প্রভৃতি জাতির যোদ্ধারা তুর্কিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

সে যা-ই হোক, তৃণাঞ্চলের তাতাররা তৈমুরের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করল না। তারা আসন্ন যুদ্ধে নিরপেক্ষ রইল।

তুর্কিদের সম্রাট বায়েজিদ। তৈমুর বায়েজিদের কাছে চিঠি দিলেন সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষায়। তাঁকে অনুরোধ জানানো হল, তিনি যেন কারা ইউসুফ ও সুলতান আহমদকে কোনোরূপ সাহায্য না করেন। এরা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে এবং তৈমুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বায়েজিদের সাথে এ-পর্যন্ত তৈমুরের কোনোরূপ বিবাদ-বিসংবাদ হয়নি। তিনি তুর্কি সামরিক শক্তিকে সমীহও করতেন। তুর্কিরা যদি ইউরোপ নিয়ে থাকে, তা হলে তাকে ঘাঁটাবার কোনো দরকারই তাঁর পড়ে না।

কিন্তু বায়েজিদের উত্তরে আপোসের সুর ছিল না। তার সারমর্ম ছিল এইরূপ, 'তৈমুর নামক রক্তপিপাসু কুকুরকে জানাচ্ছি যে, তুর্কিরা আশ্রয়প্রার্থী বন্ধুকে বিমুখ করতে যেমন অভ্যস্ত নয়, শত্রুর সাথে যুদ্ধবিমুখ হতে কিংবা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের সাথে আপোস করতেও তেমনি রাজি নয়।'

তৈমুরের পক্ষ থেকে গেল এর তীব্র উত্তর। তাতে তুর্কম্যান যাযাবরগোষ্ঠী থেকেই যে ওসমানীয় সুলতানদের উৎপত্তি—প্রচলিত এ-কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। চিঠিতে আরো বলা হল, 'তোমাদের উৎপত্তির ইতিকথা আমার জানা আছে।' কিছু করবার আগে বায়েজিদ যেন ভালো করেই তার পরিণাম ভেবে দেখেন। হাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথাও যেন তাঁর মনে থাকে। তবে তৈমুরের জানা আছে যে, তুর্কম্যানরা কোনোদিন বিচারবুদ্ধিপরায়ণ নয়। 'আমাদের পরামর্শ না শুনলে পরে তোমাকে পস্তাতে হবে। তাই ভেবেচিন্তে যা ভালো বোঝো, করো।'

এর উত্তরে বায়েজিদ এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। তাতে তাঁর বিজয়গৌরবপূর্ণ যুদ্ধজীবনের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত হল, কী করে তিনি ইউরোপ জয় করেছেন, অবিশ্বাসীদের দুর্গ তিনি কীভাবে করেছেন চূর্ণ—ইত্যাদি। আরো বলা হল যে, শুধু তিনি নন, তাঁর পিতাও ধর্মের জন্য—ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য শাহাদৎ বরণ করেছেন। চিঠির উপসংহারে বললেন, 'যাক, বহুদিন ধরেই তোমার সাথে যুদ্ধ করার কথা ভাবছিলাম। খোদাকে ধন্যবাদ যে, এতদিনে সে-সুযোগ তিনি দিয়েছেন। তুমি যদি আমার এখানে না আসো, তবে আমিই যাব সুলতানিয়ায় তোমার সাথে মোকাবিলা করতে। তখন দেখা যাবে, জয়ের তাজ কার শিরে শোভা পায়, আর পরাজয়েই-বা কে ভূলুণ্ঠিত হয়!'

তৈমুর সঙ্গে সঙ্গে এর উত্তর দিলেন না। পরে সংক্ষেপে জানালেন, বায়েজিদ এখনো যুদ্ধ এড়াতে পারে, যদি সে কারা ইউসুফ ও সুলতান আহমদকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করতে পারে।

বায়েজিদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন। তাঁর জওয়াবের ভাষা ছিল তীব্র কটুবাক্যপূর্ণ—এত তীব্র যে, ইতিহাসকারগণ তাঁদের বিবরণে সে-চিঠি অবিকল উদ্ধৃত করতে পর্যন্ত সাহসী হতে পারেননি। পত্রের শীর্ষদেশে বায়েজিদের নাম লিখিত হয়েছিল সোনালি হরফে, আর ছোট কালো হরফে লেখা হয়েছিল পত্রের নিচের দিকে তৈমুরের নাম—

'তৈমুর লঙ' বলে। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কথাও জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তৈমুরের সবচাইতে প্রিয় স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করবেন। এই চিঠি পেয়ে তৈমুর আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। কিন্তু যখন এসব উত্তেজনাপূর্ণ পত্র-বিনিময় চলছিল, তৈমুর তখন প্রস্তুতির ব্যাপারে অনেক এগিয়ে গেছেন।

প্রথমেই তিনি শাহিমহলের বেগমদের পাঠিয়ে দিলেন নিরাপদ দূরত্বে—সুলতানিয়ায়। তারপর তিনি তাঁর বেশিরভাগ সৈন্য সমাবেশ করলেন কারাবাগে এবং স্বতন্ত্র কয়েক ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন জর্জিয়ানদের বিরুদ্ধে ককেশাস অঞ্চলে। বন-জঙ্গলসমাকীর্ণ গিরিসঙ্কট কেটে আবার রাস্তা তৈরি করা হল। সেখানকার খ্রিস্টান সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করা হল। অগ্নিকাণ্ড ও বেপরোয়া হত্যার ফলে দেশ ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত হল। গির্জাগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হল—এমনকি আঙুরক্ষেতগুলোও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হল। অন্যান্যবারের মতো এবার আর কোনো শর্ত বা অবসর দেয়া হল না। যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে তৈমুর ছিলেন ক্ষমাহীন।

এসব ঘটনার আবর্তের মাঝখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর হল আবির্ভাব। বরফ গলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরবাহিনীর মূল ডিভিশনগুলো আর্জরুম উপত্যকার ভিতর দিয়ে এশিয়া মাইনরের দিয়ে এগিয়ে চলল। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগেই তিনি অধিকার করলেন সিবাস পর্যন্ত সে-অঞ্চলের সবগুলো শহর।

এশিয়া মাইনরের চাবিকাঠি ছিল এই সিবাস। সীমান্তের তুর্কি সৈন্যরা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করল। তাতারবাহিনী ভিত খুঁড়ে ফেলে শহরের দেয়ালে ভাঙনের সৃষ্টি করল। পরে আশ্রয়স্তম্ভগুলোতে আগুন দেয়ার ফলে সমগ্র দেয়াল ধসে পড়ল। শহরের মুসলমান অধিবাসীদের প্রাণরক্ষা করা হল বটে, কিন্তু বাধা দিয়ে তাতারদের হয়রান করেছিল যে-চার হাজার আর্মেনীয় অশ্বারোহী, দুর্গ-পরিখায় হয়ে গেল তাদের জীবন্ত কবর।

এরপর তৈমুর দুর্গসংস্কারের আদেশ দিলেন। সেখানে সমবেত তুর্কম্যান সৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ করে তিনি দক্ষিণদিকে এগিয়ে চললেন এবং বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে তিনি দক্ষিণাঞ্চলের দ্বারদেশ মালেটায় পৌঁছে গেলেন। তাঁর পৌঁছবার আগেই সেখানকার তুর্কি গভর্নর তাঁর লোকজনসহ পালিয়ে গেলেন।

তারপর, এশিয়া মাইনরের দিকে না গিয়ে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সিরিয়ার দিকে অভিযান করার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। তাঁর আমিরগণ এলেন দল বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে। তাঁরা বললেন, মাত্র এক বছর আগে ভারতের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তারপর এই সৈন্যবাহিনী দুটো নতুন যুদ্ধে দুহাজার মাইল অতিক্রম করেছে। সিরিয়ায় শত্রুসংখ্যা অগণ্য, আর সেখানকার নগরগুলো দুর্গ-সুরক্ষিত। সৈন্য এবং পশুগুলোর বিশ্রাম দরকার।

তৈমুর বললেন, 'সংখ্যাটা ধর্তব্যের বিষয়ই নয়।' তাঁর আদেশে সৈন্যবাহিনী দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলল।

আইনতাব আক্রান্ত ও অধিকৃত হল। আলেপ্পোয় মিশর-সুলতানের সৈন্যবাহিনী

অপেক্ষা করছিল। এখানে এসে তৈমুরবাহিনীর গতি হল শ্লথ। পরিখা খুঁড়ে এবং শিবিরগুলোর চারদিকে নানা বেড়াজাল তৈরি করে সৈন্যবাহিনী প্রতিদিন ধীরগতিতে অগ্রসর হয়ে চলল। মামলুক ও সিরীয় সৈন্যদল এটাকে দুর্বলতার লক্ষণ মনে করে যুদ্ধ করতে দেয়ালের বাইরে এল। তাতারবাহিনী তৎক্ষণাৎ বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মধ্যস্থলে রইল হাতিগুলো এবং হাতির হাওদাগুলোতে তীরন্দাজ ও অগ্নিনিক্ষেপক দল।

আক্রমণের শুরুতেই শত্রুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তাতারবাহিনী আলেপ্পোয় প্রবেশ করে দুর্গ দখল করল। তারপর দামেশ্‌কের দিকে এগিয়ে চলল। তখন ১৪০১ সালের জানুয়ারি মাস।

দামেশ্‌কে তৈমুরের গতিরোধকল্পে নতুন সৈন্যদলের আগমন-প্রতীক্ষায় সময়ক্ষেপণের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে দরদস্তুর করতে লাগল। তাতারবাহিনী দামেশ্‌ক ছেড়ে যেই এগিয়ে চলেছে, নতুন সৈন্যদলের আগমনে বর্ধিতশক্তি শত্রুদল তখনই পেছনে থেকে আক্রমণ চালাল। প্রথমদিকে কিছুটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু তৈমুর অবিলম্বে সৈন্যদলে আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন এবং তীব্রতর আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার করলেন।

তারপর দামেশ্‌কে ফিরে এসে সৈন্যদের শহর-লুটের আদেশ দিলেন। শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল এবং কয়েকদিন ধরে শহরের সবকিছু আগুনে পুড়ল। এর ভস্মস্তূপে নিহতদের শবদেহ সমাহিত হল।

মিশরীয় সৈন্যদের মধ্যে যারা বাঁচল, তারা পালাল ফিলিস্তিনের ভিতর দিয়ে। মিশরের সুলতানের আদেশে তৈমুরের গতিরোধকল্পে একটা শেষ চেষ্টা করা হল। শহীদি জোশে উদ্দীপ্ত হয়ে এক নরঘাতক ছোরা-হস্তে খঞ্জ দিগ্বিজয়ীর কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে ধরা পড়ে গেল এবং তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হল।

দামেশ্‌কে যখন এই ধ্বংসের উৎসব চলছিল, সে-সময়ে তৈমুর একটি অদ্ভুত গম্বুজের নকশা তৈরির আদেশ দিলেন। দামেশ্‌কে এই গম্বুজটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটি ছিল একটি সমাধিস্তম্ভের এবং সে-স্তম্ভটি দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দেখা যেত। তাতারগণ যে-ধরনের গম্বুজের সাথে পরিচিত, এটি সেরূপ ছিল না। ভিত্তিমূল থেকে স্ফীত হয়ে বেরিয়ে এটা ক্রমে সরু হতে হতে একেবারে অতি সূক্ষ্ম বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এর আকার কতকটা ডালিমের মতো।

অন্যসব স্থাপত্যশিল্প থেকে এটা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। এর জমকালো ধরনটা তৈমুরকে মুগ্ধ করেছিল।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দামেশ্‌কের এই বিশিষ্ট গম্বুজটি তৈমুর-নির্মিত পরবর্তী ইমারতগুলোর এবং তাঁর বংশধরদের সমাধিস্তম্ভের গম্বুজের নমুনা হিসেবে চলতি হয়েছিল। পরবর্তী এক শতাব্দীতে এ-নমুনা ভারতে নীত হয়ে তাজমহলের চূড়ার গঠনে ব্যবহৃত হয়। শুধু তাজমহলে নয়, ভারতের মোগলসম্রাটদের অন্যান্য ইমারতে ও রাশিয়ার প্রতিটি গির্জার চূড়াও এই নমুনার।

২৭
বিশপ জনের ইউরোপ গমন

দামেশ্‌কে তৈমুর আর-একবার গতি পরিবর্তন করলেন। সেখান থেকে তুর্কিদের মুলুকের দিকে না গিয়ে তিনি সিরীয় মরুভূমি থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। এক ডিভিশন সৈন্য তিনি পাঠালেন জেরুজালেমের উপকূলের দিকে। তারা মিশরীয় বাহিনীর পিছু-ধাওয়া করে আক্কা পর্যন্ত গেল। এই আক্কাই হচ্ছে ক্রুসেডের যোদ্ধাদের একার। পরবর্তীকালে এই একারই নেপোলিয়ানের গতিরোধ করেছিল। কিছু সৈন্য পাঠানো হল পূর্বদিকে বাগদাদ অবরোধের জন্য।

তৈমুর নিজে ফিরে গেলেন আলেপ্পো পর্যন্ত। তখন ১৪০১ সালের মার্চ মাস। খুবই ধীরগতিতে চলে তিনি ফোরাত পার হলেন। ধীরগতিতে এই কারণে যে, তাতারদেরও তো সহনশীলতার একটা সীমা আছে! এই সময়ে সৈন্যদের শিকার করার সুযোগও তিনি দিলেন। মদের সাথে হরিণীর গোশতের নয়া স্বাদ সৈন্যেরা তখন উপভোগ করতে পেরেছিল বলে ইতিহাসকার উল্লেখ করেছেন।

এখান থেকে তিনি তাঁর সৈন্যসমাবেশ-কেন্দ্র তাব্রিজের সাথে ভালো করে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত আমিরদের নিকট থেকে নানা খবরাখবরও তিনি পেলেন। সমরখন্দের রিপোর্ট এবং সিবাসের সাপ্তাহিক সংবাদও তাঁর কাছে আসতে লাগল। সিবাস ছিল বায়েজিদের রাজ্যের প্রবেশদ্বার। এর দুশো মাইলের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করতে তাঁর দেরি হল না।

বাগদাদ সম্পর্কে যে-খবর এল তাঁর সেখানকার আমিরদের নিকট থেকে, তাতে তিনি দক্ষিণ রোড ধরে দ্রুত এগিয়ে চললেন। মনে হল, সুলতান আহমদের সেনাপতি নগর রক্ষা করতে পেরেছে। সুলতান আহমদ পালিয়ে বায়েজিদের কাছে চলে গেছেন বটে, তবে নগররক্ষী সেনাপতিকে এই আদেশ দিয়ে গেছেন যে, তৈমুর যদি নিজে এসে হাজির হন, তবে যেন আত্মসমর্পণ করা হয় ; কিন্তু তিনি যদি না আসেন, তবে তাতারদের মোকাবিলা করার জন্য তুর্কিরা না-আসা পর্যন্ত যেন নগর রক্ষা করা হয়।

এই কারণেই তৈমুর দ্রুতবেগে বাগদাদ-অভিমুখে চলেছিলেন।

তাঁর আগমনের কথা সুলতানের নগররক্ষী অফিসারগণকে জানিয়ে দেওয়া হল। যে তৈমুরকে দেখেই চিনতে পারবে, এমন এক ব্যক্তিকে এ-সংবাদের সত্যতা পরখের জন্য পাঠানো হল। কিন্তু সুলতানের নগররক্ষী, সেনাপতি ফারাজ তার প্রভুর নির্দেশ অমান্য করল। সম্ভবত তৈমুরের আগমনে নগরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেওয়ায় আত্মসমর্পণে সে ভয় পেয়েছে, কিংবা গ্রীষ্মের গরমে দজলা-উপত্যকা একেবারে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হওয়ায় তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাতাররা ফিরে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার জানা উচিত ছিল যে, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মধ্যে তাতাররা কোনো দুর্গের অবরোধই পরিত্যাগ করেনি। বাগদাদের অধিবাসীরা বিশ্বাস করেছিল যে, তাতাররা বাগদাদের বিশাল পাথরের দেয়াল ভেদ করতে পারবে না।

বাগদাদ অবরোধের ইচ্ছা তৈমুরের ছিল না। কারণ তাঁর সৈন্যগণ দুবছরের মধ্যে

বিশ্রামের মুখ দেখেনি। তাঁর মূল বাহিনীও রয়েছে সৈন্যসমাবেশ-কেন্দ্র তাব্রিজে তুর্কিদের হামলার মোকাবিলা করার জন্য। এ-সময়ে সেখানে থেকে যাবার পরিকল্পনাই ছিল তাঁর। রোদের গরমে তিনি তাঁর তীব্র অগ্রগতি বজায় রাখতে পারলেন না। তিনি কাবু হয়ে পড়লেন মরুভূমির গরমে। তাঁকে খাদ্য ও চারণভূমির অভাবেরও সম্মুখীন হতে হল।

কিন্তু দজলার চাবিকাঠি হল বাগদাদ। এটাই হল মিশরীয় সৈন্যদলের এবং তাঁর এশীয় শত্রুবর্গের সমাবেশকেন্দ্র। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিনি পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেললেন। অশ্বারোহী কাসেদ-দল ছুটল তাঁর এই আদেশ নিয়ে যে, শাহরোখ যেন দশ ডিভিশন দুর্ধর্ষ সৈন্য এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে অবিলম্বে চলে আসে। তুর্কিদের গতিবিধির সন্ধান রাখবার জন্য এশিয়া মাইনরে একদল পর্যবেক্ষক পাঠানো হল। সমরখন্দে শাহজাদা মোহাম্মদের কাছে আদেশ পাঠানো হল, সে যেন অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে পশ্চিমদিকে অভিযানে বেরিয়ে যায়।*

শাহরোখ এসে পৌঁছুলে তৈমুর বাগদাদের দেয়ালের সামনেই তাঁর অশ্বারোহী-বাহিনীর পরিদর্শনের আদেশ দিলেন। নিশান তুলে, ব্যান্ড বাজিয়ে একলাখ তাতারসৈন্য স্থানীয় অধিবাসীদের চোখের উপর প্যারেড করল। এই প্রদর্শনীতে তেমন কিছু কাজ হল না। তৈমুর দেয়াল ভাঙার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

শহরের নিচে দজলার বুকে নৌকোর সেতু বিস্তৃত হল। এর ফলে নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে যাতায়াত করতে অবরোধকারীদের সুবিধা হল এবং নদী দিয়ে শত্রুপক্ষের পলায়নের পথ হল বন্ধ। শহরতলিতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ধ্বংস করে তা অধিকার করা হল। শহরের বারো মাইলব্যাপী পরিধি অবরুদ্ধ হল। দূরবর্তী জঙ্গল থেকে বড় বড় গাছের গুঁড়ি আনা হল এবং নিকটবর্তী উঁচুভূমির কাছে সেগুলো স্তূপীকৃত করা হল। কাঠের স্তূপের উপরে অবরোধ-ইঞ্জিন বসানো হল—যাতে দেয়ালের উপরে এবং নগরীর ভিতরে পাথর নিক্ষেপ করা সম্ভব হয়।

ইতোমধ্যে পাথর-খনকের দলও ভিতরে ভিতরে গর্ত করার কাজে লেগে গিয়েছিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র বহির্দেয়াল ভেঙে পড়ল। কিন্তু বাগদাদিরা ভিতরে পাথর-সিমেন্টের আরো একটা দেয়াল তৈরি করিয়েছিল। তার ভিতর থেকে শত্রুদল আগুন নিক্ষেপ করতে লাগল। তৈমুরের সেনাপতিগণ শত্রুর উপর ব্যাপক হামলা চালাবার জন্য তৈমুরের অনুমতি চাইলেন। গরমের তীব্রতা দোজখের আগুনকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ইতিহাসকাররা বলেন, সে-গরমে দগ্ধ হয়ে আকাশ থেকে প্রাণহীন পাখিরা নিচে পড়তে লাগল। সশস্ত্র সৈন্যদল অগ্নিদগ্ধ দেয়ালের নিচে পোড়ামাটির শিখায় যেন পিঠার মতো সিদ্ধ হতে লাগল।

---

* ১৩৯৯ সালের শরৎকাল থেকে ১৪০১ সালের শরৎকাল পর্যন্ত দুই বছর ধরে তৈমুর বায়েজিদদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আয়োজনেই সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন। বায়েজিদ তখন ইউরোপ থেকে এশিয়ায় সৈন্য সরিয়ে আনছিলেন। তখন যদি তিনি বাগদাদের পতন রোধকল্পে দ্রুততার সাথে সৈন্য নিয়ে আসতে পারতেন বাগদাদে, তা হলে তাঁর সম্মুখে তাব্রিজের পথ খোলা হয়ে যেত। তাতারবাহিনী তাব্রিজ ত্যাগ করতে বাধ্য হত।

কিন্তু হঠাৎ এক ভরা-দুপুরের গরমে কোনোরূপ সতর্ক না করেই তৈমুর ঢাকে কাঠি দিলেন। সে-সময়ে কয়েকজন পর্যবেক্ষক ছাড়া সব নগররক্ষী শত্রুদল বহির্দেয়াল থেকে সরে গিয়েছিল। তাতার রেজিমেন্টের কিছুসংখ্যক বাছাই সৈন্য সিঁড়ির আবরণ থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। এই আকস্মিক আক্রমণ সফল হল। তোক্‌তামিশের সাথে শেষ যুদ্ধে যে-নুরুদ্দিন তৈমুরকে রক্ষা করেছিল, সে-ই গিয়ে দেয়ালের উপরে উঠে সোনালি অর্ধচন্দ্রখচিত ঘোড়ার লেজের নিশান পুঁতে দিল।

তখন ভীমরবে ড্রাম বেজে উঠল। সমগ্র সৈন্যবাহিনী হামলা করতে এগিয়ে গেল। নুরুদ্দিন রাস্তায় নেমে পড়ল এবং তাতারসৈন্যদের ভিতরে পাঠাতে লাগল। বিকেলের মধ্যভাগেই সেই অসহ্য গরমের মধ্যে, তাতারিরা শহরের এক-চতুর্থাংশ ভাগ দখল করে ফেলল। বাগদাদিরা ঊর্ধশ্বাসে নদীর দিকে ছুটে পালাতে লাগল। নদীর ওপারে শহর এখন আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত। তারপর যে-ভয়াবহ পৈশাচিক দৃশ্য অভিনীত হল, তার বর্ণনার প্রয়োজন নেই। দুঃখ, কষ্ট ও বিপুল ক্ষতির জন্য পাগলপ্রায় তৈমুরের সৈন্যরা যেন দৈত্যের মতোই হত্যা-উৎসবে মেতে উঠল।

ইতিহাসকার বলেছেন, 'দারুস সালাম' বা শান্তির আলয় নামে অভিহিত বাগদাদ তখন হয়ে উঠেছিল ভয়াবহ দোজখ। নগররক্ষী সেনাপতি ফারাজ নৌকোয় করে পালাতে গিয়ে তীরবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। তার দেহ টেনে তীরে আনা হল। কর্তিত শিরে একশো বিশটা স্তম্ভ তৈরি হল। প্রায় নব্বই হাজার লোক সে-যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

তৈমুর সব দেয়াল ধূলিসাৎ করতে এবং সব ইমারত পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন। শুধু মসজিদগুলো এবং সেগুলোর সাথে সংলগ্ন ইমারতগুলো রক্ষা পেল।

এইভাবেই বাগদাদ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেল। পরে আবার সেখানে শহর গড়বার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেদিন থেকে তার গুরুত্ব একেবারে চলে গেল। বাগদাদের পতনের খবর তৈমুরের সাম্রাজ্যের সব নগরীতেই পাঠানো হল। তুর্কি সুলতান বায়েজিদকেও খবরটা দেওয়া হল।

ঝড় থেমে গেলে বাগদাদের পলাতক মালিক সুলতান আহমদ আবার ফিরে এলেন। এ-খবর শুনে পলায়নকারী মালিককে গ্রেফতার করার জন্য তৈমুর একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন। সুলতান আহমদ নদী পার হয়ে আবার পালালেন। তিনি এরপর বায়েজিদের আশ্রয়ে নিরাপদে রইলেন।

মূল সৈন্যবাহিনীকে লটবহর ও অবরোধের সরঞ্জামাদিসহ ধীরেসুস্থে তাঁর অনুসরণ করতে বলে তৈমুর তাড়াতাড়ি তাব্রিজ চলে গেলেন শাহরোখ ও কয়েকজন সেনাপতিকে সঙ্গে করে। বাগদাদের পতন হয় জুন মাসে, আর ১৪০১ সালের জুলাই মাসেই তিনি আবার তাঁর সৈন্যসমাবেশ-কেন্দ্রে ফিরে এলেন। তাঁর পৌত্র প্রিন্স মোহাম্মদ সমরখন্দ থেকে রসদপত্র নিয়ে খোরাসান রোড ধরে নিশাপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে খবর পাঠালেন। শাহরোখ ছিলেন তাব্রিজের নিকটেই। এইভাবে প্রথম যুদ্ধাভিযান শেষ হল।

শত্রু-অবস্থান-বৃত্তাংশের একদিক থেকে আর-একদিক পর্যন্ত তৈমুর অভিযান করেছেন। চোদ্দমাসে দুটি বড় যুদ্ধ এবং অনেকগুলো ছোটখাটো হামলা তিনি

চালিয়েছেন এবং তার ফলে তিনি প্রায় এক ডজন সুরক্ষিত শহর দখল করেছেন। লড়াইয়ের কৃতিত্ব হিসেবে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই বায়েজিদের সব মিত্রশক্তিকেও তৈমুর পরাজিত করলেন।

অত্যন্ত দেরি হয়ে যাওয়াতে এই মওসুমেই তুর্কিদের সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব হল না। সেটা পরবর্তী বছর পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হল। যথাসময়ে প্রিন্স মোহাম্মদের তূর্যধ্বনি জানিয়ে দিল যে, তিনি সসৈন্যে কেন্দ্রীয় শিবিরের দিকে এগিয়ে আসছেন। তৈমুর-শিবিরের প্রধানগণ এগিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

সমরখন্দ থেকে আগত সৈন্য ডিভিশনগুলোর জাঁকজমক তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। প্রতিটি ডিভিশনের নিশান ছিল বিভিন্নরঙের—সবুজ, লাল ইত্যাদি নানাবর্ণের। একটা ডিভিশনের সব অশ্বারোহীর পোশাক, ঘোড়ার সাজ, এমনকি ঢাল ও তূণীরগুলো পর্যন্ত ছিল একই রঙের। ভারত থেকে কৃষ্ণসাগর এবং পশ্চিমে ফিলিস্তিন পর্যন্ত তৈমুরের সঙ্গী প্রবীণ যোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা তখনো বেঁচে ছিলেন, তাঁরা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে এই জাঁকজমকের নিন্দা করলেন। কিন্তু মনে-মনে তাঁরা ঈর্ষান্বিত হলেন।

তৈমুর মনোযোগ দিলেন একটি পুরনো খালের মুখ খুলে দেবার জন্যে। এটা গ্রিকরা খনন করেছিল এরাক্সিস নদী থেকে। তিনি আফ্রিকা ও ইউরোপের বাণিজ্যপথগুলো সম্পর্কেও খবরাখবর নিলেন এবং সুলতানিয়ার বিশপ জনের মারফতে ফ্রান্সের ৬ষ্ঠ চার্লসের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন—শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চিঠি* নিয়ে তাঁর কাছে এল জেনোয়ার সুদূরচারী বণিকের দল। উদ্দেশ্য তাদের ছিল ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী বণিকদের আগেই অপরাজেয় তৈমুরের শুভেচ্ছা অর্জন। সঙ্গে তারা এনেছিল কনস্টান্টিনোপলের খ্রিস্টান সম্রাটের নিকট থেকে সাহায্যের এক গোপন আবেদন। সে-খ্রিস্টান সম্রাট ছিলেন তখন বায়েজিদের কৃপাভিখারি।

২৮
সর্বশেষ ক্রুসেড

তারপর কী হল, তা বুঝতে হলে কিছুক্ষণের জন্য ইউরোপের দিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে আমাদের। কনস্টান্টিনোপলের গ্রিক সম্রাটগণ তখন আগেকার রোমান সম্রাটদের

---

* ফ্রান্সের রাজার কাছে লিখিত তৈমুরের চিঠি দুখানায় এমন কথা ছিল যাতে বোঝা যায়, তৈমুর পৃথিবীর রাজ্যগুলো তাদের দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি করার প্রস্তাব করেছিলেন। বিশপ জন অবশ্য তৈমুরকে বুঝিয়েছিলেন যে, তৈমুর যেমন এশিয়ার মালিক, চার্লসও তেমনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তৈমুর শুধু চিঠিতে বলেছিলেন যে, বায়েজিদ যেহেতু ফ্রান্সেরও শত্রু, তাই বায়েজিদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধাভিযানে তিনি চার্লসের নিকট থেকে এইটুকু সাহায্য আশা করেন যে, তাঁদের উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিময় হবে। তিনি আরো বলেছিলেন, এক ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়া বিশপ জন অন্য সব ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

কঙ্কালের চাইতে বেশিকিছু ছিলেন না। দুইপুরুষ ধরে তাঁদের ক্ষমতা ক্রমে এশিয়া মাইনর থেকে উদ্ভূত তুর্কিদের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছিল। তুর্কিরা তখন তাদের বিজয়-শকট বলকান এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলভাগের উপর দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল।

কসোবার রণক্ষেত্রে এই নতুন বিজয়ীশক্তি ওসমানীয় তুর্কিরা দুর্ধর্ষ সার্ভিয়ানদের পরাজিত করে হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করেছিল। তারা ছিল অনমনীয় সুশৃঙ্খল যোদ্ধা—লেলিহান অগ্নিশিখার মতো। আর সম্রাটের প্রতি তাদের প্রত্যেকের দ্বিধাহীন আনুগত্য। তাদের অশ্বারোহীদল, বিশেষ করে সিপাহিরা ছিল সুদক্ষ যোদ্ধা; কিন্তু 'জেনিসারি' বাহিনীকে কেন্দ্র করে তাদের যে পদাতিকদল গড়ে উঠেছিল, তারা ছিল সত্যই তুলনাহীন। ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগের দেশগুলোতে তারা চালু করেছিল অসবর্ণ বিবাহ। গ্রিক ও স্লাভ জাতির খ্রিস্টান ক্রীতদাসদের রক্তের মিশ্রণের ফলে তারা একটা নতুন জাতি হিসেবে গড়ে উঠছিল। এই জাতির দোষগুণ বায়েজিদ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একগুঁয়ে, সাহসী, শক্তিমান এবং নির্মম। সিংহাসনে আরোহণকালে প্রথমেই তিনি তাঁর ভাইকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। নিজের জয়ে ছিলেন তিনি গর্বিত। অহঙ্কার করে তিনি বলতেন, অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে তিনি ফ্রান্সে অভিযান করবেন এবং সেখানকার সেন্ট পিটার গির্জার বেদিতে তিনি তাঁর ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবেন।

নামে না হলেও কনস্টান্টিনোপলের প্রভু আসলে ছিলেন তিনিই। সে-শহরের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর অধিকার। শহরের আদালতে তাঁরই কাজিরা বিচারাসনে আসীন ছিলেন, আর দুটি মসজিদের মিনার থেকে তাঁরই মোয়াজ্জিনগণ আজান দিয়ে তুর্কিদের নামাজে আহ্বান জানাত। কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান গ্রিক-সম্রাট ম্যানুয়েল শহরের দখলিকার হিসেবে তাঁকে কর দিতেন। ভেনিস ও জেনোয়া এই শহরের ভাবী মালিকের সম্মান তাঁকেই দিত। বাগান ও মার্বেলপ্রাসাদসহ কনস্টান্টিনোপল ছিল তুর্কিদের কাছে প্রতিশ্রুত শহর—ইস্তাম্বুল।

মক্কা থেকে ইসলামের অধিকার এই শহরের চারদিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল—যদিও শহরটি তখনো পর্যন্ত উঁচু দেয়াল ও ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধজাহাজ দ্বারা ছিল সুরক্ষিত। বায়েজিদ এগুলো দখল করার উদ্দেশ্যে নগর অবরোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন,—এমন সময়ে ক্রুসেডের আহ্বান সারা ইউরোপে ধ্বনিত হল। তুর্কিদের বিরুদ্ধেই ছিল এ-ক্রুসেড। বায়েজিদের আগমন-আশঙ্কায় ভীত হাঙ্গেরীয় সিগিসমন্ড ছিলেন এর উদ্যোক্তা, আর বার্গেন্ডির ফিলিপ ছিলেন ব্যক্তিগত কারণে এর প্রবক্তা।

তখন কিছুকাল বিভিন্ন রাজ্যে আবহাওয়া শান্তই ছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় মতের কচকচি, শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, পার্লামেন্টারি মতবিরোধ, সম্পত্তির অধিকার নিয়ে জনসাধারণের সংগ্রাম—প্লেগের মহামারিতে এসব তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ব্যারনরা তখন গির্জার আহ্বানে সাড়া দিতে শুরু করেছেন। মাঝে মাঝে ফ্রান্সের উন্মাদ রাজা হাঙ্গেরির বিজ্ঞ কিন্তু সন্দিগ্ধচেতা রাজাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। ইংলন্ড ও নেদারল্যান্ড থেকে একদল স্বেচ্ছাসেবক এল। শেষদিকের ক্রুসেড-যোদ্ধাদের মধ্যে কাদের নেওয়া হবে, সে যেন তখন সমগ্র ইউরোপে একটা বংশগত ব্যাপার হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। তা কতকটা সীমাবদ্ধ হয়েছিল সেভয়ের বাস্টার্ড, প্রুশীয় নিটদের নায়ক, হোহেনজোলার্নের ফ্রেডারিক, রোডেসের গ্র্যান্ড মাস্টার, সেন্টজনের নিট, ইলেক্টর, বার্গেড, প্যালেটাইন—এঁদের মধ্যে। ফ্রান্স থেকেই এল সবচাইতে শক্তিশালী দল। এঁদের মধ্যে ছিলেন বার ও আর্টোয়েজের কুমারগণ, বার্গেন্ডি ও সেন্ট পল। আর নেভার্সের কাউন্ট জন ভেলোয়েসের দলে ছিলেন ফ্রান্সের মার্শেল, অ্যাডমিরাল, কনেস্টবল প্রভৃতি সকলেই।* সেনাপতি ও সশস্ত্র সেনানীসহ প্রায় কুড়ি হাজার অশ্বারোহী নিট পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে সিগিসমন্ডের দলে যোগ দিলেন। সব মিলে হল প্রায় একলাখ। তাদের জন্য, মনে হয়, মদ-মেয়েলোকের সরবরাহ ছিল অব্যাহত। জনতা এত বাড়ল যে, অশ্বারোহী নিটগণ সাহঙ্কারে ঘোষণা করলেন, যদি আসমানও ভেঙে পড়ে, তাও তাঁরা তাঁদের বর্শার আগায় ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন।

ফরাসি, ইংরেজ ও জার্মান নিটদের মনে হয়, ব্যাপারটা সম্পর্কে ছিল একটা অস্পষ্ট ধারণা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তুর্কির সুলতান (তাঁর নামটাও তাঁরা জানতেন না) দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকেই—মিশর, ইরান, মিডিয়া প্রভৃতি সব দেশের মুসলমানদিগকে তাঁদের বিরুদ্ধে জমায়েত করছেন, এবং তিনি কনস্টানটিনোপলের ও-ধারে ওত পেতে রয়েছেন। নিটদের একমাত্র ভাবনা ছিল, যথাস্থানে তাদের পৌঁছবার আগেই-না আবার তুর্কির সুলতান পালিয়ে যান! এরপর তাঁরা জেরুজালেম পর্যন্ত অভিযান করবেন—তাও ঠিক হয়ে গেল।

এঁদের চাইতে চালাক আদমি ছিলেন হাঙ্গেরির সিগিসমন্ড। তিনি তাঁদের আশ্বাস দিলেন—'যুদ্ধ না করে তাঁর রেহাই নেই!' আর সত্যই যুদ্ধ না করে তিনি যাননি।

দানিউবের দক্ষিণদিকে মহাআরামে তাঁরা এগিয়ে চললেন। ভেনিসের নৌবাহিনী নদীপথে এসে তাঁদের সাথে যোগ দিল। সেখানকার তুর্কিঘাঁটির পতন হল। ধর্মযোদ্ধারা বেপরোয়াভাবে হত্যাকাণ্ড চালালেন। একথা তাঁরা ভেবে দেখবারও দরকার মনে করলেন না যে, নিহত লোকগুলো ছিল সার্ভিয়ান খ্রিস্টান। তাঁরা এরপর নিকোপোলিস অবরোধের জন্য একটা সুন্দর স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। এখানে এসে তাঁরা শুনলেন, বায়েজিদ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন।

প্রথমে কথাটা তাঁরা বিশ্বাসই করলেন না। কিন্তু সিগিসমন্ড তাঁদের বিশ্বাস করালেন যে, কথাটা সত্য। যুদ্ধরেখা নির্ধারণ করা হল। সিগিসমন্ড তুর্কিদের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন। তিনি অশ্বারোহী নিটগণকে রাখতে চাইলেন পশ্চাদ্‌ভাগরক্ষী দল হিসেবে এবং তাঁর দুর্ধর্ষ হাঙ্গেরীয় পদাতিক-বাহিনী ওয়ালাচিয়ান ও ক্রোটদের দিতে চাইলেন সমুখভাগে তুর্কি-আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলাবার জন্যে। সামন্ত বীরের দল এ-প্রস্তাবে চটে গেলেন। কলহ ভীষণ হয়ে উঠল। এমনি সময়ে বায়েজিদের হামলাকারীদের আবির্ভাব হল। ফরাসি ও

* নেভার্সের কাউন্ট ছিলেন বার্গেন্ডির ফিলিপের পুত্র এবং ফ্রান্সের রাজার পৌত্র। যদিও তাঁর সামরিকজ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না এবং যুদ্ধের সেনাপত্যের কলাকৌশল কিছুই তিনি জানতেন না, তবু শুধু বংশগৌরবের জন্যই যুদ্ধের পরিচালনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

জার্মানদের ধারণা হল যে, সিগিসমন্ড ফাঁকি দিয়ে তাদের বসিয়ে রেখে নিজে যুদ্ধের সবটুকু গৌরব পেতে চান। অবশেষে আর্টোয়েজের ফিলিপ ও ফ্রান্সের হাই কনেস্টবল হেঁকে উঠলেন, 'হাঙ্গেরির রাজা আজকের সবটুকু যুদ্ধগৌরব নিজের জন্য রিজার্ভ করতে চান। তাঁর সাথে যিনিই একমত হোন, আমি কিন্তু হব না। আমাদের রয়েছে অগ্রগামী দল—আজকের যুদ্ধ আমাদের।' তিনি তাঁর ঝাণ্ডা তুলে ধরার আদেশ দিয়ে বললেন, 'গড এবং সেন্ট জর্জের নাম নিয়ে অগ্রসর হও।'

বাকি নিটরাও তাঁর অনুসরণ করলেন নিজেদের দলবল নিয়ে। কিন্তু তার আগে তুর্কি ও সার্ভিয়ান বন্দিদের হত্যা করা হল। বর্শার অগ্রভাগ সামনের দিকে প্রসারিত করে, ঢাল ঠিক রেখে, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে যুদ্ধক্ষেত্র কাঁপিয়ে ইউরোপীয় বীরের দল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুদলের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন এবং সামনে যেসব পদাতিক তীরন্দাজদের পেলেন, তাদের কেটে ফেলে 'সিপাহি'দের মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হলেন। তাদের তীব্রগতির মুখে তুর্কি 'সিপাহি' ও অশ্বারোহীদলের ব্যূহ ভেঙে গেল। সত্যই তাদের হামলায় বীরত্বের পরিচয় ছিল। কিন্তু এই বীরত্বই তাদের পরাজয়েরও কারণ ছিল।

এই তিনদল সৈন্য ছিল বায়েজিদের অগ্রবর্তী বাহিনী মাত্র। তিনদলের শত্রুব্যূহ ভেদ করে অশ্বারোহী নিটগণ এবার তুর্কিবাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মোকাবিলা করলেন। তারা সংখ্যায় ছিল ষাট হাজার। তাদের মধ্যে ছিল শাদাপাগড়িওয়ালা জেনিসারিদল, আর ছিল সশস্ত্র অশ্বারোহী-বাহিনী। অর্ধবৃত্তাকারে তাদের ব্যূহ রচিত হয়েছিল। পালটা আক্রমণ চালিয়ে বেহুদা লোকক্ষয় না করে, তুর্কিরা খ্রিস্টান নিটদের ঘোড়াগুলোর উপর তীরবৃষ্টি করতে লাগল। ভারী অস্ত্রের ভারে বিব্রত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে কিছুসংখ্যক ক্রুসেড-যোদ্ধা সত্যই বীরত্বের পরিচয় দিল। বাকি সকলে তাদের ঘোড়া নিহত হওয়ার আগেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করল।

কিন্তু তুর্কিফৌজ এগিয়ে এসে যখন তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং মিত্র সৈন্যদল দূরে পড়ল, অধিকাংশ নিটই তখন অস্ত্রত্যাগ করলেন।

সিগিসমন্ড ইতোমধ্যে তাঁর সৈন্যদলটি ঠিক রাখতে পেরেছিলেন। তিনি নিটদের সাহায্যার্থে তাঁর দল নিয়ে কিছুদূর এগিয়েও গিয়েছিলেন বটে, তবে সাহায্য তেমন কিছু করতে পারেননি। কিন্তু সেটা ভয়ে পিছিয়ে থাকার ফলে, না, নিটদের অবিবেচনা-প্রসূত হামলায় সাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে—তা একটা প্রশ্ন হিসেবেই রয়ে গেছে। পরে ইউরোপে এ নিয়ে তীব্র আলোচনাও হয়েছিল।

তবে এটা ঠিক যে, নিটদের পলায়নের ফলেই ক্রুসেড-যোদ্ধাদের জয়ের আশা বিলুপ্ত হল। পলাতক নিটদের অনুসরণে তুর্কিফৌজদের আসতে দেখে পদাতিকদলের সাহসও উবে গেল। ওয়ালচিয়ানরা নিজেদের জীবনরক্ষার জন্য পিছিয়ে গেল। সিগিসমন্ডের হাঙ্গেরীয়গণ এবং ইলেট্রেরের ব্যাভারিদল রুখে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার চেষ্টা করল বটে কিন্তু সিগিসমন্ড ও তাঁর দলবলকে কিছু পরেই ভেনিসীয় নৌবাহিনীর কাছে আশ্রয়লাভের আশায় নদীর দিকে পালিয়ে যেতে দেখা গেল।

বায়েজিদ বন্দি নিটদের ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। বিশেষ করে এরাই তুর্কিবন্দিদের পাইকারিভাবে হত্যা করেছিল এবং তাদের ক্ষতিও করেছিল অনেক। ফ্রয়েশার্ট নামীয় তাদের ইতিহাসকার এ-সম্পর্কে যে করুণ বর্ণনা দিয়েছেন, তা এইরূপ : 'তারপর তাদের অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় বায়েজিদের সামনে আনা হল। তিনি একনজর তাদের দেখে পিছনে ফিরে এদের হত্যা করার ইঙ্গিত করলেন। তখন তাদের সারাসিন সৈন্যদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তারা উন্মুক্ত তরবারিহস্তে তৈরিই ছিল। তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে কেটে কুচি কুচি করা হল।'

এইভাবে তাদের কয়েকশত লোক শেষ করা হল। চব্বিশজন লর্ডকে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য হত্যা করা হল না। বায়েজিদের পারিষদরাই এ-ব্যাপারে তাঁকে রাজি করাল। এই হতভাগ্যদের মধ্যে ছিলেন নেভার্সের কাউন্ট এবং ফ্রান্সের বুসিকট। ফ্রান্সের রাজার পৌত্র ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য দুই লাখ স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ দাবি করা হল। বায়েজিদের এই দাবি মিটাতে গিয়ে ইউরোপের অর্থভাণ্ডারে ভীষণ চাপ পড়ল। এই মুক্তিপণ দেওয়া হলে অবশিষ্ট বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হল। ফ্রয়েশার্টের কথা থেকে জানা যায়, মুক্তি দেওয়ার সময়ে বায়েজিদ বন্দিদের আরো বেশিসংখ্যক সৈন্য যোগাড় করে তাঁর মোকাবিলা করতে আদেশ দিলেন। বললেন, 'আমি যুদ্ধ চাই এবং খ্রিস্টান রাজ্যগুলো দখল করার জন্যও আমি প্রস্তুত আছি।' নেভার্সের লর্ড এ-উক্তির মর্মার্থ ভালো করেই বুঝেছিলেন—বুঝেছিল তার সঙ্গীরাও। যতদিন তাঁরা বেঁচে ছিলেন, ততদিন একথা তাঁদের মনে ছিল।

কিন্তু একমাত্র সাহসী বুসিকটই তুর্কিদের সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে তিনি ফ্রান্সের মার্শেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এইরূপ অগৌরবের মধ্যেই শেষ ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল। ইউরোপীয় রাজ্যগুলোতে যেমন, কনস্টানটিনোপলেও তেমনি একটা দুঃখ ও হতাশার কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

নিকোপোলিসের যুদ্ধ হয় ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে। ইতোমধ্যে বায়েজিদ কনস্টানটিনোপল অবরোধ করেন এবং গ্রিস তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঁচশত নিট ও কিছুসংখ্যক নৌযোদ্ধার আগমনে কনস্টানটিনোপলের খ্রিস্টানদের মধ্যে সাময়িকভাবে একটা আশার সঞ্চার হল। স্মরণযোগ্য যে, তুর্কিসাম্রাজ্যের এশিয়াস্থ রাজ্যগুলো ও ইউরোপীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে একটা সাগরের ব্যবধান। সে-সময়ে ভেনিস ও জেনোয়ার নৌবহর তুর্কিদের উপর আঘাত হেনে সম্ভবত কনস্টানটিনোপলকে রক্ষা করতে পারত। দরকার ছিল শুধু দার্দানেলিস প্রণালী দখল করার। কিন্তু তারা তা করল না।

ভেনিস ও জেনোয়া এশিয়ার বাণিজ্য দখল করার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করছিল এবং একে অন্যের শক্তিকে খর্ব করতে চেষ্টা করছিল। কূটনীতিবিশারদ বায়েজিদ উভয়ের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিলেন এবং উভয়কেই এশিয়ার বাণিজ্যে দখল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। এ-কারণে সুলতানকে উপহার দিয়ে খুশি করার জন্য উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। কনস্টানটিনোপলকে রক্ষা করার জন্য পোপের আবেদন এই কারণে কারুরই মনোযোগ আকর্ষণ করল না। ইউরোপের রাজন্যবর্গ আবার

গৃহযুদ্ধে মেতে উঠলেন।

এবার আমরা ইতিহাসের একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর দৃশ্যের সম্মুখীন হচ্ছি। বিশ্বের এককালের শ্রেষ্ঠ নগরী সিজারদের প্রিয় রাজধানী কনস্টানটিনোপলের দুর্দশা তখন এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, তাকে রক্ষা করতে এসে গ্রিক সামন্তরাজাদের ভাড়াটে সৈন্য ও নিটগণ এমন খাদ্যাভাবের ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে গেল যে, তুর্কি জাহাজগুলো দখল করে নিজেদের খাদ্যসঙ্কট তাদের দূর করতে হল। শুধু তা-ই নয়, বেতন বাবদেও তারা কিছু পেল না। সম্রাট ম্যানুয়েলকে সৈন্য ও অর্থসংগ্রহের জন্য ইউরোপ সফরে বের হতে হল। কিন্তু তাঁর এই সফরকারী দলটির পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল এমনই নিম্নস্তরের যে, একজন ইতালীয় সামন্তরাজা দয়াপরশ হয়ে তাদের পোশাক দিয়ে সাহায্য করলেন।

সিজারের এই বংশধর এক রাজদরবার থেকে অন্য রাজদরবারে যেতে লাগলেন। প্রচুর সহানুভূতি ও সংবর্ধনা তিনি পেলেন বটে, কিন্তু সাহায্য পেলেন না মোটেই। ধর্মযুদ্ধের উৎসাহ নিটদের দুর্দশার কথা শুনেই সকলের উবে গিয়েছিল। ইউরোপীয় রাজারা তখন পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ঝালিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই পোপের আবেদন ও ম্যানুয়েলের সাহায্যপ্রার্থনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

ফলে ম্যানুয়েলের হৃদ্‌রোগ দেখা দিল। কনস্টানটিনোপলের রক্ষিবাহিনী খাদ্যাভাবে অস্থির হয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে তুর্কি-শিবিরে গিয়ে আহার্য প্রার্থনা করল। এমনকি, বুসিকট পর্যন্ত নগর ত্যাগ করে চলে গেলেন। কনস্টানটিনোপলে অবস্থিত সম্রাটের ভাইপো আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে বায়েজিদের সাথে আলোচনা চালালেন। দ্বিতীয়বারের জন্য দুর্ভাগা অবরুদ্ধ নগরবাসী একটুখানি বিশ্রামের অবকাশ পেল।

এমনি সময়ে পূর্বদিক থেকে আকস্মিকভাবে হল তাতারদের আগমন। সিবাস অধিকার করে তারা এগিয়ে আসতে লাগল। অবরোধ মুলতুবি রেখে বায়েজিদ এশিয়ার দিকে এগিয়ে চললেন। ইউরোপে অবস্থিত প্রতিটি তুর্কি-সৈন্যকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানানো হল। প্রণালী পার হয়ে তারা এশিয়ায় পদার্পণ করল। বায়েজিদ যদি তৈমুরকে হারাতে পারেন, তবে ম্যানুয়েল কনস্টানটিনোপল ছেড়ে দেবেন, এই শর্তে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল।

২৯
তৈমুর-বায়েজিদ মোকাবিলা

১৪০২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে পূর্ব-ইউরোপজয়ী বায়েজিদ এশিয়াবিজয়ী তৈমুরের সাথে মোকাবিলা করার জন্য সৈন্যসমাবেশ করলেন। মর্মরা সাগরের নিকটে, ওসমানীয় তুর্কিদের রাজধানী ব্রুসায় সমাবেশ করা হল কসোবা ও নিকোপোলিসের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীকে। তাদের সাথে যোগ দিল আনাতোলিয়ার বাহিনী—এদের মধ্যে ছিল

কুড়ি হাজার সার্ভিয়ান ও বলকান অশ্বারোহীদল। ইতিহাসে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা এমনভাবে লৌহবর্মাবৃত ছিল যে, তাদের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। নতুন প্রভু তুর্কি সুলতানের সাহায্যে এল গ্রিক এবং ওয়ালাচিয়ান পদাতিক দল। সব মিলে বায়েজিদের যোদ্ধৃবাহিনী সংখ্যায় দাঁড়াল একলাখ কুড়ি হাজার থেকে দুলাখ পঞ্চাশ হাজারে।

এরা জীবনে কেবল জয়ই দেখে এসেছে। সিপাহি আর জেনিসারি দল থাকত সবসময়েই সশস্ত্র। সৈন্যদের মধ্যে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা এবং বায়েজিদের প্রতি ক্রীতদাসের আনুগত্য। বায়েজিদ ছিলেন জয় সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে বড় বড় ভোজের আয়োজন করে শত্রুর প্রতীক্ষা করছিলেন।

তৈমুরের অগ্রগতির সংবাদে তুর্কিরা খুশিই হয়েছিল। পদাতিক দলই ছিল তাদের শক্তির উৎস। আত্মরক্ষার কাজে তুর্কি পদাতিক-বাহিনী ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। এশিয়া মাইনরের বেশিরভাগ স্থানই ছিল বিধ্বস্ত—সেখানে ছিল কাঠের ঘরবাড়ি। তুর্কিরা এই শ্রেণীর বাড়িঘরই পছন্দ করত। মাত্র একটি রাস্তাই সিবাস থেকে গিয়েছে এবং এই রাস্তায়ই তৈমুরের সাক্ষাৎ মিলবে বলে বায়েজিদ আশা করছিলেন।

বায়েজিদ ধীরে ধীরে তাঁর বিরাট বাহিনী আঙ্গোরা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সেখানেই প্রধান শিবির স্থাপন করে বায়েজিদ চললেন আরো এগিয়ে। হালিজ নদী পেরিয়ে ওপারে তিনি পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করলেন। সীমান্তঘাঁটি থেকে তাঁর কাছে খবর এল যে, তাতাররা এখনো ষাট মাইল দূরবর্তী সিবাসেই রয়েছে। বায়েজিদ থেমে গেলেন এবং ভালো জায়গা দেখে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তিনদিন ধরে তিনি সেখানে অপেক্ষা করলেন। ক্রমে এক সপ্তাহ কেটে গেল। তাঁর স্কাউটদল সিবাস থেকে যে-সংবাদ নিয়ে এল, তা ছিল আশঙ্কাজনক। কেবল নগররক্ষী তাতারসৈন্যরাই মাত্র সেখানে ছিল। বিরাট বাহিনীসহ তৈমুর বহু আগেই তুর্কিদের মোকাবিলা করতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন।

তৈমুর কিন্তু সিবাস ও তুর্কি-শিবিরের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে ছিলেন না। অশ্বারোহী স্কাউটরা সব পাহাড় খুঁজে দেখল—কিন্তু তাতারদের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। হাতিগুলোসহ তারা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

তুর্কিদের কাছে ব্যাপারটা নতুন। তারা হালিজ নদীর বিরাট বাঁকের মধ্যস্থলে বিধ্বস্ত অঞ্চলে যুদ্ধব্যূহ রচনা করে অবস্থান করছিল। সিবাসের ওপারে ছিল এই নদীর উৎপত্তিস্থল; সেখান থেকে দক্ষিণদিকে বহুদূর গিয়ে আবার উত্তরদিকে বাঁক নিয়ে এটা আঙ্গোরার দৃষ্টিসীমার ভিতর দিয়ে সোজা গিয়ে পড়েছে কৃষ্ণসাগরে। বায়েজিদ স্বস্থানেই অপেক্ষা করছিলেন। তাতারদের সম্পর্কে সঠিক খবর না পেয়ে তিনি নড়বেন না স্থির করেছিলেন।

অষ্টম দিবসের সকালে তিনি সে-খবর পেলেন। তৈমুরের একজন আমিরের পরিচালনায় একদল স্কাউট বহুদূরবর্তী তাঁর এক ঘাঁটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বায়েজিদের কিছু লোককে বন্দি করে চলে যায়। তুর্কিরা এখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, তৈমুর রয়েছেন তাদের দক্ষিণে। ফলে তারাও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল।

দুদিনে তারা নদীর কাছে পৌঁছল বটে, কিন্তু তাতারদের দেখা গেল না। বায়েজিদ তাঁর যোগ্য ছেলে সুলায়মানের অধিনায়কতায় নিজের একদল অশ্বারোহীকে নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিলেন। সংবাদ নিয়ে আসতে সুলায়মানের দেরি হল না। তৈমুর তখন তুর্কিদের সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গিয়ে দ্রুতবেগে আঙ্গোরার দিকে যাচ্ছিলেন।

এ-সংবাদে সুলতানের নিশ্চিন্ততা একমুহূর্তে কেটে গেল। নদী পার হয়ে তিনি শত্রুর অনুসরণে নিজ ঘাঁটির দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে চললেন।

তৈমুর যা করেছিলেন, তা খুবই সরল। সিবাসের পশ্চিমদিককার পার্বত্য এলাকা পর্যবেক্ষণ করে তিনি বুঝতে পারেন যে, অশ্বারোহী-বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়া সেখানে অসুবিধাজনক। তাই তিনি দক্ষিণদিকে গতি পরিবর্তন করে হালিজ উপত্যকার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললেন—হালিজ নদীর একপাশে রইল তুর্কিরা আর অন্যপাশে তৈমুরবাহিনী অর্থাৎ নদীর বাঁকের বহির্ভাগে রইল তৈমুরের দল, আর কেন্দ্রে বায়েজিদের বাহিনী।

সে-সময়ে শস্যক্ষেতগুলো ছিল পাকা শস্যে পূর্ণ আর মাঠে ঘোড়ার খাদ্যোপযোগী ঘাস ছিল প্রচুর। তৈমুর একদল সৈন্যকে একজন আমিরের অধিনায়কত্বে আলাদা করে তুর্কিদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য পাঠালেন। এরপর সুলায়মানের সৈন্যদলের সাথে এক খণ্ডযুদ্ধের পর তিনি কুচহিসার নামক এক গ্রামে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি পৌত্রদের এবং অফিসারদের এরপর কী করতে হবে, সে-সম্পর্কে উপদেশ দিতে লাগলেন।

তিনি তাদের বললেন, 'এখন আমাদের সামনে রয়েছে দুটো পন্থা। এক—আমরা এখানে অপেক্ষা করে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে তুর্কিদের সাথে মোকাবিলার জন্য তৈরি হতে পারি। দ্বিতীয়ত—আমরা অভিযান চালিয়ে দেশের ভিতরে ঢুকে ইতস্তত লুটপাট করে শত্রুপক্ষকে আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করতে পারি। শত্রুবাহিনীর অধিকাংশই হচ্ছে পদাতিক। অনবরত আমাদের অনুসরণের ফলে তারা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'হাঁ, এ-ই আমাদের করতে হবে।'

এই গ্রাম থেকেই তাতার-অভিযানের নিয়ম-তালিকা বদলে গেল। গ্রামে একদল রক্ষিবাহিনী রেখে দুইজন আমিরের অধিনায়কতায় এক অশ্বারোহী ডিভিশনকে তিনি এগিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। তাদের সঙ্গে থাকল কিছুসংখ্যক পদাতিক। তারা দিনের শেষে শিবিরস্থাপনের স্থান-নির্বাচন ও কূপখননের কাজ করার জন্য প্রেরিত হল। আর কয়েকজন অগ্রগামী অশ্বারোহী মূল-বাহিনীর খাদ্যসংগ্রহে নিয়োজিত হল।

নদী পিছনে রেখে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তাতারবাহিনী মুক্ত বিচরণভূমি এবং প্রচুর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা দেখে খুশি হল। তা ছাড়া তারা জানতে পারল যে, বায়েজিদের মূল শিবির হাঙ্গেরির নিকটে অবস্থিত এবং সেটা তাদের রাস্তায়ই পড়বে। তৈমুর তাঁর অভিযানের গতি বাড়িয়ে দিলেন—তিন দিনে একশত মাইল অতিক্রম করে আঙ্গোরার সন্নিহিত হলেন।

তৈমুর অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হলেন। শেষদিকে বহুদিন তিনি অস্ত্রসজ্জা গ্রহণ

করেননি। এরপর অশ্বারোহণে তিনি নগরের চারদিকে ঘুরে বেড়ালেন। তুর্কিরা ভিতরে নগররক্ষায় প্রস্তুত হয়েই ছিল। তৈমুর নগরের উপর হামলার আদেশ দিলেন। নিজে গেলেন বায়েজিদের কেন্দ্রীয় শিবির পর্যবেক্ষণ করতে। কিন্তু তখন সে-শিবির ছিল পরিত্যক্ত—জনমানবহীন।

আঙ্গোরা ছিল এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যভাগে অবস্থিত। তৈমুর দেখলেন, বায়েজিদ যেভাবে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তা খুবই কৌশলপূর্ণ। তিনি তাই তুর্কিদের তাঁবুগুলোতে আস্তানা গাড়তেই তাতারিসৈন্যদের নির্দেশ দিলেন। নদীর যে-স্রোতধারা আঙ্গোরা নগরীতে প্রবেশ করেছিল, তাঁর আদেশে সে-স্রোতের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার গতি পরিবর্তন করা হল।

শহরের দিকে অগ্রসরমাণ তুর্কিরা এসে যে-ঝরনাধারাটি ব্যবহার করতে পারত, তৈমুরের আদেশে সেটিকেও ধ্বংস করা হল এবং তার পানিকে করা হল অপেয়। তাঁর লোকেরা আঙ্গোরার দেয়াল ভাঙতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময়ে তাঁর স্কাউটগণ খবর নিয়ে এল যে, বায়েজিদ এগিয়ে আসছেন এবং তখন তাঁর বাহিনী মাত্র বারো মাইল দূরে রয়েছে।

তৈমুর নগর-অধিকারের চেষ্টা ত্যাগ করলেন—এমনকি যারা দুর্গের বুরুজ-দখলের জন্য দেয়ালের উপরে উঠেছিল, তাদেরও তিনি নেমে আসতে আদেশ দিলেন। সে-রাত্রে তিনি শিবিরের চারদিকে পরিখা খনন করালেন। সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হল এবং অশ্বারোহীদল প্রান্তরে টহল দিল। কিন্তু তুর্কিবাহিনী রাত্রি ভোর হওয়ার আগে সেখানে পৌঁছতে পারল না।

দীর্ঘ সাতদিন ধরে দ্রুতবেগে তাদের আসতে হয়েছে—একরূপ খাদ্য ও পানিয়বিহীন অবস্থায়। পথে পড়েছে তাদের তাতারদের কর্তৃক ফসলকাটা মাঠ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মাঠের গরমে তারা হয়ে পড়েছিল কাহিল। এসে দেখতে পেল, তাতাররা তাদেরই শিবিরে তাদেরই সংগৃহীত প্রচুর খাদ্যসম্ভার দখল করে আসন গেড়ে বসে আছে। তা ছাড়া, সবচাইতে আশঙ্কার ব্যাপার হল এই যে, তাতারদের দখল-করা শিবির ছাড়া পানির ব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই। এখন তৈমুরকে আক্রমণ করা ছাড়া তাদের সম্মুখে আর কোনো রাস্তাই খোলা নেই।

কাজেই বায়েজিদকে বাধ্য হয়ে তা-ই করতে হল, যা তিনি মোটেই করতে চাননি—অর্থাৎ তাঁর রদ্দি অশ্বারোহী-বাহিনীকে মধ্য-এশিয়ার তেজি অশ্বারোহীদের মোকাবিলা করতে পাঠাতে হল। তাঁর লোকেরা আগেই পিপাসায় হয়ে পড়েছিল দুর্বল। তিনি চালে ভুল করে ফেলেছিলেন এবং নাকে দড়ি দিয়ে যেন তাঁকে আঙ্গোরায় আনা হয়েছিল। ফলে যুদ্ধে অস্ত্র-সঞ্চালন করার আগেই তিনি হলেন পরাজিত।

সকাল দশটার প্রখর রোদের তাতে তুর্কিবাহিনী দুর্জয় সাহস নিয়েই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু-দলেরই সমুখভাগ মাঠের পনেরো মাইল জায়গা জুড়ে ছিল বিস্তৃত। তাতারবাহিনীর এক বাহু ছিল একটি ছোট নদীর ওপরে, আর অন্য বাহু ছিল এক সুরক্ষিত উঁচুস্থানে অদৃশ্য হয়ে। ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, তুর্কিরা এল ভীমরবে ড্রাম বাজিয়ে আর করতালের কোলাহল ছড়িয়ে, কিন্তু তাতারবাহিনী

করছিল নীরবে প্রতীক্ষা।

শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তৈমুর অশ্বারোহণ করলেন না। তাঁর সেনাপতিদের উপরই রইল যুদ্ধ-পরিচালনার ভার। তাঁর সঙ্গে এক গিরিপথে রইল মাত্র চল্লিশজন অশ্বারোহী। পদাতিকদল ছিল বিশাল অশ্বারোহী-বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে। তাঁর পৌত্র শাহজাদা মোহাম্মদ বিশাল বাহিনীর মধ্যভাগ পরিচালনা করছিলেন। তাতে ছিল সমরখন্দের এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের কর্নেলসহ আশিটি সৈন্যদল। এখানেও ছিল চিত্রবিচিত্র চামড়ার সাজে সজ্জিত হাতির দল—যতটা যুদ্ধের বাস্তব প্রয়োজনে, তার চাইতে বেশি নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

তাতারদের থেকে দূর ডানপাশে বায়েজিদের পুত্র সুলায়মান ছিলেন তুর্কি অশ্বারোহী-বাহিনীর অধিনায়ক—তিনি পরিচালনা করছিলেন এশিয়া মাইনরের অশ্বারোহীদলকে। তারা সম্মুখীন হল তাতারদের তীরবৃষ্টি ও তৈলসিক্ত অগ্নি-গোলকের। ধূলি ও ধোঁয়ার যবনিকার অন্তরালে দলে-দলে তুর্কি অশ্বারোহীরা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

তুর্কিবাহিনীর এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তাতারদের দক্ষিণবাহু ভীষণবেগে আক্রমণ চালাল। তৈমুরের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি নুরুদ্দিন মূলবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

প্রথমদিকে তুর্কি-অগ্রগতি প্রতিহত হল এবং তাতারবাহিনীই হামলা চালিয়ে চলল। নুরুদ্দিন সুলায়মানের সৈন্যব্যূহ এমনভাবে বিধ্বস্ত করলেন যে, কয়েকটি তুর্কি ডিভিশন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। এশিয়া মাইনরের একদল তাতারিসৈন্যকে বায়েজিদ নিজদলে গ্রহণ করেছিলেন। এরা যখন দেখল যে, তাদের কর্তারা রয়েছে তৈমুরের সাথে, তখন এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে তারা তুর্কিপক্ষ থেকে খসে পড়ল।

দক্ষিণদিকটা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হলে, তাতার অশ্বারোহী-বাহিনীর বামপার্শ্ব তিনভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালাতে এগিয়ে গেল। তাদের আক্রমণের মুখে তুর্কি অশ্বারোহী-বাহিনী একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা এগিয়ে চলতে চলতে তৈমুরের দৃষ্টিসীমার একেবারে বাইরে চলে গেল। ঠিক সেই সময়ে শাহজাদা মোহাম্মদ ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে দাদার কাছে চলে এলেন। নিচে নেমে নতজানু হয়ে তিনি মধ্যভাগের বাহিনী নিয়ে বায়েজিদের পদাতিক-বাহিনীর উপর আক্রমণ চালানোর জন্য অনুমতি চাইলেন। তৈমুর এ-অনুমতি দিলেন না। বরং তিনি শাহজাদা মোহাম্মদকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া বামবাহু সৈন্যদের সাহায্যকল্পে তাতারদের মধ্যেকার বাছাই-করা সৈন্যদের সমরখন্দের একদল এবং বাহাদুরদের এক ডিভিশন নিয়ে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন।

দিগ্বিজয়ী তৈমুরের প্রিয় পৌত্র এই আদেশ পেয়ে তাঁর রক্তপতাকা উত্তোলন করলেন এবং তৈমুরবাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়ে ঘোড়া ছোটালেন। তাঁদের আকস্মিক তীব্র আক্রমণে বর্মাবৃত সার্ভিয়ান অশ্বারোহীদল আত্মরক্ষা করতে গিয়ে

একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল, আর ইউরোপীয় পদাতিক-বাহিনী পালিয়ে আশ্রয় নিল পাহাড়ে। বলকান দলপতিদেরও হল পতন। কিন্তু সাহসী শাহজাদা মোহাম্মদ হলেন ভীষণভাবে আহত। বায়েজিদবাহিনীর দক্ষিণবাহু একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। তাঁর বিশাল পদাতিক-বাহিনী তখনো অক্ষত অবস্থায়ই ছিল বটে, কিন্তু চারদিকে পরিখা না-থাকায় তাদের আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই অবশিষ্ট ছিল না। তাতার ঘোড়সওয়ারদল চারদিক থেকে তাদের বেষ্টন করে ফেলল। স্বয়ং তৈমুর মধ্যভাগের পরিচালন-ভার গ্রহণ করে এগিয়ে গেলেন।

দুর্ধর্ষ ওসমানীয় পদাতিক-বাহিনী—জেনিসারিদল—শত্রুপক্ষের উপর একটি আঘাতও হানতে পারল না। এশিয়ার তুখোড় দাবা খেলোয়াড়ের কাছে তাদের সম্রাট চালে হেরে যাওয়ায় তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিল—যুদ্ধ না-করেই তারা হেরে গিয়েছিল। পশ্চাদ্‌রক্ষীদলও পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ তখনো পালাবার ব্যবস্থা খোলাই ছিল। অবিরাম হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে বাকি সৈন্যদল যেখানে-সেখানে একটুখানি দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তাদের ভেতর দিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হস্তীবাহিনী চালিয়ে দেয়া হল। হাতিগুলোর হাওদা থেকে নিচে অনবরত অগ্নিবৃষ্টি হতে লাগল। ধূলিসমাকীর্ণ রৌদ্রতপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রান্তক্লান্ত তুর্কিরা মরতে লাগল। যারা পালিয়েছিল, তারাও শক্তিক্ষয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে মারা গেল।

হাজারখানেক জেনিসারিদের নিয়ে বায়েজিদ একটা পাহাড় থেকে তাতার অশ্বারোহীদের বিতাড়িত করলেন। সেখানে সারা বিকেল কুঠারহাতে অনুচরদের নিয়ে তিনি প্রাণপণে লড়াই চালালেন। পরবর্তীকালে ওয়াটার্লু যুদ্ধক্ষেত্রে নোপোলিয়ানের পরাজিত সৈন্যদল বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নপর হলে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠরক্ষীদল যেমনভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মরেছিল, সুলতানের এই প্রাসাদরক্ষীদলও তেমনিভাবে অস্ত্রহাতে মৃত্যুবরণ করল।

বিকেলের শেষদিকে অবশিষ্ট অশ্বারোহীদের নিয়ে বায়েজিদ অশ্বারোহণে তাতারব্যূহ ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতাররা তাঁদের পিছু-ধাওয়া করে তাঁর সঙ্গী সৈন্যদের গুলি করে মেরে ফেলল এবং তাঁর নিজের ঘোড়াও তীরবিদ্ধ হয়ে হল ভূলুণ্ঠিত। এরপর ঠিক সূর্যাস্তের সময়ে তাঁকে বেঁধে তৈমুরের শামিয়ানায় নিয়ে যাওয়া হল।

শোনা যায়, তৈমুর তখন শাহরোখের সাথে দাবা খেলছিলেন। এমন বিপদেও শ্মশ্রুমণ্ডিত তুর্কি-সম্রাটের রাজোচিত গাম্ভীর্য ছিল অবিচলিত। তাঁকে দেখে তৈমুর উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। মৃদু হাসির আভায় তাঁর ধূসর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গর্ব বা সাহসের অভাব ছিল না বায়েজিদের। তীব্রকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'খোদা যাকে মেরেছেন, তাকে উপহাস করা অশোভন।'

ধীরে ধীরে তৈমুর উত্তর করলেন, 'আমি এ-কারণে হেসেছি যে, খোদা আমার মতো একজন খোঁড়া এবং তোমার মতো একজন অন্ধ ব্যক্তিকে পৃথিবীর মালিকানা দিয়েছেন।' এরপর গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, 'তুমি যদি জয়ী হতে, তা হলে আমার

এবং আমার লোকজনের কী দশা হত, তা কারুর অজানা নয়।'

বায়েজিদ একথার কোনো উত্তর দিলেন না। তৈমুরের আদেশে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করা হল এবং শামিয়ানার নিচে তাঁর পাশে তাঁকে বসানো হল। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুলতানকে বন্দি হিসেবে করায়ত্ত করতে পারায় বয়োবৃদ্ধ দিগ্বিজয়ীর আনন্দ হয়েছিল। তিনি বায়েজিদের সাথে সদ্ব্যবহারই করেছিলেন।*

বন্দি সম্রাট তাঁর ছেলেদের খুঁজে বার করতে অনুরোধ জানালেন। তৈমুর এ-অনুরোধ অনুসারে কাজ করতে তাঁর লোকদের আদেশ করলেন। ছেলেদের মধ্যে মুসাকে বন্দি হিসেবে আনা হল এবং তাঁকে দেওয়া হল একটা সম্মানজনক পোশাক। তাঁকে তাঁর পিতার কাছেও বসতে দেয়া হল। যুদ্ধেই একজনের মৃত্যু হয়; কাজেই তাঁকে পাওয়া গেল না। বাকি ছেলেরা পালিয়েছিল।

বাকি পলাতক তুর্কিসৈন্যদের অনুসরণে সাগর পর্যন্ত সবদিকে তৈমুরের সৈন্যগণ ধাওয়া করল। ওসমানীয়দের রাজধানী ব্রুস অধিকারের পর নুরুদ্দিন সুলতান বায়েজিদের ব্যক্তিগত ধনরত্ন তৈমুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আরো পাঠালেন বায়েজিদের অগণ্য সুন্দরী ক্রীতদাসীদের। ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু সুন্দরী নয়, গানে এবং নাচেও ছিল সুনিপুণা। আরো বহুরকম লুটের মাল নিয়ে তাতারি সৈন্যেরা তৈমুরের শিবিরে ফিরে এল। রীতি অনুযায়ী ভোজের উৎসব হল। তাতে ছিল এবার ইউরোপীয় মদ ও মেয়েলোক।

এই ভোজোৎসবে বায়েজিদকেও দাওয়াত করা হয়েছিল এবং তিনি এসেও ছিলেন। তৈমুরের নিকটেই তিনি বসেছিলেন। বৃদ্ধ তাতার বায়েজিদের রাজকীয় পোশাক, দণ্ড, তাজ ইত্যাদি নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। এসব ব্রুস থেকে লুটের মাল হিসেবে আগেই আনা হয়েছিল। গম্ভীরমূর্তি বায়েজিদ এগুলো একে-একে পরিধান করলেন—মাথায় দিলেন রত্নখচিত পাগড়ি এবং হাতে নিলেন তাঁর বহু দেশজয়ের প্রতীকচিহ্ন স্বর্ণদণ্ড।

এভাবে সজ্জিত হওয়ার পর তাঁকে দেওয়া হল নিজস্ব মদ এবং তাঁর রুচিসম্মত খাদ্যাদি। কিন্তু তিনি কিছুই খেলেন না। তাঁরই চোখের সামনে তাঁরই সুন্দরী রমণীগণকে অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় বিজয়ীদের পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত করা হল। এদের মধ্যে তিনি দেখলেন তাঁর সবচাইতে প্রিয় রমণী ডেসপিনাকে। এ ছিল এক খ্রিস্টান বালিকা—সার্ভিয়ার মৃত জনের ভগ্নী। বায়েজিদ এ-মেয়েটির প্রতি এতবেশি অনুরক্ত ছিলেন যে, একে রীতিঅনুযায়ী মুসলমান হতে পর্যন্ত বাধ্য করেননি।

তিনি বসেছিলেন নিঃশব্দ ভাবলেশহীন মুখে। ধূপের ধোঁয়ার মেঘজালের ভিতর

---

* বায়েজিদকে একটা খাঁচায় পুরে পশুর মতো ঘুরানো হয়েছিল, এরূপ একটা গল্প মার্লোর 'তাম্বুরলেন দি গ্রেট' গ্রন্থে পাওয়া যায়। গল্পটা নেয়া হয়েছে ইবনে আরব শাহের কবিতা থেকে, যাতে বলা হয়েছে : "ওসমানের ছেলে শিকারির জালে ধরা পড়ল এবং পাখির মতো একটা খাঁচায় আবদ্ধ হল।" আসল কথা এই যে, ধরা পড়ার পরই বায়েজিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে একটা শিবিকায় করে নেয়া হয়। বস্তুত, ভোজে হাজির হতে বাধ্য করা ছাড়া তাঁর প্রতি কোনোরূপ অসদ্ব্যবহার করা হয়নি।

দিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয় রমণীদের শ্বেতশুভ্র মূর্তিসমূহের আনাগোনা দেখা যাচ্ছিল। এদের এক-একজনকে তিনি তাঁর খেয়াল-খুশিমতো এক-এক ডজন বন্দিনীর মধ্য থেকে নির্বাচিত করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিল কৃষ্ণকেশী আর্মেনিয়ান, স্বর্ণকেশী সার্কাসিয়ান, কাকচক্ষু গ্রিক এবং ভারিক্কি চালের রুশ-সুন্দরী। আগে কখনো হারেমের বাইরে এদের দেখা যায়নি।

সবসময়ে বায়েজিদের উপর দৃষ্টি ছিল এশিয়ার মালিকের—সে-দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল বিস্ময়, বিদ্রূপ এবং অসহিষ্ণুতা। তাতে বায়েজিদের মনে পড়ে গিয়েছিল এক বছর আগে তৈমুরের কাছে লেখা তাঁর চিঠির কথা। ক্রোধ তাঁর সমগ্র সত্তা জ্বরের মতোই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তীব্র অহঙ্কারেই তাঁর ক্রোধের বহির্প্রকাশ রোধ করছিল। কিন্তু তিনি কিছুই খেতে পারলেন না।

তৈমুর কি ছিলেন এ-ব্যাপারে শুধুই নিরাসক্ত? বায়েজিদ রাজপোশাক পরেছিলেন বলে কিছুটা বিস্মিত? সত্যি কি তিনি তাঁর বিশিষ্ট বন্দিকে সম্মানিত করার কথা ভেবেছিলেন? কিংবা এই ভোজ ছিল একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ মাত্র? কেউই তা জানত না। আর মনে হয়, সুলতান এসব গ্রাহ্য করারই বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর কানে তখনো তাতারদের যুদ্ধের বাদ্যধ্বনি আর তাদের বিজয়োল্লাসের উচ্ছৃঙ্খল সংগীত ভেসে আসছিল।

তবু বায়েজিদ তাঁর স্বর্ণদণ্ড ধরেই বসেছিলেন। তাঁর বিপুল দেহ যন্ত্রণায় কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। কিন্তু যখন তাতাররা তাঁর নিজস্ব নাচওয়ালিদের আনতে আদেশ করল এবং তুর্কি প্রেমসংগীত গাইতে তাদের নির্দেশ দিল, তখন আর বায়েজিদ স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা যেতে দিল তাঁকে। দুজন তাতার অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধ ধরল এবং তাঁকে ভোজসভার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তাঁর পাগড়ি-পরিহিত মাথা তাঁর বুকের উপর ঝুলে পড়ল।

পরে তৈমুর ডেসপিনাকে বায়েজিদের কাছে পাঠিয়ে দিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁকে বলে পাঠালেন, তিনি সুলতানের কাছে তাঁর প্রিয় স্ত্রীকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

বায়েজিদের এইখানেই শেষ। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ততা এবং যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি হয়েছিলেন শক্তিহীন, তাঁর অহঙ্কার হয়েছিল চূর্ণ। ফলে কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৩০
ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে

তুর্কিরা এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল যে, দ্বিতীয় যুদ্ধের আর দরকার হল না। আঙ্গোরা আত্মসমর্পণ করেছিল—ব্রুসা এবং নিশিয়া পিছু-ধাওয়াকারী তাতারদের আগমনেই আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। এশিয়া মাইনরের চারদিকে একেবারে সাগর পর্যন্ত পলাতকেরা ছুটেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাদের মধ্যে তুর্কি আমির, পাশা, অফিসার প্রভৃতি

সবশ্রেণীর লোকই ছিল। জেলেদের নৌকা, নৌভ্রমণের বজরা প্রভৃতি এসব পলাতকদের সাগরমধ্যস্থ দ্বীপগুলোতে নিয়ে গেল। এমনকি গ্রিস ও জেনোয়ার নৌবহরগুলো পর্যন্ত এদের সাগরের ওপারে ইউরোপ পৌঁছে দিল।

খ্রিস্টানরা কেন তাদের আগেকার উৎপীড়কগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গেল, তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। হয়তো এজন্য তাদেরকে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয়েছিল, কিংবা হয়তো সবারই অনুগ্রহভাজন হওয়ায় পুরনো গ্রিকনীতি অনুসারেই তারা এটা করেছিল। তাদের প্রতিনিধিরা তুর্কি সুলতানের বিরুদ্ধে তৈমুরকে অর্থ ও জাহাজ দিয়ে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখন তৈমুরের সৈন্যগণকে সাগরের ওপারে পৌঁছিয়ে দিতে তারা অস্বীকার করল। ওদের এই দুমুখো নীতিতে তৈমুর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন।

এক মাসের মধ্যেই এশিয়ায় আর একটি তুর্কি সৈন্যও রইল না। অন্যদিকে, একজন তাতারকেও ইউরোপে দেখা গেল না। সমরখন্দের ঘোড়সওয়ারগণ সাগরতীর পর্যন্ত গেল বটে, কিন্তু ওপারের কনস্টানটিনোপলের স্বর্ণগম্বুজগুলোর দিকে চেয়ে থাকাই তাদের সার হল। তারা এরপর সুদূর অতীতের হেলেনের লীলাভূমি ট্রয়ের ধ্বংসস্তূপ যেখানে মাটিতে মিশে গেছে, তার উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। পরে তারা স্মার্নায় সেন্ট জনের নিটদের ঘাঁটি আবিষ্কার করল। তখন শীতকাল—ভীষণ বর্ষার মওসুম। স্মার্না ছয় বছর ধরে বায়েজিদের আক্রমণ প্রতিহত করে রেখেছিল শুনে তৈমুর স্মার্না দেখতে গেলেন।

খ্রিস্টান নিটদের এই ঘাঁটি ছিল উপসাগরের কিনারায় অনেকটা উঁচুভূমিতে। আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত হওয়ায় তৈমুর এই খ্রিস্টান ঘাঁটির উপর হামলা চালালেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পানির উপরে কাঠের পাটাতন তৈরি করালেন। উপসাগরের সংকীর্ণ প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একটি বাঁধও নির্মিত হতে লাগল। কিন্তু তাঁর নির্মাণ শেষ হওয়ার আগেই দু-সপ্তাহের মধ্যে ইউরোপীয়রা উঁচুস্থান থেকে নেমে তাদের নৌ-বহরগুলোতে আশ্রয়গ্রহণে সমর্থ হল। তাদের প্রায় তিন হাজার লোক জাহাজযোগে সাগরপথে পাড়ি দিতে চেষ্টা করল। শত্রুপক্ষ ও শহরের লোকেরা তাদের আক্রমণ করতে পিছু ধাওয়া করল বটে, কিন্তু তারা তরবারি ও দাঁড় দিয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করল। পরদিন রোডেস থেকে একটি রণতরী এসে তাদের উদ্ধার করল।

নাইটদের নিয়ে নৌকাগুলো তীরে ভিড়তে চেষ্টা করলে দুর্গস্থ তাতাররা যে-সংবর্ধনা দিল, তা সত্যিই মর্মান্তিক ও ভয়াবহ। জনৈক নিহত নিটের মাথা একটা প্রস্তর-নিক্ষেপযন্ত্রের উপর রেখে সেটা নিকটবর্তী নৌকোর উপর সজোরে নিক্ষেপ করা হল। এ-বীভৎস দৃশ্য দেখে খ্রিস্টান রণতরী আর তীরে না ভিড়ে সাগরের মধ্যস্থলে চলে গেল। তাতাররা স্মার্না অবরোধ প্রত্যাহার করল বটে, কিন্তু সেখানে রেখে গেল দুইটা মাথার পিরামিডের স্মৃতিস্তম্ভ।

এশিয়া মাইনরে তাতারদের প্রধান দুই শিকার—কারা ইউসুফ ও সুলতান আহমদ—ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে পালিয়ে গেলেন। বাগদাদের সুলতান মিশরে মামলুকদের দরবারে আশ্রয় নিলেন, আর তুর্কম্যান খান কারা ইউসুফ আরব

মরুভূমির ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর কাছে রাজদরবারের চাইতে মরুভূমিই অধিকতর নিরাপদ মনে হল। এখন তাতার-আক্রমণের পথ একেবারে খোলসা হয়ে যাওয়ায় মিশর আত্মসমর্পণ, করদানের অঙ্গীকার এবং তৈমুরের নামে খোৎবা পড়ার স্বীকৃতি জানিয়ে দূত পাঠাল। দুর্ভাগা আহমদকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল।

তৈমুরের বিজয়াভিযানের প্রতি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মনোভাব ছিল কতকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বিত—কেউবা হলেন চমৎকৃত, বিস্মিত, আবার কেউ-কেউ হলেন ভীত। তাঁদের রাজ্যের একেবারে দ্বারদেশে এমন বিস্ময়কর অভ্যুত্থান তাঁদের করেছিল হতবুদ্ধি। তুর্কিরা যেখানে শাসন করেছে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে, সেখানে প্রাচ্যের কোন্ গভীর থেকে কেমন করে তাতার দিগ্বিজয়ীর এমন আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল যে, তিনি বায়েজিদ এবং তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনীর একেবারে নাম-নিশানা মুছে দিলেন।

এক খেলোয়াড় যেমন করে অপর খেলোয়াড়কে তার জয়ে অভিনন্দন জানায়, তেমনিভাবে ইংলন্ডের ৪র্থ হেনরি তৈমুরকে অভিনন্দন জানালেন। স্পেনের ৬ষ্ঠ চার্লস তাতারদের বাণী-বয়ে-আনা সুলতানিয়ার বিশপ জনের কথা স্মরণ করলেন এবং তাঁকে দরবারে ডেকে এনে তাঁর মারফতে তৈমুরের কছে চিঠি ও উপহার পাঠালেন। ভ্রাম্যমাণ সম্রাট ম্যানুয়েল আনন্দ করতে করতে তাঁর রাজধানী কনস্টানটিনোপলে ফিরে এলেন এবং সেখান থেকে আত্মসমর্পণের অঙ্গীকার ও নির্দিষ্ট করদানের স্বীকৃতি জানিয়ে তৈমুরের কাছে দূত পাঠালেন। সিজারের নিঃস্ব উত্তরাধিকারী এতদিনে ইউরোপীয় রাজাদের চাইতেও একজন বড় মুরব্বি লাভ করলেন। সোনালিবাহিনীকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়েই যেন জেনোয়ার অদিবাসীরা এখন সেরা দুর্গের উচ্চচূড়ায় তৈমুরের নিশান উড়িয়ে দিল।

কিন্তু স্পেনই তাতার-রাজ্যের সাথে সর্বপ্রথম বাস্তব সংযোগ স্থাপন করল। কিছুদিন আগে ক্যাস্টাইলের তৃতীয় হেনরি তুর্কিদের শক্তি ও যুদ্ধ-পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য অবগতির জন্য প্রাচ্যে দুইজন সামরিক পরিদর্শক পাঠিয়েছিলেন। পিলারো ডি সেটো মেয়র এবং ফার্নান্ডো ডি পালাজিউ লাস নামে এই নিট দুজন এশিয়া মাইনরের ভিতরে পরিভ্রমণ করেন এবং আঙ্গোরার যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তাঁরা তৈমুরের সেনাদলের সাথে পরিচিত হন। তাঁরা তৈমুরের সাক্ষাৎলাভ করেন এবং তৈমুর তাঁদেরকে বায়েজিদের বন্দিনীদের থেকে দুজন খ্রিস্টান রমণী উপহার দেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই রমণীদের একজন ছিলেন হাঙ্গেরির কাউন্টজনের অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে এঞ্জেলিনা, আর অন্যজন ছিলেন মেরিয়া নাম্নী গ্রিক রমণী। এই স্পেনীয় পরিদর্শকদের সাথে তৈমুর একজন দূত পাঠালেন।

এই সৌজন্যের প্রতিদানে ডন হেনরি এই 'তাতারি নিটে'র সাথে তৈমুরের দরবারে পাঠালেন তিনজন দূত। এই দূতত্রয়ের নেতা হিসেবেই গেলেন হেনরির খাস মুনশি রু দ্য গঞ্জালিস ক্লাভিজো।

তৈমুরের দূত ও নিজের সঙ্গীদের নিয়ে ক্লাভিজো ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সেন্টমারি বন্দর থেকে রওনা হন। কিন্তু কনস্টানটিনোপলে পৌঁছে জানতে পারেন যে,

তাতাররা সেখান থেকে আগেই চলে গেছে। প্রভুর আদেশ অনুযায়ী তিনি তাদের অনুসরণে এগিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এসে পৌঁছলেন সমরখন্দে।

তৈমুর ইউরোপে ঢুকবার চেষ্টা করলেন না। প্রণালীর রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণসাগর ঘুরে তিনি ইউরোপে প্রবেশ করতে পারতেন। কয়েক বছর আগে তিনি ক্রিমিয়ায় গিয়েছিলেন। এবার সে-উৎসাহ আর ছিল না। তাঁর লোকেরা সমরখন্দে ফিরবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া বায়েজিদের রাজ্য থেকে তিনি প্রচুর ধনসম্পদও পেয়েছিলেন। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ছিল সেন্ট পল ও সেন্ট পিটারের মূর্তিখোদিত ব্রুসার রৌপ্যনির্মিত সিংহদ্বার এবং বিখ্যাত বাইজেন্টাইন লাইব্রেরি। এ সবই তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

এরপর কিছুদিন তিনি রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে আত্মনিমগ্ন রইলেন—অধিকৃত রাজ্যগুলোর কর-আদায়, তুর্কি প্রদেশগুলোতে শাসনকর্তা নিযুক্তি এবং বিদেশী রাজদূতদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন—এইশ্রেণীর কাজে। এবং এই সময়েই তাঁকে একটি অপ্রত্যাশিত এবং মর্মান্তিক ক্ষতি সহ্য করতে হল। অফিসারগণ এসে তাঁকে জানাল, আঙ্গোয়ার যুদ্ধে আহত শাহজাদা মোহাম্মদ মরণাপন্ন হয়ে পড়েছেন। তৈমুর তৎক্ষণাৎ পৌত্রের কাছে ছুটলেন এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য আরবের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে নিযুক্তির আদেশ দিলেন। কিন্তু মোহাম্মদের শিবিরে পৌঁছে দেখলেন, তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই। সেই দণ্ডেই তৈমুর ভেরি বাজাতে আদেশ দিলেন এবং সমরখন্দে যাত্রার জন্য সমগ্র বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার ফরমান জারি করলেন।

ইতঃপূর্বে তিনি প্রথম পুত্র জাহাঙ্গির ও ওমর শেখকে হারিয়েছেন। মিরন শাহ তাঁর অযোগ্য পুত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে। শাহরোখ মৃদুস্বভাব এবং কিছুটা যুদ্ধবিরাগী—বর্তমানে অতিক্রান্ত-যৌবন। শাহজাদা মোহাম্মদই ছিলেন তাঁর শেষবয়সের সবচাইতে প্রিয়পাত্র—শুধু তাঁর নয়, সৈন্যবাহিনীরও।

পচন-নিবারক সুগন্ধ মশলালিপ্ত শাহজাদার মৃতদেহ বহন করে ফিরে চলল তাঁরই অধিনায়কতায় সমরখন্দ থেকে আগত সৈন্যদল। তাদের পোশাকের রং লাল থেকে ধূসর কালোয় পরিবর্তিত হল। মোহাম্মদের মা খানজাদের আর্তচিৎকার তৈমুর ধৈর্যের সাথে বরদাশ্‌ত করলেন বটে, কিন্তু যখন তিনি শববাহী দলে যোগ দিতে তাব্রিজের লোকদের সাথে মোহাম্মদের শিশুপুত্রদের আসতে দেখলেন, তখন দুঃখে তাঁর হৃদয় ফেটে যেতে লাগল—তিনি কয়েকদিন তাঁর শামিয়ানায় নির্জনে কাটালেন।

অতীতের রোমন্থনে অভ্যস্ত বৃদ্ধদের মতো তাতার দিগ্বিজয়ীরও মনে হল, তাঁর ইচ্ছাশক্তির চাইতেও বড় কোনো শক্তি একে-একে তাঁর প্রিয়পাত্রদের তাঁর নিকট থেকে কেড়ে নিচ্ছেন। তাঁর প্রাথমিক যুগের বিজয়ের অংশভাগী আমিরগণ এখন কবরে শুয়ে আছেন—মহান সাইফুদ্দিন, বিশ্বস্ত জকু বারলাস এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের এই ছেলে—এদের তিনি আর দেখতে পাবেন না। এমনকি, পরম বিশ্বস্ত যে-আকবোগাকে তিনি শেষ পর্যন্ত হিরাতের শাসন-কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং যিনি তাঁর ছেলেদের পর্যন্ত তাঁর সৈন্যবাহিনীতে দিয়েছেন, তিনিও আর নেই।

এঁদের স্থানেই তিনি এখন দেখছেন নুরুদ্দিন এবং শাহ আলিকে—খুবই যুদ্ধলিপ্সু সন্দেহ নেই, কিন্তু শাসনরজ্জু ধারণে একেবারেই অকেজো। মসজিদের ইমামরা তাঁর চারপাশ ঘিরে মৃতের জন্য দোয়া-দরুদ পড়ে চলেছেন। নানা অদ্ভুত স্বপ্নের জন্য তাঁর ভালো ঘুম হচ্ছিল না। অতীতে যে-খানরা মরুভূমি পেরিয়ে ক্যাথে অভিযান করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে নানা কথা তাঁর মনে ভিড় করছিল। এমনকি, যখন তিনি বাগদাদ এবং অন্যান্য বিধ্বস্ত শহরগুলো পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন, তখনো তাঁর মগজে এইসব খেয়ালের খেলা চলছিল। শাহরোখকে যখন তিনি খোরাসানের এবং মোহাম্মদের ভাইকে হিন্দুস্তানের শাসনভার দিলেন, তখন তিনি ভাবছিলেন, গোবি সাহারা এবং সে-সম্পর্কে শৈশবকালে সবুজ-নগরীর চারপাশে হরিণ-শিকারকালে যেসব গল্প শুনেছিলেন, সেইসব কথা।

এসব কল্পস্বপ্ন থেকেই তিনি একটা পরিকল্পনাও রচনা করেছিলেন। গোবিতে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাবেন এবং চীনা প্রাচীর ভেঙে সুরক্ষিত ক্যাথে নগরীতে প্রবেশ করবেন। এবং এইভাবে তিনি তাঁর সাথে মোকাবিলায় সক্ষম পৃথিবীর শেষ শক্তিকে চূর্ণ করবেন।

তৈমুর তাঁর অফিসারদের একথা জানালেন না। বরং তাব্রিজের শীতাবাসেই সৈন্যদের ধরে রাখলেন। এবং সেখানেই বিগত অভিযানগুলোর ক্ষয়ক্ষতির পরিপূরণকল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। গ্রীষ্মের শুরুতে তিনি সমগ্র বাহিনী ও দরবারসহ সমরখন্দের পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। আগস্ট মাসে তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং দিলআরা বাগে শাহি আবাস স্থাপন করলেন। নতুন মসজিদের চারদিক ঘুরে দেখে তিনি খুশি হতে পারলেন না। ভিতরের গ্যালারিগুলো বড় করা হয়নি বলে তিনি কারিগরদের তিরস্কার করলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজধানীর পরিচালনভার যাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, তাদের তিনি বিচার করলেন—কাউকে দিলেন ফাঁসি, আবার কাউকে-বা করলেন পুরস্কৃত। তাঁর বার্ধক্যপীড়িত দেহে যেন যুবকের উৎসাহ সঞ্চারিত হল। তিনি প্রিন্স মোহাম্মদের জন্য এক নতুন কবর নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। তাতে রইল স্বর্ণমণ্ডিত শাদা মার্বেলের গম্বুজ। তাঁর ইচ্ছায় নির্মিত হল রুপার স্তম্ভের উপর কালো ও শাদা পাথরের একটি নতুন বাগানবাড়ি।

কালের বিরুদ্ধে যেন তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। গত দুবছরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। চক্ষুতারকা হয়ে পড়ছিল স্তিমিত। তাঁর বয়স তখন উনসত্তর। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে।

তিনি আদেশ দিলেন, দুমাস ধরে উৎসব চলবে—যেন কোনো ব্যক্তি অপরকে বলতে না পারে, 'কেন এটা করা হল?'

এরপর সমরখন্দে যে-উৎসব শুরু হল, তাতে কুড়িটি রাজ্যের রাজদূতগণ এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোবি-সাহারার মোঙ্গলদের ধূসরমুখ দূতগণ। গোবির মোঙ্গলশক্তি ইতঃপূর্বেই ক্যাথে থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তৈমুর এদের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ করলেন।

স্পেনরাজের খাস মুনশি রু দ্য ক্লাভিজো কনস্টানটিনোপল থেকে তাঁকে অনুসরণ

করে সমরখন্দে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তৈমুর তাঁকেও অভ্যর্থনা করলেন। ক্লাভিজো নিজে তাঁদের এ-সাক্ষাৎকারের যে-বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, নিম্নে তার কিছুটা উদ্ধৃত করা হল :

'৮ই সেপ্টেম্বর, (১৪০৩ খ্রি.) সোমবার দিন রাজদূতরা* তাঁদের বাগানবাড়ির আস্তানা থেকে সমরখন্দে চলে গেলেন। ঘোড়া থেকে নিচে নেমে তাঁরা রাজপ্রাসাদের বাগিচায় প্রবেশ করলেন। সেখানে দুজন রাজানুচর এসে তাঁদের বলল, উপহারদ্রব্য যে যা এনেছেন, সেসব তাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে। ফলে রাজদূতগণ তাঁদের আনীত উপহারগুলো সেই দুই ব্যক্তিকে দিলেন এবং তারা সেগুলো প্রভুর (তৈমুরের) কাছে নিয়ে গেল। মিশরের সুলতানের প্রেরিত উপহারগুলোও এইভাবেই তৈমুরের কাছে প্রেরিত হল। এই বাগানের প্রবেশদ্বার ছিল অত্যন্ত উঁচু এবং প্রশস্ত। নীল ও সোনালি রঙে রঞ্জিত উজ্জ্বল টালির তৈরি ছিল এই দ্বারদেশ। সেখানে পাহারারত ছিল কয়েকজন দণ্ডহস্ত দারোয়ান। ছয়টা হাতির উপর সওয়ার হয়ে এলেন রাজদূতেরা। হাতির পিঠে হাওদায় তাঁরা বসেছিলেন।

'রাজানুচরগণ রাজদূতদের বাহু ধরে তৈমুরের কাছে নিয়ে চলল। ক্যাস্টাইলের রাজার কাছে প্রেরিত তৈমুরের দূতও এদের মধ্যে ছিল। ক্যাস্টাইলের পোশাক পরা ছিল বলে তৈমুরের এই দূতের দিকে চেয়ে তাতারগণ হেসে ফেলল।

'রাজদূতগণকে একজন বৃদ্ধ আমিরের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁরা তাঁকে সম্মান জানালেন মাথা নত করে। এরপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল কয়েকজন ছোটছেলের কাছে। এরা তৈমুর-পৌত্র। তাঁরা দাবি করায় রাজদূতগণ তৈমুরের উদ্দেশে লিখিত তাদের রাজাদের চিঠিপত্র একটি ছেলের হাতে দিলেন। ছেলেটি সেগুলো নিয়ে ভিতরে চলে গেল। এর পরে রাজদূতদের তৈমুরের সামনে হাজির করার আদেশ হল। তৈমুর বসেছিলেন এক সুন্দর প্রাসাদের প্রবেশপথের সম্মুখে। তিনি বসেছিলেন মাটিতে। সামনে ছিল তাঁর বহু উপরে পানি-উৎক্ষেপকারী একটি ফোয়ারা। সেখানে পানির উপরে একটি লাল আপেল ভাসছিল। রেশমের কাজ-করা কার্পেটের উপর কতকগুলো গোল বালিশের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে পা রেখে তৈমুর বসেছিলেন। তাঁর পরনে ছিল সিল্কের কাপড় এবং মাথায় ছিল একটি উঁচু টুপি—টুপির উপরদিকে ছিল হীরা ও মূল্যবান পাথরখচিত একটি রুবি।

'তৈমুরকে দেখে রাজদূতগণ হাঁটু গেড়ে এবং বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দুহাত রেখে মাথা নত করলেন। তারপর একটু এগিয়ে আবার ঐরূপ করলেন। তারপর মাটিতে হাঁটু-গাড়া অবস্থায় তৃতীয় বার তাঁরা মাথা নত করলেন। তৈমুর তাঁদের উঠতে আদেশ দিয়ে তাঁর কাছে আসতে বললেন। অনুচরগণ এরপর তাঁদের নিকট থেকে সরে দাঁড়াল। তৈমুরের নিকট দাঁড়ানো আমিরদের মধ্যে নুরুদ্দিন এসে তাঁদের হাত

---

* ক্লাভিজো এখানে শুধু নিজকে এবং তাঁর সঙ্গীদিগকে 'রাজদূত' বলে উল্লেখ করেছেন। এবং তৈমুরকে বলেছেন 'মালিক'। এখানে সুলতান বলে অভিহিত করা হয়েছে মিশরের সুলতানকে। এ-বিবরণ ক্লিমেন্ট মারগ কর্তৃক অনূদিত এবং হাকলি উট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণের সংক্ষিপ্তসার।

ধরলেন এবং তৈমুরের আরো কাছে তাঁদের নিয়ে গেলেন—যাতে তিনি তাঁদের ভালো করে দেখতে পারেন। বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

'চুমু দেয়ার জন্য তিনি তাঁর হাত বাড়ালেন না, কারণ সেটা তাঁদের রীতি নয়। কিন্তু স্পেনের রাজার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, 'আমার ছেলে কেমন আছে? তাঁর স্বাস্থ্য ভালো তো?' তারপর তিনি তাঁর পাশে-দাঁড়ানো আমিরদের দিকে চাইলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আগেকার তাতারি সম্রাট তোক্তামিশের ছেলে এবং সমরখন্দের আগেকার রাজাদের বংশধরগণ। বললেন, 'দ্যাখো, এরা হচ্ছে আমার ছেলে, স্পেনের রাজার দূত।* স্পেনরাজ হচ্ছেন ফ্রাঙ্কদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। পৃথিবীর শেষপ্রান্তে তাঁর রাজ্য।'

'এই বলে তিনি তাঁর পৌত্রের হাত থেকে চিঠি গ্রহণ করলেন। চিঠি খুলে তিনি বললেন, এখনই তিনি চিঠির বক্তব্য শুনবেন। তারপর রাজদূতগণকে তৈমুরের ডানপাশে অবস্থিত একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। আমিররা তাঁদের হাত ধরে নির্দিষ্ট আসনে তাঁদের বসিয়ে দিলেন। এ-আসনগুলো ছিল ক্যাথের সম্রাট-প্রেরিত রাজদূতের আসনের নিচে। স্পেনের রাজদূতগণকে ক্যাথের রাজদূতের আসনের নিচে স্থান দেওয়া হয়েছে দেখে তৈমুর আদেশ করলেন, 'না, এদের আসন হবে উপরে। কারণ এরা আমার পুত্র ও বন্ধু স্পেনের রাজার দূত, আর ক্যাথের রাজদূত এসেছে এক চোর এবং দুষ্টলোকের দূত হয়ে।'

৩১
সফেদ দুনিয়া

বৃদ্ধ দিগ্বিজয়ী তাঁর কল্পরাজ্য গড়ে তুলেছিলেন—একই সঙ্গে শিবির নগর এবং বাগিচা। তাতে তাঁর বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। এই দুমাসে, যখন শরতের ঘোলাটে সূর্য নীলপাহাড়ের ওপারে ডুবে যায়, সমরখন্দকে তখন মনে হচ্ছিল যেন জিনপরীর রাজ্য। অন্ততপক্ষে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ক্লাভিজোর কাছে তেমনই মনে হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন—ফুল ও পাকা ফলে ঢাকা প্রাঙ্গণ, মূল্যবান পাথর-ছড়ানো-রাস্তায় চলমান শিবিকা ও তার ভিতরে সংগীতরত গায়িকা, পাশে-পাশে বীণাবাদকের দল এবং সোনার শিংওয়ালা বাঘ ও ছাগলের মিছিল। অবশ্যি এগুলো ছিল নকল বাঘ ও ছাগল। অর্থাৎ বাঘ ও ছাগলের চামড়া-ঢাকা সুন্দরী বালিকার দল মাত্র। মসজিদের মিনারের চাইতেও উঁচু এক প্রাসাদের ভিতর দিয়ে তিনি হেঁটে বেড়িয়েছিলেন। এটা

---

* তৈমুর কর্তৃক বিতাড়িত জাট খান। ক্লাভিজো এশিয়ার ঘটনাবলির যথাসম্ভব সত্য বিবরণ দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই সমরখন্দে গিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তৈমুর-নির্মিত প্রাসাদাবলি ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে।

ছিল তাঁতিদের বোনা লালকাপড়ে তৈরি। তিনি দেখেছিলেন হাতির যুদ্ধ, ভারত ও গোবি সাহারা থেকে তৈমুরের কাছে উপহারসহ তাতার রাজপুরুষদের আগমন। ক্লাভিজো বলতেন, 'ধীরে ধীরে হেঁটে ভালো করে না-দেখে কারুর পক্ষেই এসবের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব ছিল না।'

হঠাৎ তারপর একদিন রাজদূতদের বিদায় দেওয়া হল। সমাপ্তি ঘোষণা করা হল উৎসবের।

তৈমুর তাঁর আমির ও রাজপুরুষদের প্রতিনিধিগণকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'একমাত্র ক্যাথে ছাড়া এশিয়ার সব রাজ্য আমরা অধিকার করেছি। আমরা এমন সব শক্তিমান রাজাদের হারিয়েছি যে, আমাদের কৃতিত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বহু যুদ্ধে তোমরা আমার সঙ্গী ছিলে। কখনো তোমরা পরাজয় বরণ করনি। ক্যাথের পৌত্তলিকদের পরাজিত করতে বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে না। সেখানেই এখন তোমরা আমার সাথে অভিযানে যাবে।'

এই মর্মে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় তাঁর স্থিরসংকল্প ফুটে উঠল। স্বরে প্রকাশ পেল লৌহকঠিন দৃঢ়তা। পূর্বপুরুষের আবাসভূমি অতিক্রম করে ক্যাথের বিরাট প্রাচীরের ওপারে যাওয়া—এই হবে তাঁর শেষ অভিযান। তাঁর যে-সৈন্যবাহিনী তিন মাসের বেশি বিশ্রাম পায়নি, তারাও ঝাণ্ডা তুলে অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য অধীরতা প্রকাশ করল।

সমরখন্দে এত যোদ্ধার সমাবেশ হল যে, আর বেশিকিছু করার প্রয়োজন হল না। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দুলাখ সৈন্য অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। তখন শীতকাল শুরু হয়ে গেছে। যতদিন-না বরফ গলে যায়, ততদিন তাদের অপেক্ষা করা দরকার ছিল। কিন্তু তৈমুর বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। বাহিনীর ডানবাহুর সাথে তিনি শাহজাদা খলিলকে উত্তরদিকে পাঠালেন, এবং যে-কেন্দ্রীয় দলকে মোহাম্মদ পরিচালনা করতেন, তিনি নিজে রইলেন সে-দলের সাথে। তারা এগিয়ে চলল যেন একটা চলন্ত কাঠের শহর। কারণ, সঙ্গে তাদের নিতে হয়েছিল সবরকম প্রয়োজনীয় রসদসম্ভার—যাতে কখনো সেসবের কমতি না পড়ে।

বিশাল বাহিনী সমরখন্দের নদী পার হল। তৈমুর একবার ফিরে তাকালেন শহরের দিকে, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। মসজিদের গম্বুজ ও মিনারের চূড়াগুলো ক্রমে তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

তখন নভেম্বর মাস। ভীষণ শীত পড়েছে। যখন তাঁরা গিরিসঙ্কট পার হয়ে গেলেন (পরবর্তীকালে একে বলা হত তৈমুর লঙের গেট) তখন বরফ পড়া শুরু হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের তৃণভূমি থেকে বায়ুপ্রবাহ এসে সমতলক্ষেত্র ভরিয়ে দিল এবং শীতে কাঁপতে কাঁপতে সকলে শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করল।

তারা আবার যখন চলতে শুরু করল, তখন দুনিয়া শাদা বরফে একেবারে ছেয়ে গেছে। নদীগুলো হয়েছে বরফাচ্ছাদিত, রাস্তায় জমেছে বরফস্তূপ। কিছু লোক ও ঘোড়া শীতে মারাও পড়ল। কিন্তু তৈমুর চলায় ক্ষান্ত হবেন না কিংবা শীতাবাসেও আশ্রয় নেবেন না—'পাথরের শহর' নামে শীতাবাসে তৈমুর-পৌত্র খলিল তাঁর

বাহিনীসহ শীতকাল কাটিয়ে দেওয়ার জন্য এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। বৃদ্ধ দিগ্বিজয়ী বুঝিয়ে বললেন, সুদূর উত্তরের সীমান্ত-দুর্গ ওত্রারে তিনি যাবেন। তাঁর পৌত্রকে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেলেন, শীতকাল কেটে গেলে রাস্তা খোলসা হলেই যেন তিনি মূল বাহিনীর সাথে গিয়ে যোগ দেন।

বরফের উপর পশমি কাপড়ের আস্তরণ ফেলে তাদের এগিয়ে যেতে হল। শির দরিয়ার উপর তিন ফুট বরফ জমেছিল। তারা এই বরফের উপর দিয়েই নদী পার হল। শীতের প্রকোপ ক্রমে আরো বেড়ে গেল। তার সঙ্গে বৃষ্টি, জোর বাতাস ও বরফ। বহু বছর আগে সোনালিবাহিনীর মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা যেভাবে বরফ ভেঙে অগ্রসর হয়েছিল, এবার তা সম্ভব হল না। প্রতিদিন মাত্র কয়েক মাইল করে তারা অগ্রসর হতে পারল।

গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলল। মালবোঝাই পশুর মতো ধীরগতিতে গিরিসঙ্কট পার হয়ে তারা উত্তরাঞ্চলের সমতলভূমিতে প্রবেশ করল। ওত্রারের দেয়াল তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। এটাই তাদের শীতাবাস।

এখানেই তৈমুর বিশ্রাম করলেন। বসন্তের গরম শুরু হলেই আবার তাঁদের চলা শুরু হবে বলে স্থির হল।

তাঁর নির্দেশ অনুসারে ১৪০৫ সালের মার্চ মাসে আবার সৈন্যবাহিনী নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। নিশান উত্তোলিত হল, ঘোররবে ঢাক বেজে উঠল। পরিদর্শনের জন্য সৈন্যদলগুলো সমতলভূমিতে এসে জড়ো হল। দলীয় সেনাপতিরা তাঁদের বাদকদেরও সমবেত করলেন আমিরের প্রতি রাত্রের সালাম জানানোর উদ্দেশ্যে। পাইপ ও ড্রাম ভীমরবে ধ্বনিত হয়ে উঠল। ঘোড়ার খুরে জাগল তার প্রতিধ্বনি।

কিন্তু এ-সালাম আসলে দেওয়া হল মৃতের উদ্দেশে।

তৈমুর ওত্রারেই মারা যান। তাঁর ইচ্ছা-অনুসারে বাহিনী আবার উত্তর রোড ধরে রওনা হল। তাঁর শাদা ঘোড়াটা জিনসজ্জিত হয়ে নির্দিষ্ট স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু তার উপরে কোনো অশ্বারোহী ছিল না।

ইতিহাসে তৈমুর-জীবনের শেষদৃশ্যের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাসাদের কাঠের দেওয়ালের বাইরে বরফের ভিতর দাঁড়িয়ে ছিল সব পদের আমির ও অফিসারগণ। কক্ষের ভিতরে বসেছিলেন সাম্রাজ্ঞী সরাই মুলক খানুম ও তাঁর সহচরীর দল। তৈমুরের অসুখবার্তা রাজধানীতে পৌঁছামাত্র তিনি সমরখন্দ থেকে যাত্রা করে এখানে পৌঁছেছেন।

তৈমুরের কক্ষের দ্বারদেশের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘশ্মশ্রু ইমামগণ। তাঁরা সশব্দে কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করছিলেন : 'মধ্যদিবসের উজ্জ্বলতায় সূর্যের পাশে; আর তার অনুসরণে যে-চাঁদ তাকে রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে ফেলে, সেই চাঁদের পাশে—'

সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁরা ঠায় দাঁড়িয়ে কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করে চললেন,

কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হেকিম তাব্রিজের মওলানা বলেছিলেন, 'কোনো উপায় নেই—নির্দিষ্ট দিন এসে গেছে।'

তৈমুর প্রসারিত দেহে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। শাদা ফুলের রাশির মধ্যে তাঁর রেখাঙ্কিত ধূসর মুখ ভাসছিল। উচ্চপদস্থ আমিরগণকে তৈমুর তাঁর শেষ নির্দেশ জানালেন, 'সাহসের সাথে তরবারি ধারণ করবে। নিজেদের মধ্যে সবসময়ে আপোস করে চলবে; কারণ শৃঙ্খলাহীনতা ধ্বংস ডেকে আনবে। ক্যাথে অভিযান থেকে সরে দাঁড়াবে না।'

কয়লার আগুন তাঁর মাথার কাছে জ্বলছিল। তাঁর আওয়াজ হয়ে পড়েছিল ফিসফিস শব্দের মতো, অত্যন্ত মৃদু। তিনি বলছিলেন, 'আমি যেহেতু থাকছিনে, ও-কারণে নিজেদের জামা ছিঁড়ে এদিকে-ওদিকে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি কোরো না। কারণ তার ফলে বিশৃঙ্খলা হবে।'

নুরুদ্দিন ও শাহ্ মালিককে নিজের কাছে ডেকে এনে তিনি স্বর উঁচুতে তুলে বললেন, 'আমি জাহাঙ্গিরের পুত্র পির মোহাম্মদকে আমার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করছি। তাকে অবশ্যই থাকতে হবে সমরখন্দে এবং সামরিক-বেসামরিক যাবতীয় ক্ষমতা নিগূঢ়ভাবে থাকবে তার হাতে। তার সেবায় ও সমর্থনে তোমরা জীবন উৎসর্গ করো, এই আদেশ তোমাদের আমি দিয়ে যাচ্ছি। সমরখন্দসহ আমার অধিকারের দূরবর্তী প্রদেশগুলোও সে-ই শাসন করবে। তোমরা যদি পুরোপুরিভাবে তাকে মেনে না চলো, তা হলে অন্তর্বিরোধ হবে।'

উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও আমিরগণ একে-একে এসে তাঁর এ-আদেশ পালনের শপথ গ্রহণ করলেন। তবে তাঁরা অনুরোধ জানালেন, তৈমুর যেন তাঁর বাকি সব পৌত্রকে ডেকে তাঁর এ-আদেশ তাদের শুনিয়ে দেন।

এরপর তাঁর স্বরে কিছুটা আগেকার অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'এই আমার শেষ দরবার। খোদা যা করেন, তা-ই হবে।'

কিছুক্ষণ পরে যেন তিনি নিজকেই নিজে বললেন, 'আমি আরকিছু চাই না—শুধু আর-একবার শাহরোখকে দেখতে চাই। কিন্তু সে তো অসম্ভব।'

এই সম্ভবত ছিল তাঁর শেষ কথা। তাঁর লৌহকঠিন আত্মা নশ্বরদেহ ত্যাগ করে বিনা-প্রতিবাদে জীবনের সমাপ্তি মেনে নিল।

আমিরদের কেউ-কেউ তখনো রোদন করছিলেন। মহিলাদের মৃদু আর্তনাদও শোনা যাচ্ছিল। ইমামগণ কক্ষে প্রবেশ করে উচ্চারণ করলেন : 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' খোদা এক, একজন ব্যতীত অন্য খোদা নেই।

উপসংহার

যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের টুকরোগুলোকে একত্র করে একটা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তিনি আর নেই। যে-অদম্য ইচ্ছাশক্তি এক বিরাট রাজধানী তৈরি করেছিল, তাতারদের পরিচালক সে-ইচ্ছাশক্তি চিরতরে হারিয়ে গেছে। তাতারি-প্রধানরা সম্রাটের চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিকে হারিয়েছেন। তৈমুর তাঁদের অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। তিনি তাঁদের পরিচালনা করেছেন, সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজহাতে ধারণ করেছেন। তৈমুরের অধীনে তাঁরা অর্ধপৃথিবীর অধীশ্বর হতে পেরেছিলেন। তৈমুরের পরিচালনায় যাঁরা একদিন বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করেছেন, এঁরা অধিকাংশ তাঁদের পুত্র ও পৌত্র। পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁরা তৈমুরের ইচ্ছাশক্তি ছাড়া অন্যকিছুর সাথে পরিচিত ছিলেন না।

তখন সৈন্যবাহিনীতে এবং সমরখন্দে বিভিন্ন জাতির লোক ছিল। ছিল সোনালিবাহিনীর মোঙ্গলরা, তুর্কি, ইরানি, আফগানি ও সিরীয়গণ। তখনো তারা সকলে মিলে একটা নতুন জাতিতে পরিণত হতে পারেনি।

তৈমুরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং তাঁর মৃত্যুতে তাদের শোক ছিল এতই গভীর যে, সৈন্যবাহিনী এবং নগরবাসীরা তাঁর আদেশ পালন করা ছাড়া আরকিছু ভাবতে পারেনি। তাঁর উত্তরাধিকারী পির মোহাম্মদ তখন ছিলেন ভারতে এবং ওত্রার থেকে ভারত আর ভারত থেকে ওত্রারে যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। যদি পির মোহাম্মদ তখন ভারতে না থাকতেন, আর যদি তাঁর যোগ্যতম পুত্র শাহরোখ নিজ রাজ্য খোরাসান নিয়ে থাকতে জিদ না করতেন, কিংবা তাঁর উচ্চপদস্থ আমিরগণ যদি তাঁর প্রতি অন্ধ বাধ্যতায় চীনযাত্রা না করতেন, তা হলে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে হয়তো কিছুকাল একত্র রাখা সম্ভব হত।

কিন্তু তৈমুরের পরিত্যক্ত শাসনরজ্জু শক্তহাতে ধরে রাখবার ক্ষমতা তখন কারুর ছিল না। ওত্রারে থেকে আমিরগণ তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা সকলে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে তৈমুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ্যে ঘোষণা না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা এও সিদ্ধান্ত করলেন, তৈমুরের এক পৌত্রকে সৈন্যবাহিনীর পরিচালনভার দিতে হবে—যাতে সৈন্যবাহিনী চীনা প্রাচীরের কাছে পৌঁছলে চীনারা মনে না করতে পারে যে, তৈমুর মারা গেছে। চীনা জয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন বলেই মনে হয়।

মৃত দিগ্বিজয়ীর শব শাহরোখের জ্যেষ্ঠপুত্র উলুঘ বেগের সাথে এক শক্তিশালী রক্ষীদলসহ পাঠানো হল বেগমদের প্রতীক্ষিত স্থানে। পির মোহাম্মদের কাছে একদল কাসেদ পাঠানো হল। তারা দ্রুতবেগে ভারতের দিকে ছুটল। প্রয়োজনানুসারে তৈমুরের মৃত্যু-সংবাদ দূরবর্তী প্রদেশগুলোর শাসকদের এবং রাজবংশের লোকদের কাছে পাঠানো হল।

কিন্তু অত্যন্ত অকস্মাৎ সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেল। জানা গেল যে, বাহিনীর দক্ষিণবাহুর সেনানায়কগণ আগে থেকেই মিরন শাহের পুত্র খলিলের নিকট বশ্যতাস্বীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তারা তাঁকে সমরখন্দের সিংহাসন দেবার পরিকল্পনা

করছে। সে-সময়ে বাহিনীর বামবাহুর সেনানায়কও দল ভেঙে দিয়ে সমরখন্দের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল।

এই সঙ্কটের সময়ে নুরুদ্দিন ও তাঁর দলের লোকেরা আরেকটি বৈঠকে মিলিত হলেন। পিছনে ক্ষমতা অধিষ্ঠিত এক শক্তিশালী বাহিনী রেখে তাঁরা আর চীনের দিকে অভিযান চালিয়ে যেতে পারলেন না। তাঁরা দ্রুতবেগে রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং শিরদরিয়ার কাছে শববাহীদের নাগাল পেলেন।

তাঁরা দেখলেন, সমরখন্দের সিংহদরজা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে—যদিও তাঁদের সাথে ছিলেন বড় বেগম সরাই মুলক খানুম আর ছিল তৈমুরের শবাধার, তাঁর নিশান আর তাঁর জয়ঢাক। শহরের শাসনকর্তা আগেই খলিলের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তিনি আমিরদের কাছে কৈফিয়তস্বরূপ লিখে পাঠালেন যে, পির মোহাম্মদ যতদিন-না এসে পৌঁছুচ্ছেন, ততদিন একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু শাদিমুলখের প্রেমিক, তরুণ খলিল খানজাদের প্রভাবে বশীভূত একদল প্রভাবশালী আমির নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘদিন থেকেই খানজাদে এই গোপন ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছিলেন। যাহোক, নগরবাসীরা হয়ে পড়েছিল হতবুদ্ধি। কারণ তৈমুরের মৃত্যু হয়েছিল সীমান্তের ওপারে এবং তাঁর শেষ নির্দেশ তারা শুনতে পায়নি। ফলে খলিল শাহি তখতে বসলেন—সম্রাট বলে তাঁকে স্বীকার করে নেয়া হল।

এরপর প্রবীণ নুরুদ্দিন নয়া রাজদরবারে যে-চিঠি পাঠান, তার ভাষা অত্যন্ত তীব্র :

'দুনিয়ার আত্মাস্বরূপ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচাইতে ক্ষমতাশালী সম্রাটের মৃত্যুতে আজ আমরা শোকে মুহ্যমান। যেসব অজ্ঞ যুবককে তিনি পায়ের ধুলো থেকে কুড়িয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, তারা ইতঃপূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁর প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে তারা তাঁর আদেশ অমান্য করেছে, শপথ ভঙ্গ করেছে। এমন ভয়াবহ দুর্ভাগ্যে দুঃখ ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ? যাঁর দুয়ারে এসে পৃথিবীর রাজন্যবর্গ সালাম ঠুকেছে, যিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী খেতাবের যোগ্য অধিকারী, সেই শাহানশাহের ইন্তেকালের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ইচ্ছা পদদলিত হল! ক্রীতদাসের দল আজ তাদের উপকারীর শত্রু হয়ে উঠেছে। কোথায় তাদের সে-বিশ্বাস? পাথরের যদি হৃদয় থাকত, তারাও শোকে মুহ্যমান হত। এই অকৃতজ্ঞদের উপর আসমান থেকে কেন পাথরবৃষ্টি হচ্ছে না! খোদার মেহেরবানি থাকলে আমরা কখনো আমাদের মালিকের আদেশের কথা ভুলব না। আমরা তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করব—তাঁর পৌত্র তরুণ শাহজাদাদের মান্য করে চলব।'

আবার আমিরগণ একত্র পরামর্শ করলেন। শেষে এক বিষয়ে তাঁরা একমত হলেন। শাহি ঝাণ্ডা যে-শামিয়ানার সামনে খাড়া করে রাখা হয়েছিল, সেখানে তাঁরা গেলেন। তৈমুরের বিরাট জয়ঢাক ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হল। জয়ের বার্তা-ঘোষণায় তৈমুরের যে-জয়ঢাক অহরহ বেজে উঠত, তা অপর কোনো লোকের সম্মানে বেজে উঠবে, এ তাঁরা বরদাশ্‌ত করতে রাজি ছিলেন না।

খলিলের প্রথম কাজই হল, যে-নটীর মোহে তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সেই শাদিমুলখকে প্রকাশ্যে শাদি করা।

অতিতরুণের উপর বিরাট সাম্রাজ্যের শাসনভার আর অযোগ্যের হস্তে বিপুল

অর্থভাণ্ডার—তার উপর সুন্দরী ইরানি নটী কর্তৃক তার নাকে দড়ি পরলে যা হয়, তা-ই হল। ভোজের পর ভোজ চলতে লাগল। খলিল তাঁর সুন্দরী 'রানীর' উদ্দেশে কবিতার পর কবিতা রচনা করে চললেন। সমরখন্দের ধনরত্ন বেপরোয়াভাবে ব্যয়িত হতে লাগল। কিছুদিন তাঁর জাঁকজমক ও বেপরোয়া অর্থব্যয়ের ফলে তাঁর স্তাবকের সংখ্যা বাড়ল সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি পুরনো কর্মচারীদের বরখাস্ত করে নিজের খুশিমতো লোকজন বহাল করলেন—এদের মধ্যে ছিল ইরানি এবং নানাশ্রেণীর খোশামুদে স্তাবকের দল। যে-সম্রাজ্ঞী সরাই মুলক খানুমের মহানুভবতায় একসময়ে শাদিমুলখের প্রাণরক্ষা হয়েছিল, তিনিই এখন শাদিমুলখের লাঞ্ছনার পাত্রী হয়ে পড়লেন। সমরখন্দের বাগিচায় পাগলামির উৎসব শুরু হয়ে গেল। মূল্যবান পাথরসমূহ চারদিকে ছুড়ে দেওয়া হতে লাগল—যার ইচ্ছা, সে-ই সেসব কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

খলিল হলেন জয়োল্লাসে উন্মত্ত, আর শাদিমুলখ করল তার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ। তাদের এইসব কাজের ফলে শুরু হয়ে গেল গৃহযুদ্ধ।

যথাসময়ে পির মোহাম্মদ এলেন ভারত থেকে, কিন্তু খলিলের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক হলেন তিনি পরাজিত। দ্রুতগতিতে দৃশ্যপট বদলাতে লাগল। সৈন্যবাহিনীর যে-অংশ ছিল বিশ্বস্ত, তাদের নিয়ে প্রধান আমিররা হামলা চালালেন সমরখন্দের উপর। নয়া বাদশাহের পরাজয় হল। তাঁকে পাঠানো হল সুরক্ষিত বন্দিখানায়। আর শাদিমুলখের হল প্রকাশ্য লাঞ্ছনা!

তৈমুরের সাথে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর সাম্রাজ্যেরও। তাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার কোনো আশাই আর ছিল না।

অনবরত বিপদবার্তা শুনে-শুনে উদাসীন শাহরোখও বিচলিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনি খোরাসান থেকে এসে সমরখন্দ দখল করলেন। এরপর মাত্র মা-আরা-উন্নাহার নিজ দখলে রেখে পুত্র উলুঘ খানকে তিনি সমরখন্দ দান করলেন। এতদিনের সমরখন্দের বহু সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। বাপ-ব্যাটা উভয়ের মধ্যে সাম্রাজ্যের মূল অংশটা টিকে রইল। ভারত থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত।

তাঁরা ছিলেন শান্তিবাদী মানুষ—আর্টের পৃষ্ঠপোষক। তৈমুরের প্রকৃতির দুই বিপরীত দিকের একদিকের উত্তরাধিকারী—যেদিক ভাঙার পর তৈমুরকে গড়বার প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁরা যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন বটে, কিন্তু আক্রান্ত হলে তাঁদের দরবারে সমবেত দুর্ধর্ষ সৈন্যদলের সাহায্যে আত্মরক্ষা করার ব্যাপারে কখনো পিছপা হতেন না। ভাঙার হট্টগোলের মধ্যে তাঁদের নগরী দুটি ছিল আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপত্তার দ্বীপ।

শাহরোখ ও উলুঘ বেগের অধীনে সাম্রাজ্যের সমারোহের যুগ শুরু হল। রেগিস্তানে নতুন নতুন ইমারত উঠল। তাদের আশ্রয়ে ইরানের চিত্রকর ও কবিদের প্রতিষ্ঠা বাড়ল। শাহরোখ ছিলেন এই বংশের অগাস্টাস এবং উলুঘ বেগ মার্কাস ও চিলিয়াস। উলুঘ বেগ ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ জ্যোতির্বিদ, ভৌগোলিক এবং কবি। তিনি সমরখন্দের বিখ্যাত মানমন্দিরের নির্মাতা। তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন বিজ্ঞানচর্চায়।

তাঁদের প্রতিভায় তৈমুরের আশা-আকাঙ্ক্ষা আধাআধি পূরণ হয়েছিল। কারণ সমরখন্দ সত্যই এশিয়ার রোম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমরখন্দ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল বাকি দুনিয়া থেকে। তৈমুরের মৃত্যুর পর যে-ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়, তার ফলে দুই মহাদেশব্যাপী

বাণিজ্যিক স্রোত রুদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার—সেই ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পর্তুগাল এবং ইংলন্ড কর্তৃক সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ আবিষ্কার পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে এশিয়ার বেশিরভাগ ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন। সমরখন্দে কোনো মার্কোপলোর আগমন হয়নি। এ ছিল লাসার চাইতেও বেশি নিষিদ্ধ নগরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক রুশবাহিনীই প্রথম সমরখন্দ পর্যন্ত গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা তখন তৈমুর কর্তৃক ক্রসা থেকে লুণ্ঠিত বাইজেন্টাইন লাইব্রেরির জিনিসের খোঁজে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনুসন্ধান হয়েছিল ব্যর্থ।

তুষার, সূর্যের তাপ, ভূমিকম্প আর সময় সবাই মিলে রেগিস্তান এবং বিবি খানুমের সমাধিভূমিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। যেসব দেয়ালকে তৈমুর মনে করেছিলেন অবিনশ্বর, বছর-বছর সেসব ভেঙে পড়তে লাগল। এমনকি, আজও কোনো পর্যটক বা ভ্রমণকারী সেখানকার পাবলিক স্কোয়ার পর্যন্ত পৌঁছেননি—লর্ড কার্জন যাকে অভিহিত করেছিলেন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে। তবু সময় এসব ভগ্নাবশেষকে মণ্ডিত করেছে অক্ষয় সৌন্দর্যে।

তাতারদের এই গৌরব-যুগের সাহিত্যের বেশিরভাগেরই তরজমা হয়নি এবং এ-কারণে বাইরের জগতে তাদের পরিচয় অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কিন্তু শাহরোখ ও উলুঘ খানের প্রপৌত্রগণ নিজস্ব নতুন গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা সমরখন্দ থেকে দক্ষিণদিকে ভারতে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মহান মোগল রাজবংশের পত্তন করেছিলেন।

চেঙ্গিজ খানের আবির্ভাবের মতো তৈমুরের পশ্চিমি অভিযানও রাজনীতিক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে এবং তার ফলে ইউরোপের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সে-ও মাত্র দুএক পুরুষের জন্য।

তিনি আবার দুই মহাদেশব্যাপী বাণিজ্যপথ খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তা একশো বছর ধরে রইল বন্ধ। তিনি দূরবর্তী বাগদাদের চাইতে ইউরোপীয়দের নাগালের ভিতরে অবস্থিত তাব্রিজকে বানালেন মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুর পর যে-গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তার ফলে এশিয়ার বাণিজ্যের ভীষণ ক্ষতি হয়। কলম্বাস ও ভাস্কোডা গামা কেন সমুদ্রপথে রাস্তা আবিষ্কারে বেরিয়েছিলেন, এটা তার অন্যতম কারণ।

সোনালিবাহিনী চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তারই ফলে রুশজাতি স্বাধীনতা পেয়েছিল। ইরানে মোজাফফর বংশ উৎখাত হয়েছিল। দীর্ঘ দুই শতাব্দী পরে শাহ আব্বাসের অধীনে ইরান এক উল্লেখযোগ্য সাম্রাজ্যে উন্নীত হল। ওসমানীয় তুর্কিশক্তি প্রতিহত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইউরোপের তখন এমনই অথর্ব দশা যে, তুর্কি-প্রভাবমুক্ত হওয়া তার পক্ষে কঠিন হল এবং তার ফলে তুর্কিরা আবার শক্তি সঞ্চয় করে ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল দখল করল।

বাকি রইলেন মিশরের মামলুক সুলতান। তিনিও তাঁর বশ্যতার শপথ যত শিগ্‌গির সম্ভব ভুলে গেলেন। কারা ইউসুফ এবং সুলতান আহমদ ফিরে এলেন মেসোপটেমিয়ায়। নতুন করে তাঁদের বিবাদ আবার শুরু হল।

তৈমুরবাহিনীর নুরুদ্দিনের পরিচালনাধীন মোঙ্গল ও তাতার সেনানীরা তাদের উত্তর-অঞ্চলের তৃণভূমি ও সীমান্তের আবাসভূমিতে ফিরে গেল। তাদের বংশধরেরা আজও সেখানে রয়েছে—তাদের বলা হয় কিরগিজ এবং মামলুক তাতার। তারা এখন তৈমুরের

তৈরি উঁচু বিজয়স্তম্ভগুলোর ভগ্নস্তূপে তাদের ভেড়া ও ঘোড়া চরায়। তৈমুরের মৃত্যুর ফলে তুরানের শিরস্ত্রাণ-পরিহিত লোকেরা এইভাবে দক্ষিণের পাগড়ি-পরিহিত ইরানের সংস্কৃতিবান লোকদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।

ইসলামের ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতিও কম হল না। তৈমুরের মৃত্যুর সাথে সাথে একটা সর্বজনীন খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাতার-বিজয়গুলোর উপর তাঁদের শক্তিসৌধ গড়ে তুলতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, তৈমুরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলো ইসলামের ভিত্তিভূমিই চূর্ণ করে দিয়েছে। তৈমুর কখনো ইমামদের তাগিদে তাঁর কোনো পরিকল্পনা রচনা করেননি। সবশেষে দেখা গেল, তাঁদের জন্য তৈমুরের কোনোরূপ মাথাব্যথাই ছিল না।

ইরানের নতুন সাম্রাজ্য যাঁরা স্থাপন করলেন, তাঁরা ছিলেন ভিন্নমতের (শিয়া) মুসলমান—তাঁদের সাথে ওসমানীয় তুর্কিদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত। তৈমুরের বংশধর ভারতের মোগলরা ছিলেন তাঁরই মতো নামে মুসলমান ; অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের মত ছিল উদার। যে-আমিরুল মুমেনিনগণ বাগদাদকে করে তুলেছিলেন স্বপ্নপুরী, কায়রোর খলিফাগণ ছিলেন তাঁদের ছায়া মাত্র।

তৈমুরের পরে আর-কোনো ব্যক্তি দুনিয়া জয় করতে চেষ্টা করেননি। আলেকজান্ডার যা বাস্তবায়িত করেছিলেন, তৈমুর তাই-ই করতে চেষ্টা করেছিলেন। মেসিডোনের আলেকজান্ডার যেভাবে মহান সাইরাসের অনুসরণ করেছিলেন, তৈমুর তেমনিভাবে অনুসরণ করেছিলেন চেঙ্গিজ খানকে।

সমরখন্দে গেলে দেখা যাবে, প্রাসাদের সন্নিকটে বৃক্ষকুঞ্জের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট গম্বুজ। এখনো গম্বুজটি স্থানে-স্থানে নীলাভ এবং তার টালির টুকরোগুলো সূর্যকিরণে ঝকমক করে। দেয়ালগুলোর আস্তরে দেখা যাবে রুশীয় রাইফেলের গুলির দাগ। একটা ছাড়া বাকি সবগুলো খিলান ভেঙেচুরে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে।

সঙ্কীর্ণ দেউড়ির ভিতর দিয়ে গেলে কবরগাহ নজরে পড়বে—একটা কামান-রাখা ছিদ্রপথ দিয়ে সেখানে আসছে মৃদু আলোক-শিখা। রেলিঙের মার্বেলের কারুকার্যের পিছনে দেখা যাবে দুটো প্রস্তরফলক—একটা শাদা, এবং অপরটি সবুজ ও কৃষ্ণবর্ণের। শাদা পাথরটি ঢেকে রেখেছে মির সাইদের শবদেহ। ইনি ছিলেন তৈমুরের বন্ধু। কালো পাথরটি হল ঘোড়ার প্রতিমূর্তি। কবররক্ষী বুঝিয়ে দেবে যে, এটা কোনো-এক মোঙ্গলিয়ান শাহজাদি বহু আগে পাঠিয়েছিলেন। এর নিচে রয়েছে কিংখাবে মোড়া কাঠের বাক্সে তৈমুরের কঙ্কাল।

পরবর্তীকালে শবাধারটি খোলা হয়েছিল এবং তৈমুরের কঙ্কাল রাশিয়ানরা মস্কোয় পাঠিয়েছিল।

সমরখন্দের ভগ্ন স্কোয়ারে গিয়ে যদি সেখানে সূর্যালোকে উপবিষ্ট বুড়োলোকদের জিজ্ঞেস করা যায়, তৈমুর কে ছিলেন, তবে তারা হয়তো তাদের স্মরণ আছে যতটুকু, তার সবটাই অবিকৃতভাবে বলবে :

'তুরা? তাঁর কথা আমরা জানি না! অনেক দিন আগে তিনি ছিলেন—আমাদের বাপ-দাদাদেরও জন্মের অনেক আগে। যা-ই হোক, তিনিই ছিলেন আমাদের সত্যিকার মালিক।'

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'**র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র